শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিক

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫

150 3
002/25

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্ত্তিকা

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫)

vol - 35

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বধূবরী মা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩
চন্দ্রকলাল বলছেন		৯
সাবিত্রী	...	১১
ইন্দ্রজাল	দিলীপকুমার রায়	১৫
অন্বেষণ—আমাকে অথবা তোমাকে	সুমিত্রা রায়	১৬
শ্রীঅরবিন্দ	পুষ্প রায়	১৭
বেদমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৮
বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ	মৌরী বর্মণ	২৪
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও সুভাষিণী	...	৩১
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	৩৯
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	৪২
ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি	শ্রীঅরবিন্দ	৪৯
চুকরী (কাব্য-সংগ্রহ)	নলিনীকান্ত ভট্টশালী	৫৬

বার্ষিক নিবন্ধাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। যেকোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় ঠিকানায় কিংবা কলিকাতা পাথার ঠিকানায় পাঠাতে হবে। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

P. 7366

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৪২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

প্রকাশ :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: Nalini Kanta Gupta
Published by: Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by: Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—1

There is a
Supreme Divine Consciousness.
We want to manifest this
Divine Consciousness in the
physical life.

Blessings

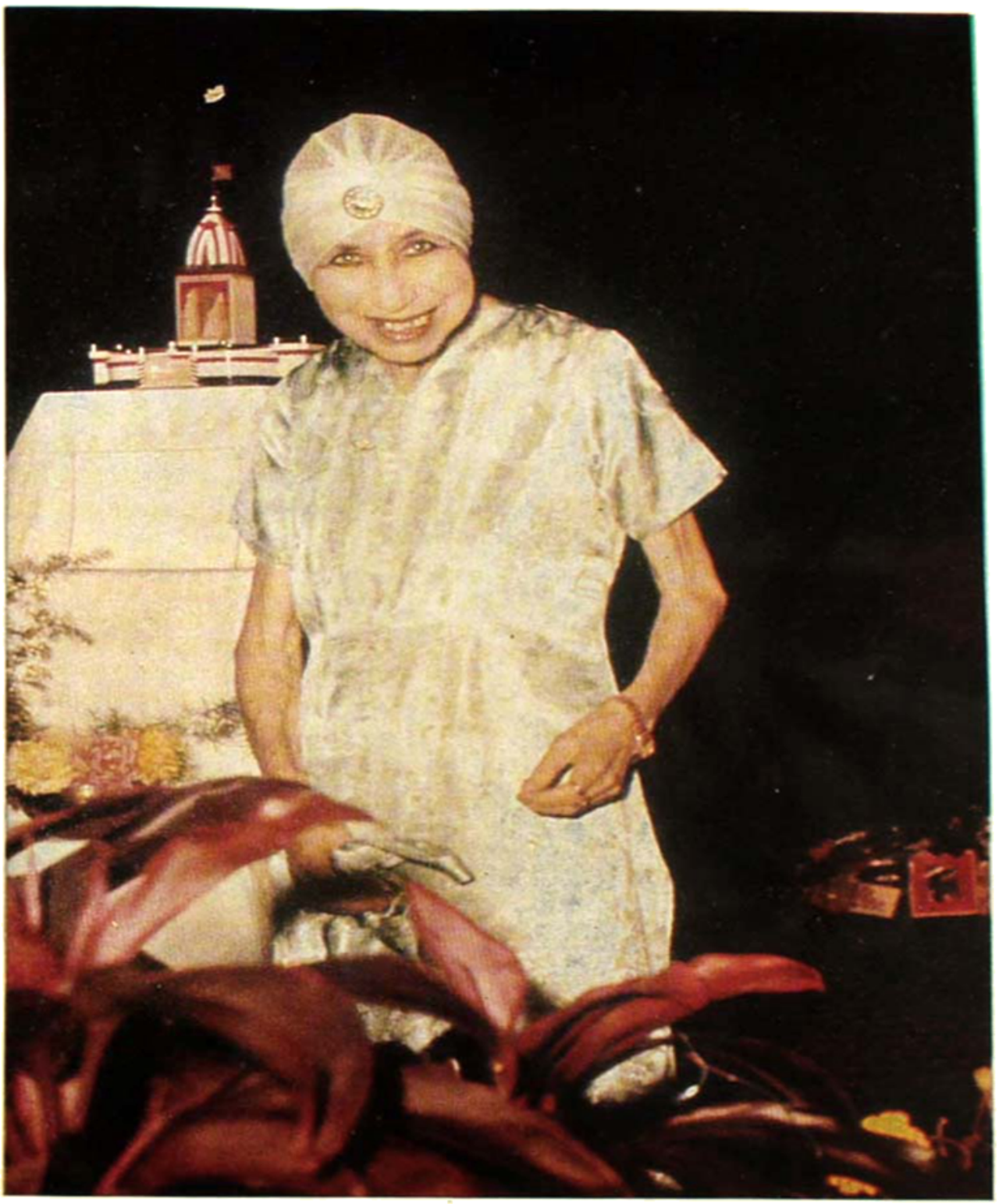

মধুময়ী মা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

(৯)

আজ আমি তোমাদের একটা গল্প বলব, তবে অন্য ধরণের। আমি বলব একটা স্বপ্নের কথা, সূক্ষ্মদর্শনও বলতে পার, যা আমি দেখেছিলাম কিছুদিন আগে। সে হল একটা আশ্রম—একটা আশ্রমই বললাম—কারণ সেটা ঠিক আমাদের এই আশ্রমের মত নয়, যদিও দুটিতে প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। অনেকদিক থেকে তা আমাদের আশ্রমেরই মত, অন্যান্য অনেক দিক থেকে তা আবার ভিন্ন। প্রথমতঃ সমগ্র আশ্রমটি হ'ল একই জায়গায়, একটা সুসংবদ্ধ সংগঠন, তার বাড়িঘর এখানে সেখানে চারিদিকে ছড়ান নয়; তার মধ্যে বাইরের লোকের বা বাইরের কোন প্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ি নাই, তাছাড়া বাড়িগুলি সুন্দর সুদৃশ্য এবং সারা আবেষ্টনীটি শিল্প-শ্রীমণ্ডিত; তবে এখানে আমরা যা কিছু কাজকর্ম করে থাকি, সে সবই সেখানে রয়েছে। বিদ্যালয় আছে, খেলার মাঠ আছে, লাইব্রেরী আছে, কিন্তু সবই সুশৃঙ্খল সাজান-গোছান। মা-ও সেখানে রয়েছেন—সব কিছু দেখাশুনা করতে করতে, লোক-জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাতায়াত করছেন তিনি। যদার কথা যে সেখানকার লোকজনের মধ্যে কাউকে কাউকে আমি চিনতে পারলাম মনে হল—এমন কি যারা এখন এখানে আছে তাদের মধ্যেও কেউ কেউ—অন্যান্য দেশ হতে আগত আগন্তুকও বেশ কিছু ছিল। এখানে রয়েছে এমন যাদের সেখানে চিনতে পেরেছিলাম মনে হ'ল, তাদের সম্পর্কে ছাপটা কিছু আবছা, এখন আর তাদের নাম বলতে পারব না। কিন্তু এখানে যারা ছিল এবং ইতিমধ্যেই যারা গত হয়েছে। তাদের বেশ কিছুকে আমি খুব ভাল ভাবে চিনতে পেরেছিলাম—তাদের মুখ ও চেহারা সেইরকমই আছে তবে একটা নূতন, তাজা এবং বয়ঃকনিষ্ঠ রূপ। তারা সব কর্মতৎপর সুদর্শন তরুণ ও তরুণী—মনে পড়ে, শ্রীঅরবিন্দ ঋগ্বেদ থেকে উদ্ধৃত করতেন: বৈদিক ঋষি যেখানে বলছেন, সবুজক্ষেত্রে আনন্দময় গো-যুথ চরে বেড়াচ্ছে; ঋষি আরও বলছেন, এমন কি তাদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ ছিল তারাও তরুণ হয়ে উঠেছে। ঋষিদের কাছে গাভী ছিল জ্যোতির প্রতীক, জ্যোতি, সূর্য্যের কিরণ, চেতনার শুদ্ধরূপ। সম্ভবতঃ চিত্রটি এসেছিল সেকালের ঋষিদের বাস্তব জীবন থেকে, যে গো-যুথ তাঁরা পালন করতেন, গৃহপোষ্য যে সব জন্তু তাঁদের ঘিরে থাকত, তাঁদের চারিদিকে ছিল যে সব দৃশ্যাবলী এবং সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ছিল একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। দুগ্ধ-শুভ্র সমগ্র গো-যুথ একটা সুন্দর চিত্র। ঠিক তেমনি সেই আশ্রমের আবহাওয়ায় এমন একটা কিছু ছিল যা তাতে এনে দিয়েছিল একটা বিশেষত্ব—তা ছিল পরিচ্ছন্ন পরিশুদ্ধ, পরিষ্কার ও স্বচ্ছ—তাতে ছিল একটা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়তা এবং তা ভারী আনন্দময় আবহাওয়া এক। সেখানে পৌঁছালে তুমি নিজেকে মুক্ত বোধ করবে—এমন স্বাচ্ছন্দ্য—

সেখানে নেই কোন ক্ষুদ্রতা যা এই জগতের সাধারণ জীবনে আমাদের রয়েছে—কোন রাগ নেই কোন দ্বেষ নেই, কোন স্বার্থপরতা নেই, কোন কদর্য্যতা নেই : সকল ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে সেখানে রয়েছে একটা সুখময় সুসঙ্গতি।

আমার অনুভব : যে আশ্রম আমি দেখেছি, তা হ'ল বস্তুতঃ এখানকার আমাদের এই আশ্রমের আন্তর সত্যরূপ—সেই আন্তর আশ্রম যা রয়েছে আমাদের সকলেরই অন্তরে। বর্ত্তমানে তার যে রূপ আমরা দেখি তা তার বাহ্যরূপ—বহুলাংশে বিকৃত এমন কি অনেক দিক দিয়ে তার বিধ্যাকার। সত্যই সে আশ্রমের রয়েছে একটা অন্যজগতের আবহাওয়া যা তার একান্ত নিজস্ব—একটা বিরল সমুচ্চতায় গড়া সে আবহাওয়া। আমি তোমাদের প্রায়ই বলি যে তোমরা যারা এখানে আছ তারা বিশেষ ভাগ্যবান—তোমাদের সকল ত্রুটি ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও, তোমরা যাই কর না কেন, তোমরা এই আবহাওয়া শ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ করছ—তোমরা এই আন্তর সৌন্দর্য্য ও সৌরভের সংস্পর্শে রয়েছ। জানি না তোমরা শুনেছ কি না—মা সে কথা একাধিকবার বলেছেন যে এখানে যে সব ছেলেমেয়েরা রয়েছে, এখানে কিছুদিন যখন বাস করে তারা, একটা নূতন আবহাওয়ায় তারা ভরে ওঠে এবং তা তাদের চারিদিকে ঘিরে থাকে। মা দূর থেকে এমন কি অনেক দূর থেকেও—আশ্রমের কাউকে দেখলে ঠিক চিনতে পারতেন যে সে আশ্রমের একজন—তা তিনি চিনতেন মুখ বা দৈহিক গঠন দেখে নয়, তার আবহাওয়া দেখে—বাইরের লোক সাধারণতঃ যে আবহাওয়া বহন করে বেড়ায় তা থেকে এ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ আবহাওয়া গড়া আনন্দ, পবিত্রতা ও একটা জ্যোতির ভাস্বরতা দিয়ে। আশ্রমের সমস্ত ছেলেমেয়েরা ঘেরা থাকে এই আবহাওয়ায়—কারণ এ হ'ল মায়ের নিজের আবহাওয়া। সেইজন্য তখনকার দিনে মা বলতেন, এসব ছেলেমেয়েদের বাইরে, বাইরের জগতে যাওয়া উচিত নয়—স্কুলের ছুটিতেও নয়—কারণ যখন তারা বাইরে যায়, মা দেখেছেন, তারা আশ্রমের আবহাওয়া হারিয়ে ফেলে এবং যখন ফিরে আসে, মেখে আসে বাইরের জগতের যত কাদামাটি তার একটা পুরু প্রলেপ এবং তাদের দেহের এই কাদা-মাটি ঘষে মেজে পরিষ্কার করতে মাকে অনেক পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করতে হ'ত—যাতে সেটি আবার পূর্ব্বের মত সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—তোমরা জান হয় ত শ্রীরামকৃষ্ণের পাপীদের গঙ্গাস্নানের গল্প—গঙ্গায় পাপমুক্ত হয়ে ওঠার কাহিনী : স্নানে নামার সময় তারা পাপগুলিকে তীরে ত্যাগ করে অথবা পাপগুলি তাদের ত্যাগ করে যেমন তারা গঙ্গার জলে নামে, কিন্তু পাপেরা তীরে অপেক্ষা করতে থাকে—যেই তারা তাদের পাপ হতে মুক্ত হয়ে তীরে ওঠে অমনি—পাপেরা—এতক্ষণ তারা ওৎ পেতেছিল—তাদের উপর লাফিয়ে পড়ে এবং পাপীরা বরাবর পাপীই থেকে যায়। এখানে স্বভাবতই চিরকাল পাপী থেকে যাওয়ার অদৃষ্ট তোমাদের জন্য নয়।

যাই হোক, সেই আবহাওয়াটি—আন্তর আবহাওয়া এখনও এখানে রয়েছে। মায়ের জড়দেহ থেকে সরে দাঁড়ানর সঙ্গে তাও হয় ত একটু সরে গেছে—কিন্তু অতি সামান্যই এই কয়েক ইঞ্চি মাত্র। কিন্তু তবু তা রয়েছে—কারণ মা রয়েছেন আগের মতন তেমনই বাস্তবরূপে যদিও ঠিক ততখানি জড়রূপে নয়। আমি যে বলছিলাম এখানেই যারা দেহ-ত্যাগ করেছে এবং কিছু নূতন মুখও আমি সেখানে দেখেছিলাম। এরা সকলে সম্পূর্ণ

ভাবেই সেই আশ্রমে রয়েছে। কিন্তু আমরা যারা এখানে আছি তারা যেন একটা দ্বৈতজীবন যাপন করছি—কিছুটা এই এখানে আর কিছুটা সেই আন্তর অপর আশ্রমে, যেন বেড়ার এপারে এক-পা, ওপারে আর একপা রেখে দাঁড়িয়ে। তোমাদের দিনের ভাল সুন্দর মুহূর্তগুলিতে যখন তুমি নিজেকে মুক্ত ও সুন্দর বোধ কর, যখন তুমি সুখী ও হালকা, মন তোমার সহজে ভরপুর—তখন তুমি সেই আন্তর আশ্রমের সংস্পর্শে রয়েছ, সেই আবহাওয়া শ্বাসে-প্রশ্বাসে গ্রহণ করছ। স্বপ্নেও যখন তোমরা ঘুমিয়ে থাক—আপাতদৃষ্টিতে তা ঘুম—অনেকেই তোমরা নিশ্চয়, মাকে দেখ, শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পেয়ে থাক। তা হয় কারণ তোমরা তখন সেই আন্তর আবহাওয়াটির সংস্পর্শে আস এবং তার মধ্যে প্রবেশ কর। এখন আমাদের কর্তব্যকর্ম হ'ল এমন কি জাগ্রত অবস্থাতেও সেই বাস্তব সত্যের আরও অধিকতর সংস্পর্শে আসা—সচেতন হয়ে ওঠা সেই বস্তুর—তা হ'ল মায়েরই সান্নিধ্য, আর কিছু নয়। তোমাদের অর্ধেক—তোমাদের আন্তরজীবন ইতঃমধ্যেই সেখানে রয়েছে সেখানকার জ্যোতির্ময় আনন্দময় বাতাসে স্নাত হচ্ছে। শুধু সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠ, দেখবে অনুভব করবে একটা বিপুল সুখ, অনুভব করবে যে তুমি সুন্দর, তুমি সজ্ঞান—আর তখন তুমি অনুভব করবে সেই আন্তর আশ্রমজীবনের স্পর্শ। এবং বর্তমানের আশ্রমের এই যে বাহ্যজীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে বা প্রধানতঃ তারই মধ্যে ডুবে না থেকে বরং এই জীবনকে ঘুরিয়ে ধরতে পার সেই আন্তর জীবনের দিকে; এবং ক্রমে ক্রমে এই বর্তমান জীবনকে সেই আন্তর জীবনের ছাঁচে ঢেলে গড়তে পার। তাই হ'ল তোমাদের কর্তব্য ও কর্ম—বিশেষ করে তোমরা যারা ছাত্র—আশ্রমের ছেলেরা ও মেয়েরা—তাদের এই হ'ল আসল কাজ—লেখাপড়া, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি—এসব হ'ল গৌণ। তোমাদের যা করণীয় এবং তোমরা যা করতে পার তা হ'ল এই নূতন বাতাস শ্বাসে-প্রশ্বাসে গ্রহণ করা, আরও ভালভাবে, আরও সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করা। এ আন্তর জীবন তোমরা পেতে পার, তা ত' রয়েছেই এবং পেতে পার বিনা ক্লেশেই—কারণ তা রয়েছেই সঙ্গে—একটা আন্তর সমবেত জীবন—তা অতি সুন্দর—আমি যেমন বলেছি, মায়ের সান্নিধ্যের মধুর সৌরভে ভরা। এ এমন একটা সমবেত জীবন যেখানে তোমরা শুধু ভাই-বোন নও, সেখানে তোমরা একতনু, এক আত্মা, মায়ের ভালবাসায় ভরা সান্নিধ্যের মধ্যে জীবন্ত সত্যে এক হয়ে আছ। সেই অন্তরের জীবনকে তবে বাইরে নিয়ে আসতে হবে—তোমাদের দেহাধারে, তোমাদের সকল বাহ্যকর্মাবলীর মধ্যে। অবশ্য সে আন্তর সংগঠনটির স্বাভাবিক ধর্মই হ'ল নিজেকে বাইরে প্রকট করা, তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবেগ হ'ল আত্মপ্রকাশ ও রূপগ্রহণের দিকে, এমন কি যদি তুমি তা নাও জান বা নাও বোঝ, তা ক্রমেই সামনে এগিয়ে আসছে। তবে, তুমি যদি সচেতন হও, যদি তাকে সাহায্য কর, তার সঙ্গে সহযোগিতা কর, তুমিই লাভবান হবে, তোমার চেতনা বর্দ্ধিত হয়ে চলবে, লাভ করবে তুমি একটা গরিমা রূপ, উপভোগ করবে এক অত্যাশ্চর্য বিস্ময়ের পরম আনন্দ।

বর্তমানে, যা বলছিলাম, এই দুই আশ্রম, এই দুই জগৎ বা জীবনের মধ্যে একটা বিভেদ রয়েছে। তারা যেন সমান্তরাল রেখায় চলেছে দুটিতে, কিংবা প্রায়ই পরস্পরকে স্পর্শ করেছে, পরস্পরে মিলেমিশেও গেছে মাঝে মাঝে—অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে দুটিকে যেন

জোর করে এক করার চেষ্টা হয়েছে। তাদের একটি একক অস্তিত্ব করে তুলতে হবে, আন্তর জীবনকে বাহ্যজীবনটিতে তুলে ধরে নিজের মধ্যে এক করে নিতে হবে, বাহ্যজীবনকেও সম্মত হতে হবে পরিশুদ্ধ হতে, ধূলি-আবর্জনামুক্ত হতে, এবং সম্পূর্ণরূপে আন্তর জীবনের দ্বারা অধিগত হতে। তাদের হতে হবে—যেমন আগেই বলেছি—এক বস্তু, একই সত্তা, একই প্রাণ, এক দেহ।

একটু আগে বললাম, তোমাদের কাজ হ'ল এই আন্তর জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠা, তাতে উত্তরোত্তর আরও বেশি করে অংশ গ্রহণ করা। স্বভাবতঃই তোমরা প্রশ্ন করবে, কিন্তু কেমন করে তা করতে হয়? সত্যি বলতে কি, তার কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। তা শিখবার বা আয়ত্ত করবার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এ তোমার অঙ্কের সমস্যা শেখার মত নয়, এমন কি বিশেষ শারীরচর্চা—যা আয়ত্ত কর অভ্যাস ও অনুশীলনের সাহায্যে—তার মতও নয়। এটা আদৌ যান্ত্রিক কিছু নয়। এ একটা স্বাভাবিক পরিণতি, আসে আপনা থেকে, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তা তোমার কাছে ও তোমার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। তোমাকে শুধু আন্তরিকভাবে তা চাইতে হবে—চেয়ে চলতে হবে যত একাগ্রভাবে পার, মন্ত্রের মত জপ করে চল, "আমি সেখানে থাকতে চাই, সেখানে থাকতে চাই, সেখানে থাকতে চাই।" তাই যথেষ্ট। তাই জাগিয়ে তুলবে তোমার মধ্যে নূতন আলো, নূতন প্রেরণা যা তোমায় এগিয়ে নিয়ে চলবে। এ হ'ল শিশুর আহ্বান মাকে এবং মা সর্ব্বদাই সাড়া দেন তাঁর জ্যোতি, তাঁর শক্তি এবং তাঁর ভালবাসা নিয়ে।

তোমাদের বলা হয়েছে আমিও কতবার বলেছি তোমাদের যে, যদিও মায়ের জড়দেহ আর নেই আমাদের মধ্যে, তবু তাঁর চেতনা তিনি রেখে দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে: সে চেতনা এখনও জাগ্রত, এখনও কাজ করে চলেছে। তাঁর দেহে থাকতেই তিনি একথাও বলেছিলেন যে যদি কখনও তিনি দেহত্যাগ করেন, তাঁর চেতনা সর্ব্বদাই থাকবে আমাদের সঙ্গে। কিন্তু আমি আরও কিছু যোগ করছি তবে। যে চেতনা তিনি রেখে গেছেন এখানে তা ছাড়াও কিছু রয়েছে আমাদের সঙ্গে, তা হ'ল তাঁর ভালবাসা তাঁর সন্তানদের জন্য তাঁর ভালবাসা রয়েছে তেমনই অটুট, আগেরই মত তার পরিপূর্ণতা নিয়ে। আমি আন্তর-জীবনের কথা বললাম সে জীবন গড়া সন্তানদের তাঁর এই ভালবাসায় এবং সে জীবনে প্রবেশ করা ও উপভোগ করা তোমাদের পক্ষে নিশ্চয় সহজ হবে মায়ের জন্য তোমাদের যে ভালবাসা তার সহায়ে—তোমাদের প্রতি মায়ের যে ভালবাসা তারই প্রত্যুত্তরে তোমাদের ভালবাসা তাঁর প্রতি। এবং সেই ভালবাসার আলোতে তুমি ক্রমশঃ হয়ে উঠবে যা তিনি চান যে তুমি হয়ে ওঠো।

চম্পকলাল বলছেন

মায়ের আঁকা রেখাচিত্র

মায়ের নিজের আঁকা কতকগুলি স্কেচ ছিল। একটা ফাইলে রাখা সেগুলি আমার জিম্মায় দিয়েছিলেন।

কত বছর পরে মা সেগুলি চাইলেন। যখন নিয়ে এলাম তখন পুরানো সাবানের টুকরোর বেলায় যেমনটি ঘটেছিল তেমনই হল। ফাইলটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন: "না, তুমি রাখো। এটা তোমাকে দিলাম।"

এগুলির মধ্যে তাঁর আঁকা দুটি প্রতিকৃতি ছিল—একটি নিজের, অন্যটি শ্রীঅরবিন্দের। এ দু'টির জিম্মাদারী আমাকে দিয়েছিলেন, অন্যগুলি একেবারে রাখতে।

অনেক পরে কৃষ্ণলাল আমাদের চিত্রভবনে মায়ের আঁকা চিত্রের প্রদর্শনী করতে মা'র অনুমতি চান। মা রাজী হলেন, কিন্তু তাঁর বড় চিত্রগুলি দিতে আমাকে বারণ করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যে ছোট (ক্রেয়ঁ আঁটা) ছবিগুলি আমার হেপাজতে আছে সেগুলি দেওয়া যায় কিনা, যেহেতু প্রদর্শনীর পরেই তাদের ফেরত পাওয়া যাবে। তিনি বললেন, "হ্যাঁ"।

কৃষ্ণলাল যখন প্রদর্শনীর পরে ছবি ফেরত দিতে চাইলেন, আমি মা'কে বললাম, "বাসুদেব এই ছবিগুলির তত্ত্বাবধান করে এবং সযত্নে রাখে। তার কাজ আমি দেখেছি। ওরা খুব সতর্ক। মা রাজী হলে ওদের বলতে পারি ছবিগুলি ওদের কাছেই রাখতে।"

মা নিরুত্তর। আমি আবার তাই জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহলে সব এক জায়গায় থাকতে পারে। আগে তো তা ছিল না। তোমার আঁকা ছবি বের করতেই দিতে না। এখন অনুমতি দিয়েছ। ওরা কি তোমার স্কেচগুলি এবং প্রতিকৃতি ক'টি—তোমার দু'টি এবং শ্রীঅরবিন্দের একটি, ওদের কাছে রাখতে পারে?"

মা আমার চিত্রগুলি রাখতে পারে। স্কেচগুলি তোমাকে যে দিয়েছি তা নিয়ে যা-খুশি করতে পার। তবে আমি চাই শ্রীঅরবিন্দের ও আমার প্রতিকৃতিগুলি তোমার কাছে থাক। বাকী সব ওদের কাছে থাকতে পারে, তুমি যেমন বলছ ওরা যত্নে রাখে।

তাই করলাম। তিনটি প্রতিকৃতি শুধু ফিরিয়ে নিলাম। বাকী সব এখন ষ্টুডিওতে।

দোহাই ভগবানের

মা যখন আজ রাত্রে শ্রীঅরবিন্দের খাবার নিয়ে এলেন তখন হাতে ছিল গতকালের ফাইলটি এবং খাবার সময়ে সেটি পড়তে শুরু করেন। রোজকার মতো আমি পরিবেশন করছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের ঘরে আরশির সামনে কাঁচানাকা একটা টেবিল আছে সেটিই

ছিল তাঁর খাবার টেবিল। পরিবেশনের সময় একটা বাটি সরাতে গিয়ে যোধদ্বয় একটু অস্বাভাবিক জোরে শব্দ হল—সামান্য একটু মাত্রই—কারণ আমি তো সম্পূর্ণ সজাগ ছিলাম যে মা পড়ছেন। যা হোক, ওই শব্দে মা বলে উঠলেন, "দোহাই ভগবানের, শব্দ ক'রো না।"

আমি হকচকিয়ে গেলাম। কথা ক'টিতে নয়, কথার সুরে আমি বিগড়ে গেলাম। তবু তাঁর কৃপা প্রসন্ন হল, সুবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকল এবং গর্হিত কিছু করা থেকে আমাকে রক্ষা করল। ফলে এই রকম একটা চিন্তা এল নিজের সম্বন্ধে প্রকাণ্ড ধারণা রেখ না, তুমি চেয়েছিলে কোনো দাবি না জানিয়ে সেবা করতে, নিঃশর্ত সেবা দিতে। এটা কি পরীক্ষা নয়?

শান্ত থাকলাম, যেন কিছুই ঘটে নি।

মা'র পড়া শেষ হলে শ্রীঅরবিন্দ ঘাড় নেড়ে বললেন, "বেশ, বেশ"

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কী রকম লাগল?"

শ্রীঅরবিন্দ: খুব ভালো।

মা এটা কি মঞ্চস্থ করা যায়?

শ্রীঅরবিন্দ: হ্যাঁ, অবশ্য মঞ্চস্থ করা চলবে (আমার ঘাড় নাড়লেন)।

মা সাহানা নেপথ্যে গাইবে। ব'র গলা খুব সুন্দর, ভরাট, মিষ্টি; ওর বোঝবার ক্ষমতাও আছে। অনুক ফরাসী বেশ জানে। তাছাড়া ওর সময় যাচ্ছে বাধাবিঘ্নের ভেতর দিয়ে। আর অন্য কাকে ভূমিকাটি দেওয়া যায়? যাক, পরে দেখব। অ, যে পড়েছিল Rose of God, তার সুন্দর প্রকাশভঙ্গি, চোখ তার গোল যেমন প্রয়োজন। ব ক্রেঞ্চ জানে খাশা, তবে তার ক্ষুদে ভূমিকা। ছেলেরা পরবে প্যান্ট, আর মেয়েরা পরবে শাড়ি যেহেতু তাদের আধুনিক পোষাক অতি কদর্য।

শ্রীঅরবিন্দ আহা!

আমার দিনপঞ্জী এখানেই ইতি। এখন আপনাদের জানা উচিত শব্দ না করতে মায়ের বক্তব্যে আমি অত কেন আহত হয়েছিলাম। সাধারণত শ্রীঅরবিন্দের সামনে আওয়াজ যাতে না হয় সেজন্য সতর্ক থাকতাম। যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম পরিবেশ যথাসম্ভব শান্ত রাখতে। ঠিক এদিনে মা শ্রীঅরবিন্দের কাছে পড়ছেন বলে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম। তাছাড়াও যেমন বলেছি, শব্দ যাতে না হয় সে সম্পর্কে আমি খুব সাবধান ছিলাম। এই জন্যই অত আমার লেগেছিল।

শ্রীঅরবিন্দের কাছে নিজের চূড়ায় থাকতাম। মায়ের সঙ্গে অন্যরকম; এখানে আমার ব্যবহার ছিল ঠিক যেমন আমার গর্ভধারিণী মায়ের সঙ্গে—যাঁকে এমনি ভাবেই বাল্যে সেবা করেছি। মনে আছে আমার মা বলতেন ওরকম সেবা একমাত্র মেয়েই পারে।

মা আমাকে শিখিয়েছেন মুখের কথায়; শ্রীঅরবিন্দ হাসি আর দৃষ্টি দিয়ে। মায়ের সেবা করেছি কিন্তু তাঁকে চিনতে পারি নি।

মাত্র এখন এত বছর পরে তাঁকে জানতে শুরু করেছি।

সাবিত্রী

দ্বিতীয় পর্ব—দশম সর্গ

বিশ্ব-পর্যটক—ক্ষুদ্রতন মনের দেবলোক

(৯)

সূর্যোদয়ের উজ্জ্বল লোকসকলে
সবাই জনম লভে জ্যোতির এক শক্তিরূপে
যা কিছু বিকৃত এখানে রাখে সেখানে তার স্বরূপ
সবই এখানে বিশ্রিত, ধূমিত সেখানে বিশুদ্ধ পূর্ণ;
তবে প্রত্যেকেই হল চঞ্চল পদক্ষেপ, ক্ষণিকের ভঙ্গিমা।
জ্ঞানে জাগে যার আপন ক্রিয়াবলী হতে মহত্তর সত্য এক
ভগবৎ-প্রতিনিধি সেই সনাতন চেয়ে দেখে তার কর্মের ধারা,
অনুভব করে তাদের চমৎকারিতা, তাদের বলবত্তা,
তবে জানে কালের বাহ্যরূপের পিছনে রয়েছে যে মহাশক্তি
কর্তব্য তার করে চলে, অনুসরণ করে তার লব্ধ জ্ঞান,
হৃদয়ের গভীরে আকাঙ্ক্ষা তার মহান্ সব আদর্শ বস্তুর তরে,
দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয় আলো হতে বৃহত্তর আলোকের অভিমুখে
উজ্জ্বল বেষ্টনী এক তাকে ঘিরে রেখেছে তার সামর্থ্যকে সঙ্কীর্ণ ক'রে,
আপন সীমাবদ্ধ মণ্ডলীর মধ্যে নিষ্ঠাভরে কষ্টশ্রম তার, তবে জানে সে
এখানে ঊর্ধ্বতম বৃহত্তম দৃষ্টি যা তা হল অর্ধ-পথযাত্রা তার,
বলিষ্ঠতম কর্ম যা তা একটা ক্রম বা স্তরমাত্র।
কারণ বিচারবুদ্ধি জগৎকে সৃষ্টি করেনি,
সত্যও দৃষ্ট হয় না বিচারবুদ্ধি দিয়ে,
চিন্তার আবরণ আর ইন্দ্রিয়ের আচ্ছাদন ভেদ ক'রে সে
চিন্ময়ের দর্শন বর্ণনা করতে পারে না,
আলো তার স্তিমিত হয়েছে তার করণাবলীর অপূর্ণতায়:
ক্ষুদ্র মন আবদ্ধ যত ক্ষুদ্র সামগ্রীর মধ্যে
অনুভব তার হল চিন্ময়ের বাহ্য স্পর্শ
অর্ধ-জাগ্রত ঘোর নিশ্চেতনার জগতে;
তার আধার ও রূপ সব বাইরের দিকে খুঁজে চলে সে
জ্ঞানহারা রাত্রির আঁধারে হাতড়ে চলে যেন।
শিশুমন ও ইন্দ্রিয়ের এই ক্ষুদ্র কুঠরির মধ্যে

বাসনা হল শিশু-হৃদয়ের রোদন, রোদন করে পরমানন্দের জন্য ;
আমাদের বিচারবুদ্ধি হল খেলনার কারিগর,
নিয়ম বেঁধে দিতে চায় যেখানে অদ্ভুত খেলা চলে ওলট-পালটের।
তার বাসনাকার সহায়কদের পরিচয় জানত সে, তাদের আত্মবিশ্বাসী দৃষ্টি
সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে গ্রহণ করত সুদূরের লক্ষ্যরূপে।
যে জগৎ সে তৈরী করেছে তা হল একটা সাময়িক চিত্র,
দিয়েছে অর্ধ-সত্যের অভিমুখে পথযাত্রী এক
চলে যে নির্জ্ঞান হতে নির্জ্ঞানে।
কিছুই জানা যায় না সবই যেখানে ঢাকা রয়েছে ;
সত্য তখনই দেখি যখন দেখি পূর্ণতাকে।
তাকে আকর্ষণ করেছে পূর্ণ যে আবার অদ্বিতীয়,
আকৃতি তার নিজের চেয়ে মহত্তর জ্যোতির দিকে ;
ভগবানের মুখ সে আভাসে দেখেছে তার শাস্ত্র-ব্যবস্থা
তার অনুশাসনের মধ্যে ঢেকে রেখে :
সে জানে সে আবিষ্কার করেছে শুধু স্থূলরূপ যার বাহ্য পরিচ্ছদ
কিন্তু চিরকালের আশা তার পাবে তাঁকে আপন অন্তরে,
অনুভব করবে তাঁর সত্যের দেহস্পর্শ।
কিন্তু এখনও সেখানে রয়েছে মুখোস শুধু, মুখ নয়,
তবে কদাচিৎ দেখা দেয় তাঁর নেপথ্যের নয়নযুগল :
বিচারবুদ্ধি ছিঁড়ে ফেলতে পারে না ঝলমলে সে-মুখোস,
তার নিজের প্রয়াস আরও ঝলমলে করে তোলে তাকে ;
অখণ্ডকে সে ভাগে ভাগে পরিবেশন করে :
ক্ষুদ্র তার হাত দুখানি বৃহৎ সত্যকে ধরতে পারে না,
তাই সত্যকে সে খণ্ডিত করে ধরে বিরোধী ভগ্নাংশে সব
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে চায় যেন সে অস্তমিত সূর্যকে :
দেখে সে—কি দেখে বোঝে না—
সীমাবদ্ধ বস্তুরাজির রুদ্ধকপাট মুখমণ্ডল যত পায় হয়ে
অসীমের সংখ্যাতীত রূপাবলী।
একদিন তাঁর মুখ মুখোস দগ্ধ করে হবে উদ্ভাসিত।
আমাদের অজ্ঞান হল প্রজ্ঞারূপী গুটিপোকার কোষ,
আমাদের ভ্রান্তি চলবার পথে নূতন জ্ঞানের পাণিগ্রহণ করে,
আঁধার তার ঘনকৃষ্ণ গ্রন্থি আলোকের ;
চিন্তাবৃত্তি নেচে চলে হাতে হাত দিয়ে নির্জ্ঞানের সঙ্গে
সেই ধূসর পথ বেয়ে যা ঘুরে ঘুরে চলেছে গিয়ে সূর্যের অভিমুখে।
চিন্তাবৃত্তি যখন তাদের গাঁটছড়া নিয়ে বিব্রত

যাতে উভয়ে অদ্ভুত এক সাহচর্যে বাঁধা পড়েছে
তখনই আবার তাদের সেই প্রণয়-কোশলের মুহূর্তে
কখনও বা প্রস্ফুরিত হয়ে ওঠে জ্ঞানদীপ্ত বহ্নিশিখা।
এখনও এখানে মহান্ চিন্তাসব নিঃসঙ্গে বিচরণ করে
অভ্রান্ত বাক্ রক্ষীরূপে এসেছে তাদের সঙ্গে,
অন্তর্জ্ঞানের জ্যোতি পরিয়েছে তাদের রাজ-পরিচ্ছদ,
এই হল ভগবানের প্রত্যক্ষ নির্দেশ;
প্রজ্বলিত শিখা তারা বার্তাবহ সুদূর সত্যের,
এসেছে তারা শাশ্বতের প্রান্ত হতে।
অনন্তের গর্ভ হতে নির্গত হবে বহ্নি এক,
বৃহত্তর দিব্য-প্রজ্ঞা এক দৃষ্টি দেবে জগতের উপরে,
পার হয়ে আসবে সুদূরের এক পূর্ণ-জ্ঞান হতে,
দেখবে জ্যোতির্ময় সাগরসব নিস্তব্ধ আত্মমুক্ত নিরালা হতে,
উদ্ভাসিত করে তুলবে আবার আর বিশ্ববস্তুর গভীর হৃদ্‌কন্দর;
কালমুক্ত জ্ঞান এক মনের কাছে নিয়ে আসবে,
লক্ষ্য নিয়ে আসবে জীবনের, অজ্ঞানের নিয়ে আসবে সমাপ্তি।

সমুচ্চে নিঃশ্বাসহারা বায়ুহারা মণ্ডলে এক,
যামিনত্রয়ীর মাথার উপরে ছায়া ফেলে চন্দ্রাতপ যেন,
রয়েছে অতীন্দ্রিয় দুজন লক্ষ্য যাদের সীমাহীন পারাস্তর,
বন্দী যারা স্বর্গের সীমাবেরা ব্যোমপ্রসারে,
কালের নিরন্তর পরিক্রমায় চলে তারা,
আকৃতি তাদের শাশ্বতের ঋজুপথ তরে,
তাদের ঊর্ধ্বস্থিতি হতে দৃষ্টিপাত করে এই জগতের পরে:
যুগল সূর্য-চক্ষু দেবশক্তি তারা, সাক্ষী বিশ্বসত্তার।
এই অলসগতি ভূমণ্ডলকে তুলে ধরবার জন্য মুক্তি এক
প্রাণময় মন মরুতের বেগে উড়ে চলে যেন বিরাট পক্ষীরাজ, অধিরাজ যেন,
অভ্যস্ত নয় সে পায়ে চলতে এই স্থির অচল মৃত্তিকাপরে
অভ্যস্ত সে সুনীল অনন্তের কোলে,
ভেসে চলতে রৌদ্রদীপ্ত আকাশে আর নক্ষত্রদীপ্ত বাতাসে;
দূর হতে দেখে সে অলব্ধ অমরের ভবন,
শোনে দূর হতে কণ্ঠ দেবতাদের।
মৃতি-বিধ্বংসী কালশক্তি-চূর্ণকারী,
উল্লঙ্ঘন করে যায় সীমা যত, চলে যায় নিয়মবন্ধের ওপারে,
ফেলে দেয় চিন্তাধারা যুগ-যুগান্তর উদ্ভাসিত ক'রে,

চলে সে অমানুষী শক্তির আশ্রয়ে যত কর্ম ক'রে।
আপনার পক্ষে ভর করে উড়ে যেতে পারে যতদূর স্বয়ংচালিত বিমান তার
আক্রমণ করে গিয়ে দূর ভবিষ্যের উপর দুঃসাহসে,
সন্ধান করে সে স্বপ্নময় নিয়তির বীথিকাশ্রেণী।
ধারণায় ধরে দিতে পটু, অক্ষম বাস্তবে অধিগত করতে,
কল্পিত-মানচিত্র আর দৃষ্ট-আলেখ্য এঁকে তোলে সে
অতি বিপুল ক'রে, মর্ত্য-আকাশে সে-সৌধ গড়ে তোলা যায় না।
পারান্তরে বৃহৎ প্রসারে, পাদপীঠ নাই যেখানে,
ভাবশিল্পী এক গড়ে বিদেহী ভাবরাজি,
জীবনের ইন্দ্রিয়ের আকুল আহ্বানে দেয় না সাড়া,
বিশুদ্ধ চিন্তাময়ী মন সাক্ষীরূপে দেখে যায় বিশ্বের বিশ্বকর্ম।
দেবদূত এক ওপারের শুভ্র মণ্ডল হতে,
চেয়ে দেখে এই জগৎ নিঃসঙ্গ তুঙ্গস্থান হতে,
জ্যোতির্ময় সুদূরের এক শূন্য আকাশে।

(দশম সর্গ সমাপ্ত)

ইন্দ্রজাল

দিলীপকুমার রায়

মা-কে পেলে ভুবন আলো,
না পেলে হয় আলোও কালো।
অন্তরে মা যেম্‌নি আসে,
অভয় ছায় আকাশবাতাসে।
তার পরে মা যায় সরে যেই,
প্রাণ কাঁদে: "কই কিছুই তো নেই।"
জাদুকরী! আলোর আলো
প্রেমের ছোঁওয়ায় তুমিই আলো।

ভোরে যেমন জলে স্থলে
মানিকমণির মালা ঝলে,
মা-র অরুণে তেম্‌নি নিশা
পোহায়—কাটে যুগের তৃষা,
হয় অবসান কাঁদনকাঁদা
পাষাণভাঙা সাধনসাধা।
মহামায়া! আলোর আলো
প্রেমের ছোঁওয়ায় তুমিই আলো।

মা-র নাম যে গায় অপারে,
পার পায় অকূলপাথারে।
কাঁটাবনে ফুল ফোটে তার,
পায় নিরাশায় নব আশার,
চোখের জলে ফোটে হাসি,
লতায় পাতায় বাজে বাঁশি।
জ্যোতির্ময়ী! আলোর আলো
প্রেমের ছোঁওয়ায় তুমিই আলো।

সন্ধ্যা, ৫-৫-৭৪

অন্বেষণ—আমাকে অথবা তোমাকে

সুমিত্রা রায়

আমাকে চাই, চাই যে শুধু আমারে :
আর কিছু নয়, চাইনে যে আর কাহারে।
হাট বাজারের কোলাহল, ভিতরে আর বাহিরে
খুঁজে ফিরি, হারিয়ে যাওয়া, নাম না জানা আপনারে।
বুড়ি ছুঁয়ে চলে যাই—ভিতরে আর ভিতরে—
ঘাট পেরিয়ে নৌকা চলে—বাহিরে আর বাহিরে।
আমাকে,—খুঁজবো এবার আমাকে
মিলায় শুধু এরা ওরা আর অনেকে।
মুখ দেখে মনে হয় কত যে চেনা
ভাল লাগে, তবু জানি আমি যে এ না।
সুরে সুরে গান গায় তোমরা,
না না আমি নয়, এও তোমরা, তোমরা।
এবার বুঝি পেলাম খুঁজে আমাকে
তাকিয়ে দেখি ঘরে আছি তোমাকে।
সব দেখা হ'ল সারা, পাইনা আমাকে,
ভিতর থেকে বাইরে দেখি—তোমাকে আর তোমাকে।

ওগো আমার দোসর !
কোথায় সাজাও বাসর !
বাহির কিংবা অন্তরে রও,
খুঁজব আমি, যেথায় লুকাও,
তোমারে চাই, চাই যে শুধু তোমারে
আনমনে দেখি কত
লোকের মেলা !
জনতার মুখে চাই
কোনটি কে বা ?
খুঁজে বলি এই বুঝি
এরা ওরা তারা ?
আঁখি মেলে দেখি এ যে
তোমরা—তোমরা !
তোমরা ? —তোমায়
কিছু বলব বলে ভাবি
হাসতে গিয়ে তুমি মিলাও
আমি আছি বাকি !
কারে দেখি, কি ই বা বলি,
তাকাই কাহার পানে।
আমিই শুধু তাকিয়ে আছি
লক্ষ আমার দিকে।

শ্রীঅরবিন্দ

পুষ্প রায়

উদয় তপন দীপ্ত ললাটে
নয়নে স্নিগ্ধ করুণা বৃষ্টি,
কণ্ঠে অভয় বাণীর মন্ত্র
হস্তে অমৃত সুধীর সৃষ্টি ॥

বক্ষে নীলিমা প্রসার ব্যাপ্তি
চরণে দুলিছে জীবন ছন্দ।
সমাধি গভীরে ধ্যান নিমগ্ন,
আলোকে দিশারি রহি অতন্দ্র ॥

পরম পুরুষ বিভু-নিয়ন্তা,
পাবক সুষমা বিমল কান্তি ॥
অংগে কনক জ্যোতি-তরঙ্গ ;
বিতরে অমিয় পরমা শান্তি ॥

তোমার তপের বহ্নি-আলোকে,
মথিয়া সিন্ধু অমৃত-বন্যা।
নিটালে তৃষিত মরুর বক্ষ,
করুণাসিক্ত পৃথিবী ধন্যা ॥

নিরখি গগনে চন্দ্র তপন,
অটল মহিমা শিখর অভ্র।
অশিব-বিজয়ী মূর্ত লীলায়,
খসিল জড়তা চেতনে শুভ্র ॥

হে নিখিল-গুরু ধরণী ধন্য,
পরশি তোমার পদারবিন্দ।
সকল প্রাণের দেবতা তুমি যে
যোগেশ্বর হে শ্রীঅরবিন্দ ॥

বেদমন্ত্র

ঋষি অত্রির অগ্নিমন্ত্র

৫ম মণ্ডল—অষ্টাদশ সূক্ত

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রাতরগ্নিঃ পুরুপ্রিয়ো বিশস্তবেতাতিথিঃ।
বিশ্বানি যো অমর্ত্যো হব্যা মর্তেষু রণ্যতি॥ ১॥

প্রাতঃ—প্রাতঃকালে
অগ্নিঃ—অগ্নি
পুরুপ্রিয়ঃ—বহুপ্রেয়ময়, বহুপ্রেয়পূর্ণ
বিশঃ—লোকসমূহের
স্তবেত—স্তুত হয়েছে
অতিথিঃ—অতিথি
বিশ্বানি—যাবতীয়
যঃ—যে
অমর্ত্যঃ—অমর
হব্যা—আহুতিরাজি
মর্তেষু—মরের মধ্যে
রণ্যতি—উপভোগ করে

বহুল প্রেয়ের আধার অগ্নিদেব প্রাতঃকালে যেন স্তুতিগ্রহণ করেন, মানুষের অতিথি তিনি, মরজীবের মধ্যে অমর তিনি, যাবতীয় আহুতির আনন্দ তিনি গ্রহণ করেন॥১॥

দ্বিতায় বৃক্তবাহসে স্বস্য দক্ষস্য মংহনা।
ইন্দুং সঃ ধত্ত আনুষক্ স্তোতা চিত্তে অমর্ত্যঃ॥২॥

দ্বিতায়—দ্বিতীয়টির জন্য (প্রথম দেহ, দ্বিতীয় প্রাণ, তৃতীয় মন)
বৃক্তবাহসে—বিশুদ্ধ আহুতির বাহকের জন্য
স্বস্য—আপনার
দক্ষস্য—নিপুণ বিচারবুদ্ধির
মংহনা—মহিমার সহায়ে
ইন্দুম্—আনন্দকে
সঃ—সে
ধত্ত—ধারণ করে

আনুষক্—নিরন্তর
হোতা—স্তবমন্ত্রে প্রতিষ্ঠাতা
চিৎ—এবং
তে—তোমার
অমর্ত্য—হে অমর

বিশুদ্ধ আহুতির বাহক দ্বিতীয় পুরুষের জন্য সে আপন দিব্যবিচারবুদ্ধির পরিপূর্ণতা নিয়ে নিরন্তর আনন্দধারা বহন করেছে, তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার স্তুতিমন্ত্রে, অমর সে ॥২॥

তং বো দীর্ঘায়ুশোচিষং গিরা হুবে মধোনাম্ ॥
অরিষ্টো যেষাং রথো ব্যশ্বদাবনীয়তে ॥৩॥

তম্—সেই তাকে
বঃ—আমরা
শোচিষম্—জ্যোতি
দীর্ঘায়ু—দীর্ঘজীবনের
গিরা—প্রকাশমন্ত্রে
হুবে—আহ্বান করি
মধোনাম্—প্রাচুর্য্যের অধিষ্ঠাতাদের জন্য
অরিষ্টঃ—অক্ষত
যেষাম্—যাদের
রথঃ—রথ
বি—বিস্তৃতভাবে, চারিদিকে
অশ্বদাবন্—হে অশ্বদাতা, হে অশ্বযুথদাতা
ঈয়তে—এগিয়ে চলেছে

জীবনের সুদীর্ঘ প্রসারে দীপ্তশিখা তুমি, তোমাকে আমরা আবাহন করি প্রকাশের মন্ত্র দিয়ে, প্রাচুর্য্যের দেবতাদের উদ্দেশ্যে, অবিঘ্নিত রথ এগিয়ে চলেছে সুপ্রসারে, তুমি দান কর অশ্বরূপী জীবনীশক্তি ॥৩॥

চিত্রা বা যেষু দীধিতিরাসন্নৃক্থা পান্তি যে।
ক্ষীর্ং বহিঃ স্বর্বরে শ্রবাংসি দধিরে পরি ॥৪॥

চিত্রা—বিবিধধারায় প্রোজ্জ্বল
বা—আর
যেষু—যাদের মধ্যে
দীধিতিঃ—দীপ্তবুদ্ধি
আসন্—মুখ মধ্যে, আস্যে

উক্থা—উক্তিসব
পাস্তি—ধারণ করেছে
যে—যারা
স্তীর্ণম্—বিস্তৃত হয়েছে
বর্হিঃ—যজ্ঞাসন
স্বঃনরে—স্বর্লোকের দেবশক্তির মধ্যে
শ্রবাংসি—শ্রৌতজ্ঞান সব, অনুপ্রেরণা সব
দধিরে—ধারণ করেছে, স্থাপন করেছে
পরি—চারিদিকে

যাদের মধ্যে দীপ্তবুদ্ধি বিবিধশোভায় উজ্জ্বল, যারা আপনাদের মুখের মধ্যে ধারণ করে দিব্য উক্তি, যজ্ঞাসন আস্তৃত হয়েছে চারিদিকে, স্বর্লোকের দিব্যশক্তির মধ্যে তারা স্থাপন করেছে যাবতীয় জ্ঞান-প্রেরণা ॥৪॥

যে নে পঞ্চাশতং দদুরশ্বানাং সধস্তুতি।
দ্যুমদগ্নে মহি শ্রবো বৃহৎ কৃধি মঘোনাং নৃবদমৃত নৃণাম্ ॥৫॥

যে—যারা
নে—আমাকে
পঞ্চাশতম্—পঞ্চাশটি
দদুঃ—দিয়েছে
অশ্বানাম্—অশ্বদের
সধস্তুতি—সিদ্ধমন্ত্রের মধ্যে
দ্যুমৎ—জ্যোতির্ময়, দ্যুতিময়,দ্যুমান
অগ্নে—হে অগ্নি
মহি—মহান
শ্রবঃ—শ্রৌতজ্ঞান
বৃহৎ—বৃহৎ
কৃধি—কর
মঘোনাম্—প্রাচুর্য্যময়
নৃ-বৎ—পৌরুষময় দিব্যসত্তা
অমৃত—হে অমর
নৃণাম্—দেবসত্তাদের জন্য

যারা আমাকে পঞ্চাশৎ প্রাণশক্তি দিয়েছে আমার সিদ্ধমন্ত্রের মধ্যে, হে অগ্নি, হে অমৃতময়, সৃষ্টি কর জ্যোতির্ময় বিপুল জ্ঞানানুপ্রেরণা, সৃষ্টি কর দেবসত্তাময় বৃহৎকে সকল প্রাচুর্য্যের অধিষ্ঠাতা সেই সব দেবসত্তাদের জন্য ॥৫॥

৫ম মণ্ডল—১৯শ সূক্ত

অভ্যবস্থাঃ প্র জায়ন্তে প্র বয়ের্বব্রিশ্চিকেত।
উপস্থে মাতুর্বি চষ্টে ॥১॥

অভি—উত্তরোত্তর
অবস্থাঃ—অবস্থা
প্রজায়ন্তে—জন্মগ্রহণ করে চলেছে
বয়ে—আবরণে
বব্রিঃ—আবরণ
প্রচিকেত—সজ্ঞান হয়ে উঠেছে
উপস্থে—ক্রোড়ে, কোলে
মাতুঃ—মাতার
বিচষ্টে—চারিদিকে চেয়ে দেখে

অবস্থার পর অবস্থা জন্মগ্রহণ করে চলেছে, আবরণের পর আবরণ খুলে গিয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে, মায়ের কোলে বসে সে চেয়ে সব দেখছে ॥

জুহ্বে বিচিতয়স্তোঽনিমিষং নৃম্ণং পান্তি।
আদৃক্ষাং পুরং বিবিস্তঃ ॥২॥

জুহ্বে—আহুতি প্রদান করে
বি-চিতয়স্তঃ—সর্বব্যাপক জ্ঞান যাদের
অনিমিষম্—নির্নিমেষ, অনিমেষ
নৃম্ণম্—মানুষী বীর্য্য
পান্তি—রক্ষা করে
দৃক্ষাম্—দৃঢ়
পুরম্—পুরী
আবিবিস্তঃ—প্রবেশ করে তারা

বৃহৎ চেতনায় সচেতন যারা তারা আহুতি প্রদান করে, তারা এক অতন্দ্র মানুষী বীর্য রক্ষা করে, প্রবেশ করে এক সুদৃঢ় পুরীর মধ্যে ॥২॥

আ ত্রৈত্রেয়স্য জন্তবো দ্যুমদ্ বর্ধন্ত কৃষ্টয়ঃ।
নিষ্কগ্রীবো বৃহদুক্থ এনা মন্বা ন বাজয়ুঃ ॥৩॥

ত্রৈত্রেয়স্য—ত্রয়ামাতার পুত্রের
জন্তবঃ—প্রাণীকুল, প্রাণীরা
দ্যুমৎ—দীপ্তিময় (অবস্থাকে)
আবর্ধন্ত—বর্দ্ধিত করে ধরে

কৃষ্টয়ঃ—কর্মীরা
নিকগ্রীব—সুবর্ণের হার কণ্ঠে যার
বৃহৎ উকৃথঃ—বাক্য বা উক্তি যার বৃহৎ
এনা—তার সহায়ে
মৎবা—মরুর সহায়ে
ন—যেন
বাজযুঃ—পূর্ণতাকামী

মানুষ যারা, কর্ম্ম করে চলে যারা, তারা শুভ্রা মাতার দ্যুতিকে বর্দ্ধন করে চলে আর গ্রীবায় যার সোনার হার, কণ্ঠে যার বৃহৎ বাণী তার আপন আনন্দমধুর কল্যাণে যেন সে পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে চলেছে ॥৩॥

প্রিয়ং দুগ্ধং ন কাম্যবজামি জাম্যোঃ সচা।
ঘর্মো ন বাজজঠরোঽদব্ধঃ শশ্বতো দভঃ ॥৪॥

প্রিয়ন্—প্রেয়
দুগ্ধন্—দুগ্ধ
ন—যেন
জাম্যোঃ—দুই যমজের
সচা—সঙ্গে রয়েছে
ঘর্মঃ—তেজময়, আলোর তেজ সে
ন—যেন
বাজজঠরঃ—পূর্ণতার উদর
অদব্ধঃ—অদমিত
শশ্বতঃ—চিরন্তন
দভঃ—দমনকারী

মাতৃস্তন্যের মত সে প্রেয় কাম্য, আপনি অদ্বিতীয় আছে সে দ্বৈতকে ধরে, আলোর তেজ সে যেন পূর্ণতার জঠর, অদমনীয় সে, চিরন্তন দমন করে চলেছে সব ॥৪॥

ক্রীড়ন্ নো রশ্ব আ ভুবঃ সং জন্বনা বায়ুনা বেবিদানঃ।
তা অস্য সন্ধৃষজো ন তিগ্মাঃ সুসংশিতা বক্ষ্যো বক্ষণেস্থাঃ ॥৫॥

ক্রীড়ন্—ক্রীড়া করে
নঃ—আমাদের সঙ্গে
রশ্বে—হে রশ্মি
আ-ভুবঃ—গড়ে ওঠ, জন্মগ্রহণ কর আমাদের মধ্যে

কাম্যান্—কাম্য
অজানি—তার যমজ কেউ নেই
সন্—একসঙ্গে
ভস্মনা—প্রস্বলন্ত
বায়ুনা—প্রাণবায়ুর সঙ্গে
বেবিদান—জ্ঞানবন্ত হয়ে
তাঃ—সেই সব
অস্য—এর, এই অগ্নির
সন্—হয় যেন
ধৃষজঃ—ধর্ষণপর, ধর্ষক, উগ্র
ন—আর, যেন
তিগ্মাঃ—তীক্ষ্ণ, তীব্র
সুসংশিতাঃ—সুশাণিত
রক্ষ্যঃ—বহনসমর্থ যারা
রক্ষণেস্বাঃ—বাহকের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত

হে রশ্মি, আমাদের সঙ্গে ক্রীড়ায় এস, আমাদের অন্তরে রূপগ্রহণ কর আর প্রস্বলন্ত প্রাণবায়ুর সঙ্গে সমজ্ঞানী হয়ে ওঠ, অগ্নির শিখা তারা সব হয় যেন উগ্র, তীক্ষ্ণ, সুশাণিত সামর্থ্য-বাহক দিব্যবাহকের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ॥৪ ॥

বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ

(অবতরণিকা)

গৌরী ধর্মপাল

যং কাময়ে তং তম্ উগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তম্ ঋষিং তং সুমেধাম্ ॥ (ঋগ্বেদ ১০।১২৫।৫)

বলছেন দেবীসূক্তের ঋষি-দেবতা বাক্, অর্থাৎ,

আমি যাকে চেয়ে বসি,
তাকে তাকে করি ওজস্বী, তাকে
ব্রহ্মা, মেধাবী, ঋষি।

বৈদিক ঋষির কাছে এই বাক্ হলেন ব্রহ্মের সঙ্গে এক, তাই ঋষি ত্রিত আপ্ত্য এর নাম দিয়েছেন ব্রহ্মী (ঋ ৯। ৩৩। ৫)। শব্দব্রহ্মে পরব্রহ্মে কোন তফাৎ নেই। 'যাবদ্ বৈ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্' বলছেন বৃহদারণ্যক, 'যতদূর ব্রহ্ম আছেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, ততদূর বাক্ও।'

এই বাক্‌কে শব্দকে কথাকে সবাই ব্যবহার করে কাজে লাগায়, কাটাছেঁড়া করে, এর শব্দ-রূপটুকু নিয়ে নাড়াচাড়া করে, এর শক্তি-রূপ স্পন্দ-রূপ ধাত্রী-বিধাত্রী-রূপ সম্বন্ধে অচেতন হয়ে, যেমন দামী হীরের টুকরোকে কাঁচ ভেবে জঞ্জালের টুকরিতে ফেলে দেয় সাধারণ মানুষ। কিন্তু কখনো কখনো হঠাৎ অঘটন ঘটে। কী অঘটন? না, এই বহুর মধ্যে থেকে একজন বাক্ কামনা করেন, পেতে চান, পেয়ে বসেন। বহুভোগ্যা হয়েও তাঁর যে আত্মস্বরূপটিকে তিনি আলোর আড়াল দিয়ে ঢেকে রাখেন বহুজনের সামনে, তাকেই হঠাৎ প্রিয়া পত্নীর মতো অনাবৃত করে ধরেন তাঁর স্বয়ংবৃত পতির কাছে, ভাগ্যবান্ কবির কাছে। বাকের এই বিচারিণী পক্ষপাতী ইচ্ছাময়ী স্বাধীন রূপটি চমৎকার ফুটিয়েছেন ঋষি বৃহস্পতি তাঁর জ্ঞানসূক্তে—

উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্ উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ (ঋ ১০।৭১।৪)

দেখেও দেখে না বাক্‌কে অনেকে,
শুনেও শোনে না কেউ কেউ এঁকে।
আবার এমনও কেউ কেউ আছে,
অনাবৃত করে দেন যার কাছে
তনুটি, যেন সে হৃদয়ের রাজা,
তিনি জায়া অপরূপ-সাজে-সাজা,
উজলা অধীরা কামিনী।

প্রায় একই কথা উপনিষদ বলছেন আত্মার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে—

নায়ম্ আত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যম্ এবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥(কঠ ১।২।২৩)

বেদ আউড়ে কি বক্তৃতা করে আত্মাকে পাবে? না।
পাবে না মেধায়, পাবে না হাজার শুনে।
বরণ করেন যাকে ইনি এঁকে সে-ই তো পায়,
তারি কাছে এই আত্মা মেলেন তনুটি তাঁর।

যে বাক্ সেই আত্মা। 'ওঙ্কার এবেদং সর্বম্' (মাণ্ডুক্য), বাকের ঋঙ্কার-ওঙ্কারই এই সব-কিছু। 'স আত্মা' (ঐ)—সে-ই তো আত্মা। বাক্-ব্রহ্ম-আত্মা তিনে এক, একে তিন।

শ্রীঅরবিন্দ এই বাকের ব্রহ্মের আত্মার স্বয়ংবৃত বর। বেদময়ী বাক্ তাঁর কাছে নিজে এসেছেন শতাব্দীর ব্যবধান পেরিয়ে, এদেশের অজ্ঞতা-প্রসূত আর ওদেশের বিজ্ঞতা-প্রসূত গোঁড়ামির মরুভীর হতে তাঁর মনীষাঋজুবল কবিচেতনার সুধাশ্যামলিম পারে, ঠিক যেমন এসেছিলেন হাজার হাজার বছর আগে ঋষি হতে ইচ্ছুক তপস্বীদের কাছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক প্রমাণ দিচ্ছেন, 'অজান্ হ বৈ পৃশ্নীংস্ তপস্যামানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু অভ্যানর্ষত্ ত ঋষয়োঽভবন্ (তৈ. আ, ২।৯।১)', তপস্যারত অজ পৃশ্নিদের কাছে যিনি আপনা-আপনি হয়েই আছেন সেই ব্রহ্ম অর্ষণ করলেন, এলেন (√ঋষ্ = গতি), যখনি তাঁরা ঋষি হলেন। যাঁর কাছে এই ব্রহ্মী বাক্ 'আসেন', বিশ্বব্যাপী স্পন্দন যাঁর আত্মস্পন্দন হয়ে ধরা দেয়, তিনিই ঋষি হন। শ্রীঅরবিন্দের কাছে ইনি স্থিরবিদ্যুৎ হয়ে ধরা দেবার আগে বার বার বিচিত্রভাবে ইসারা পাঠিয়েছেন, দূত পাঠিয়েছেন, দেখা-না-দেখায় নেশা হয়ে থেকেছেন, ইঙ্গিতে ডাক দিয়ে আবার দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের এই দীর্ঘদিনব্যাপী পূর্বরাগ এবং অবশেষে যুগলসম্মিলনের ফলই হল তাঁর সাবিত্রীঋদ্ধ দিব্যজীবন। তাই বোধহয় এঁর প্রথম আগমনের কাহিনী একটু বিস্তৃত করেই তিনি বলেছেন তাঁর 'বেদরহস্য' বইটিতে—

ধর্ম ইতিহাস এবং জাতিতত্ত্বের দিক থেকে (বেদের) এইসব প্রাচীন সূক্তের যে তাৎপর্য সে-সম্পর্কে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তগুলো আমি আর পাঁচজন শিক্ষিত ভারতীয়ের মতোই বিনা বিচারে নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিলাম, নিজে বেদ না পড়েই। ফলে, ঐ গড়-পড়তা আধুনিক হিন্দুদের মতো আমিও মনে করতাম উপনিষদই হল আসল বেদ, পরা বিদ্যার প্রথম পুঁথি, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রাচীনতম আকর। পরবর্তী যথার্থগ্রন্থ ঋগ্বেদ সম্পর্কে তখন আমার যা-কিছু জ্ঞান, তা ছিল শুধু তার আধুনিক অনুবাদগুলির মাধ্যমে। ঋগ্বেদকে আমি তখন ভাবতাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি দামী দলিলমাত্র, চিন্তার ইতিহাস বা জীবন্ত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে তার কোন মূল্য বা গুরুত্ব নেই।

বৈদিক ভাবধারার সংস্পর্শে আমি প্রথম এলাম একটু অন্যপথে, ভারতীয় যোগশাস্ত্রের নির্দেশিত কতগুলি আত্ম-সংস্কৃতির ধারা অনুসরণ করতে গিয়ে। আমার অজ্ঞাতসারে এই

ধারাগুলি আপনা থেকেই গিয়ে মিলে যাচ্ছিল সেই সব প্রাচীন পন্থার সঙ্গে যা আমাদের পূর্বপুরুষরা অনুসরণ করতেন, কিন্তু এখন আর বড় একটা কেউ করে না। সে-সময় আমার কতগুলি যৌগিক অনুভূতি নিয়মিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে উঠতে লাগল তাদের সঙ্গে জড়ানো কতগুলি প্রতীকী নাম। তার মধ্যে ছিল ইলা সরস্বতী আর সরমা এই তিনটি দেবীশক্তির রূপ যাঁরা বোধিমন বা দিব্যমনের চারটি বৃত্তির মধ্যে তিনটির অধিষ্ঠাত্রী। এই তিনটি হল আবিঃ বা দৃষ্টি (revelation), আবেশ বা শ্রুতি (inspiration) আর প্রাতিভসংবিৎ বা বোধি (intuition)। এর মধ্যে দুজন আমার কাছে বৈদিক দেবতা হিসেবে তত বেশী পরিচিত ছিলেন না, বরং জড়ানো ছিলেন বর্তমান হিন্দুধর্ম অথবা পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে—এঁরা হলেন বিদ্যার ঠাকুরাণী সরস্বতী এবং চন্দ্রবংশের জননী ইলা। সরমাকে অবশ্য ভালই চিনতাম। কিন্তু আমার মনের মধ্যে তাঁর যে রূপ ফুটছিল, তার সঙ্গে বেদের দেবশুনী (hound of heaven) সরমার কী যে সম্পর্ক তা কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলাম না, কেননা আমার স্মৃতিতে বৈদিক সরমা তখন জড়িয়ে ছিলেন Argive হেলেনের* সঙ্গে, আর তাঁকে ভাবতাম প্রাকৃতিক উষার প্রতিমা—যে-উষা অন্ধকারের গুহায় হারিয়ে যাওয়া আলোর গাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। বাইরের উপর আলো যে অন্তরের আলোরই প্রতিরূপ এই সঙ্কেতটি একবার ধরতে পারলেই অনায়াসে বোঝা যায় যে এই দেবশুনী (সরমা) হতে পারেন প্রাতিভসংবিৎ বা বোধি, যিনি অবচেতন মনের অন্ধগহ্বরে প্রবেশ করে বন্দী প্রজ্ঞার প্রভাস্বর জ্যোতিগুলিকে উদ্ধার করে ঝলমলিয়ে তোলার আয়োজন করছেন। কিন্তু এ সঙ্কেত তখনো ধরা দেয়নি, তাই অগত্যা মেনে নিয়েছিলাম যে (আমার দেখা রূপের সঙ্গে) শুধু নামটাই মিলছে, প্রতীক নয়।

দাক্ষিণাত্যে থাকার সময়ই আমার প্রথম সত্যিকার মন গেল বেদের দিকে। আর্যাবর্তের আর্য আর দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় এ দুয়ের জাতিগত বৈষম্য সম্পর্কে আমার যে পরের মুখে শোনা ধারণা ছিল তা বেশ বড়গোছের একটা ধাক্কা খেল, যখন লক্ষ্য করলাম—কে যেন আমায় লক্ষ্য করতে বাধ্য করল—দুটি জিনিষ। এতদিন ধরে এ-বৈষম্য আমার কাছে প্রতিষ্ঠিত ছিল দুটি বৈষম্যের ওপর—এক হল আর্যজাতি আর দ্রাবিড়জাতির মধ্যে শারীরিক গঠনের কল্পিত অমিল, আর একটি হল উত্তরভারতের সংস্কৃত ভাষাগুলির সঙ্গে দক্ষিণভারতের অসংস্কৃত ভাষাগুলির আরো স্পষ্ট অমিল। পরবর্তী যে-সব নৃতত্ত্ববিদ কল্পনা করছে যে ভারত উপদ্বীপের অধিবাসী হল একটি মূল অখণ্ড জাতি—দ্রাবিড় অথবা ইন্দো-আফগান—সেসব নৃতত্ত্ববিদের খবরও আমি রাখতাম বই কি, কিন্তু তখনো পর্যন্ত এসব কল্পনাকে আমি খুব বেশী গুরুত্ব দিই নি। কিন্তু দক্ষিণভারতে বাস করতে সুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই আমার টনক নড়ল যখন দেখলাম তামিল জাতির মধ্যে উত্তরের অর্থাৎ তথাকথিত আর্যদের চেহারাগুলো যেন বারবার দেখা দিচ্ছে। যেদিকে তাকাই, দেখে চমকে উঠি, একি, শুধু ব্রাহ্মণ

---

* Argive Helen: উত্তমল (Argos) হেলেন—প্রাচীন গ্রীক দেবী, যিনি সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা, পার্থিব সৌন্দর্যের ত্রিলোকমা প্রতিমা। গ্রীক পুরাণের ইনিই Selen, চন্দ্রিকাদেবী, আনন্দের প্রতিভূতি, আমাদের চন্দ্র যেমন চিন্তার রূপরসের উৎস। —ব. স.

নয়, সমস্ত বর্ণের সমস্ত শ্রেণীর দক্ষিণীদের মধ্যে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে আমার মহারাষ্ট্রী গুজরাটি হিন্দুস্থানী বন্ধুদের অনেকদিনের চেনা মুখ, চেনা আদল, চেনা চেহারা—এমন কি আমার আপন প্রদেশের বাঙালীদেরও, যদিও এ-সাদৃশ্যটা তত বেশী ব্যাপক নয়। আমার মনে হল ঠিক যেন উত্তরের সমস্ত জাতির একটি সম্মিলিত সেনাবাহিনী দক্ষিণের ওপর বন্যার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবিয়ে দিয়েছিল তার পূর্বতন অধিবাসীদের, যদি তারা থেকে থাকে। মোটামুটিভাবে একটা দক্ষিণী ছাঁচ ধরা পড়ছিল, কিন্তু জনে জনে শারীরিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে গিয়ে এই ছাঁচটিকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। শেষপর্যন্ত এইটাই দেখতে পেলাম—না দেখে পারলাম না—যে যা-কিছু সংমিশ্রণ ঘটে থাকুক, যা-কিছু আঞ্চলিক বৈষম্য গজিয়ে থাকুক না কেন, সমস্ত বৈচিত্র্যের অন্তরালে সমগ্র ভারতবর্ষের একই চেহারা—কি শরীরে, কি সংস্কৃতিতে।...তাহলে আমাদের ভাষাতাত্ত্বিকরা যে আর্য আর দ্রাবিড় জাতির মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ সীমারেখা টেনে রেখেছেন, তার কী হবে? কী আর হবে, উবে যাবে।... আর এই দ্বিজাতি-তত্ত্বকে জীইয়ে রাখার জন্যে যে ভাষায় ভাষায় ব্যবধান কল্পনা তার কী হবে? এখানেও আমার আগেকার ধারণা সব গোলমাল হয়ে গেল। তামিল ভাষার শব্দগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলাম, বাইরে থেকে চেহারায় এবং প্রকৃতিতে সংস্কৃত থেকে এত বেশি আলাদা হলে কি হবে, এক একটি শব্দ অথবা শব্দ-গোষ্ঠি যেন আমাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে যে কি করে সংস্কৃতের সঙ্গে তার দূরভগিনী লাতিনের, কখনো বা গ্রীকের, নতুনতর মিতালি স্থাপন করতে হবে। এক এক সময় এমন মনে হতে লাগল যে তামিল শব্দটি শুধু একটি আত্মীয় শব্দ-গোষ্ঠির পারস্পরিক সম্পর্কের ইসারা দিয়েই ক্ষান্ত হল না, নিজেই হয়ে দাঁড়াল ছিন্নসূত্রের সূত্রধার (অর্থাৎ ঐ তামিল শব্দটিকে ধরেই ঐ আত্মীয় শব্দগুলির অস্পষ্ট সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল)। এই দ্রাবিড় ভাষাটির মধ্যে দিয়েই আমি প্রথম আবিষ্কার করলাম যাকে আমি মনে করি আর্যভাষাসমূহের সত্যিকার ধর্ম, উৎস এবং বলা যেতে পারে ভ্রূণতত্ত্ব। কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় এতদূর পর্যন্ত অনুশীলন আমি চালিয়ে যেতে পারিনি, কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে দ্রাবিড় এবং আর্যভাষা-সমূহের মধ্যে সম্পর্কটা সাধারণত যা মনে করা হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক, এবং তার থেকে এ সম্ভাবনা স্বতই মনে ওঠে যে হয়ত এরা দুজনে একটি হারিয়ে-যাওয়া আদিম ভাষারই দুটি আলাদা হয়ে যাওয়া শরিক। তাই যদি হয়, তাহলে 'আর্যরা (বাইরে থেকে এসে) আক্রমণ করেছিল দ্রাবিড় ভারতবর্ষকে'—এই মতবাদের প্রমাণ হিসেবে রইল বাকি শুধু বেদ, দেখতে হবে বেদের সূক্ত এ সম্পর্কে কোন ইসারা-ইঙ্গিত দিচ্ছে কিনা।

অতএব এই দুনো কৌতূহল নিয়ে আমি প্রথম মূল বেদ পড়তে বসলাম। (এক কৌতূহল, ভারতবর্ষের মানুষের পূর্বপুরুষ কে? আর এক কৌতূহল, ভারতবর্ষের ভাষা-গুলির আদিজননী কে?) অবশ্য তখুনি তখুনি খুব গভীরভাবে অধ্যয়ন করার কোন অভিপ্রায় আমার ছিল না। কিছুদূর এগোবার পরই দেখলাম আর্য এবং দস্যুদের জাতিগত তফাৎ সম্পর্কে বেদেই ইঙ্গিত আছে এবং এই দস্যুরাই হল ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী—এসব কথাগুলো, আমি যতটা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশী জোড়াতালির ব্যাপার! বরং আমাকে যা আকৃষ্ট করল, তা হল এই যে আমি আবিষ্কার করলাম যে এইসব প্রাচীন সূক্তের

মধ্যে অবহেলায় পড়ে আছে একরাশ অধ্যাত্মচিন্তা ও অনুভূতির দুর্লভ সম্পদ। আর আমার চোখে এই উপকরণের মূল্য বেড়ে গেল যখন দেখলাম প্রথমত আমার নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলিকে বেদের এইসব মন্ত্র সুস্পষ্ট এবং যথাযথভাবে উদ্ভাসিত করছে, যে-সব অনুভূতির কোন পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা আমি যতদূর পড়েছি পাইনি, কি য়ুরোপীয় মনস্তত্ত্ব বিদ্যায়, কি যোগ বা বেদান্তের অনুশাসনে। আর দ্বিতীয়ত উপনিষদের অনেক দুর্বোধ্য জায়গা অনেক দুরূহ ভাবের ওপর এগুলি আলোকপাত করছে, যা আমি আগে ভাল করে বুঝতে পারি নি, সেই সঙ্গে পুরাণের অনেক কিছুকেও নতুন অর্থ দিচ্ছে।

ভাগ্যিস সায়ণভাষ্য পড়িনি, তাই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমার সুবিধে হয়েছিল। কেন না আমি স্বাধীনভাবে বেদের অনেকগুলি সাধারণ প্রচলিত শব্দের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে পারছিলাম...এই সব শব্দকে তাদের স্বাভাবিক অর্থে গ্রহণ করার যে অধিকার আমাদের আছে তারি ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। যেমন ধরা যাক ঋতম্ শব্দটি। বলতে গেলে যে-কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার এটি হল একটি চাবিকাঠি। এই শব্দটির অর্থ সায়ণ কখনো ধরেছেন 'সত্য', বেশির ভাগ সময়ই 'যজ্ঞ', কখনো বা 'জল'। অধ্যাত্মব্যাখ্যায় ঋতম্ শব্দের অর্থ সব সময়ই হল সত্য। সায়ণের আর একটা অভ্যাস হল শব্দে শব্দে যে সূক্ষ্ম অর্থের তফাৎ তাকে ধ্যাবড়া করে দিয়ে একটা সুস্পষ্ট মোটামুটি অর্থ লাগিয়ে দেওয়া। মননের ক্রিয়া বোঝাতে যত বিশেষণশব্দ আছে, সবই তাঁর কাছে একরা—'মেধাবী'। সেরকম শক্তির নানান বৈচিত্র্য বোঝায় এমন সব শব্দের বেদে একেবারে ছড়াছড়ি, (যেমন 'তরস্' < √তৃ ধাতু, সব বাধা ঠেলে সাঁতরে উত্তীর্ণ হওয়ার শক্তি। 'সহস্' < √সহ্ ধাতু, অভিভূত করার, হারিয়ে দেওয়ার শক্তি। 'ঊর্জ' < √বৃজ্ ধাতু, বেঁকিয়ে দেওয়ার, রূপান্তরিত করার শক্তি ইত্যাদি), সায়ণের কাছে সে সবই হল এক—'বল'। আমি তো বরং দেখলাম, এই শব্দগুলির মোটামুটি অর্থ যতই এক হোক না কেন, সেই অর্থের বর্ণালিতে ঠিক কোথায় কোন শব্দটির স্থান সেটিকে নির্ণয় করা এবং মনে রাখা, এবং প্রত্যেক শব্দের যথার্থ ভাবানুষঙ্গ ঠিকমত লাগানো—এইটাই হল সব চাইতে প্রয়োজন। আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, কেন আমরা এটা ধরে নেব যে বৈদিক ঋষিরা অন্য শ্রেষ্ঠ কবিদের মত নন, তাঁরা শব্দের যথার্থ ভাবানুষঙ্গকে অনুভব না করে, ধ্বনি-বিন্যাসের মধ্যে তাদের ঠিক মোরটি না ফুটিয়ে, যেমন-তেমন ভাবে এলোপাতাড়ি শব্দ প্রয়োগ করেছেন?

এই নীতি অনুসরণ করে আমি দেখতে পেলাম যে শব্দের এবং বাক্যের সরল স্বাভাবিক অকৃত্রিম সোজাসুজি অর্থ থেকে বিচ্যুত না হয়ে বেদের ঋক্—শুধু ঋক্ নয়, গোটা গোটা ঋক্-গুচ্ছ—এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল যাতে সমস্ত বেদের চেহারাটাই বদলে গেল। তখন দেখলাম এই পবিত্র গ্রন্থের সবটা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে গভীরতম মনীষা এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি স্বর্ণ-শিরা—a constant vein of the richest gold of thought and spiritual experience, যা এর অধিকাংশ সূক্তে কখনো সরু কখনো চওড়া হয়ে ঝিলিক দিচ্ছে।

(On the Veda, পৃ: ৩৮-৪৩)

এই হল শ্রীঅরবিন্দের বেদের সোনার খনি আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*। এই যাকে এতদিন সাধারণ বালিনাটি বলে ভেবে এসেছিলেন, তার মধ্যে হঠাৎ এই পরমোৎকৃষ্ট নিখাদ সোনার অত্যাশ্চর্য অক্ষয় ভাণ্ডার আবিষ্কার শ্রীঅরবিন্দের মনকে কি বিস্ময়ে আনন্দে ভরে তুলেছিল, তা আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি। সেই আনন্দবারিধিরই বিপুল উল্লোচ্ছ্বাস 'আর্য' পত্রিকা—

The Arya presents a new philosophy, and a new method of Yoga, of course, in reality, it is only the old brought back again, but so old, that it has been forgotten. I have been given a religious and philosophical mission, to re-explain the Veda and Vedanta (*i.e.* Upanishads) in the ancient sense which I have recovered by actual experience in Yoga and to popularise the new system of Yoga (new in arrangement and object) which has been revealed to me. (Light and Superlight)

'আর্যপত্রিকা দিচ্ছে একটি নতুন দর্শন, যোগের একটি নতুন পদ্ধতি। অবশ্য আসলে পুরোনকেই ফিরিয়ে আনা হয়েছে নতুন করে। কিন্তু সে পুরোন এত পুরোন যে তা ভুলে গেছে সবাই। আমাকে একটি ব্রত দেওয়া হয়েছে—তা হল বেদ এবং বেদান্তের (অর্থাৎ উপনিষদের) পুনর্ব্যাখ্যান তার প্রাচীন অর্থে, যে-অর্থ আমি আবিষ্কার করেছি যৌগিক উপলব্ধির মাধ্যমে; আর সেই নতুন যোগ-পদ্ধতির প্রচার—নতুন মানে নতুন উদ্দেশ্যে নতুন ভাবে সাজানো—যা আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।'

বেদ বলতে সংহিতা অর্থাৎ মন্ত্রসংকলন, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, এবং উপনিষদ এই সব-গুলিকেই বোঝায়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বেদ বলতে বিশেষ করে বুঝেছেন ঋগ্বেদ-সংহিতাকে, কেননা এইটিই হল আদিবেদ। উপনিষদ্‌কে তিনি শুধু উপনিষদ্‌ই বলেছেন। এই উপনিষদ্‌ নিয়ে তিনি অনেকদিন ধরেই নাড়াচাড়া করছিলেন।

১৮৯৩ এর গোড়ায় দেশে ফিরেই তিনি বরোদায় চাকরি নিলেন ২১ বছর বয়সে। ২১ থেকে ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তের বছর ধরে তিনি অক্লান্ত পড়াশোনা করেছেন, বিশেষ করে সংস্কৃত। 'My interests lay outside in Sanskrit, literature and in the National movement'. (Evening Talks, 18th Dec., 1938). পুরাণীর Life of Sri Aurobindo (P. 58)। সংস্কৃতকে সর্বাগ্রে স্থান দিচ্ছেন। তাঁর কিংস কলেজের সহপাঠী আইরিশ অধ্যাপক শ্রীলেপারের বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি তখনই সংস্কৃতের ছাত্র ছিলেন। (পুরাণী. P. 48) পুরাণীজী আরো লিখছেন, ম্যাক্স মূলর-সম্পাদিত Sacred Books of the East গ্রন্থ-মালার অনুবাদগুলি তিনি পড়েছিলেন এবং এগুলি পড়তে পড়তেই 'আত্মা' শব্দটির সঙ্গে তিনি

---

* এই সময়টি, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক, এদেশে বেদ চর্চার নব পর্যায়ের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাল। এই সময়ই লিখিত হয় আরো দু'জন তত্ত্বদর্শী বেদমর্মজ্ঞ আচার্যের দু'টি যুগান্তকারী গ্রন্থ—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'যজ্ঞকথা' ও স্বামী শুদ্ধানন্দানন্দ সরস্বতীর 'বেদ ও বিজ্ঞান'।

পরিচিত হন, তাঁর মনে হয় এর ভেতরে কিছু সত্য আছে এবং বেদান্ত জীবনে অনুভব করার মত একটা জিনিষ (P. 46)। এই গ্রন্থমালার মধ্যে আছে ম্যাক্সমুলর কৃত উপনিষদের অনুবাদ, কাশীনাথ তেলাঙের ভগবদ্ গীতার অনুবাদ, নির্বাচিত বৈদিক সূক্তের অনুবাদ ম্যাক্সমুলর ও ওল্ডেনবার্গের করা, থিবো-কৃত শঙ্করভাষ্য এবং রামানুজের শ্রীভাষ্য সমেত বেদান্তসূত্রের অনুবাদ, গ্রুমফিল্ডের অথর্ব-বেদের অনুবাদ—এছাড়া ধম্মপদ, বৌদ্ধ-সুত্তসমূহ, জৈনসূত্র, কোরাণ, জেন্দাবেস্তা ইত্যাদি। সুদীর্ঘ চোদ্দবছরব্যাপী ইংলণ্ডপ্রবাসের সময় তিনি গ্রীক লাতিন খুব ভালো করে পড়েছেন এত ভালো যে গ্রীক ও লাতিন কবিতা লেখার জন্যে কিংস কলেজে চোকার চের আগে থেকেই ইংরিজি আর ফরাসী সাহিত্য পড়েছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ইতালীয় আর জার্মান এ দুটি ভাষাও নিজের চেষ্টায় কিছুটা আয়ত্ত করেছিলেন মহাকবি দান্তে গ্যেটের মূল রচনা পড়ার জন্যে। একটু আধটু স্পেনীয় ভাষাও শিখেছিলেন, হয়ত খেয়ভান্টিসের অতুলনীয় রচনা তাঁরি ভাষায় পড়ার জন্যে। পরে বরোদায় থাকার সময় শিখেছেন মারাঠি গুজরাতী ও আরো কয়েকটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা। এতগুলি ভাষার সঙ্গে যাঁর পরিচয় ভাষার শ্রেষ্ঠ ফসল সাহিত্যের মাধ্যমে, ভাষার উৎপত্তি ক্রমবিকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর বিচার করার যোগ্যতা স্বভাবতই অনেক বেশী যে-কোন ডিগ্রির-পণ্ডিতের চেয়ে। ভবিষ্যতের ভাষাতত্ত্বের যে খসড়াটি তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর The Origins of Aryan Speech প্রবন্ধে, তা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ হলেও ভাষাতত্ত্বের সঠিক বিচার-প্রণালী সম্পর্কে তাতে এমন সব অমূল্য ইঙ্গিত রয়েছে যা ভবিষ্যতের ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তি-প্রস্তর বলে গণ্য এবং মান্য হবার যোগ্য।

তাঁর জীবনের সাড়ে তেরো বছর ব্যাপী বরোদা-পর্ব হল বিশেষভাবে ভারতীয় ভাষা সাহিত্য ধর্ম তথা সংস্কৃতিতে অবগাহন করার কাল। ইংলণ্ডে থাকতে যতটা সংস্কৃত শিখে-ছিলেন, তাই সম্বল করে কোন পণ্ডিতের সহায়তা ছাড়াই তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গভীরে ডুব দিলেন। সংস্কৃতের ধ্বনি ভাব ও রসের মধুতে মজল তাঁর মন-ভ্রমরা। সংস্কৃত সাহিত্যের মহারথীদের মুখোমুখি পরিচয় এবং বন্ধুত্ব হল—ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস ভর্তৃহরি। পড়লেন মূল গীতা, পড়লেন মূল উপনিষদ্‌গুলি। একসময় প্লেটো-প্রমুখ গ্রীক লেখকের রচনা অনুবাদ করেছেন ইংরিজিতে, এখন সুরু করলেন সংস্কৃতের অনুবাদ। তাঁর কবিপ্রতিভার একটি প্রধান বিলাসশক্তি হল এই অনুবাদ। যে-কাব্য তাঁর হৃদয়স্পর্শ করেছে তার সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়েছেন এই অনুবাদের মাধ্যমে। দুটি কাব্যপ্রতিভার মিলনে জন্ম নিয়েছে নিত্য নতুন কাব্যপুরুষ।

যে পণ্ডিচেরীতে এসে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি সিদ্ধিতে রূপ নিল, প্রতিভাত হল বেদ, সর্বমনুষ্যের মন্ত্র জাগল, দিব্যজীবনের ছবি ফুটল স্পষ্ট হয়ে, সেই পণ্ডিচেরীর প্রাচীন ইতিহাস কী? ভারতবর্ষে এত জায়গা থাকতে এইটিকেই বা তাঁর সাধনপীঠ বলে নিয়তি চিহ্নিত করল কেন? সবটাই কি আকস্মিক, না, খুঁজলে কোন কারণপরম্পরা পাওয়া যাবে?

কিংবদন্তী বলে পণ্ডিচেরীর প্রাচীন নাম হল বেদপুরী। ঋষি অগস্ত্যের আশ্রম ছিল এখানে।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসে ঋষি অগস্ত্য একটি অত্যুজ্জ্বল নাম। পুরাণে ইনি

একজন অদ্ভুতকর্মা মহাতেজস্বী ঋষি—অতুলনীয় তপোবীর্যে শুষছেন সমুদ্র, নিপাত করছেন ব্রহ্মদ্বেষী ব্রহ্মঘাতক পরাক্রান্ত বাতাপিকে, স্তম্ভিত করছেন বিন্ধ্যপর্বত—এঁর সিদ্ধির শক্তি লোককল্যাণের জন্য নিয়োজিত। বিন্ধ্যের ওপারে দক্ষিণে গিয়ে আর কোনদিন ফেরেন নি অগস্ত্য। তাই এখনো অগস্ত্যযাত্রা শব্দটি আমাদের ভাষায় চলে আসছে।

ঋগ্বেদের মধ্যে এঁর যে পরিচয় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে পুরাণের বর্ণনার যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। ঋগ্বেদে ইনি আত্মপরিচয় দিয়েছেন 'মানস্য সূনুঃ', 'মান্য' বা 'মান' ব'লে—অর্থ, মানের পুত্র। যার থেকে মানুষ শব্দটি এসেছে, সেই মন্-ধাতুর সঙ্গে মান-শব্দটির যোগ খুবই স্পষ্ট। অর্থাৎ অগস্ত্য হলেন মানুষ, মানুষের ছেলে, Son of Man. তাঁর অলৌকিক জন্মের একটি কাহিনী আছে ঋগ্বেদে। কাহিনীটি এই—আকাশে বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল উর্বশীর মনোজ্যোতিঃ, সেই অপরূপ রূপের দ্যুতি টলিয়ে দিল যুগল দেবতা মিত্র-বরুণকে। মানুষের দিব্যবস্তুর টানে তাঁদের ক্ষরিত তেজোবিন্দু নেমে এল এই আধারে, এই কুম্ভে, এই দেহঘটে, সত্তার প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি কমলে। জন্ম হল, নতুন জন্ম হল দুটি মানুষের—কুম্ভযোনি অগস্ত্য আর কুম্ভযোনি বসিষ্ঠ (ঋগ্বেদ ৭।৩৩।১০-১৩):

কে মিত্র? কে বরুণ? বরুণ হলেন শাশ্বত রাত্রি। মিত্র হলেন তার বুকে অনন্ত সূর্যোদয়। মিত্র সাতটি তারা, সৃষ্টির সপ্ত ভুবন। বরুণ সেই সাতটি তারার তিনিত্র। বরুণ অন্ধকার, মিত্র সেই অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো। বরুণ সত্য, মিত্র সেই সত্যের ঋতচ্ছন্দ। দুয়ে মিলে এক ওতপ্রোত লয়। বরুণ কালো গরু, মিত্র সাদা দুধ, যার এই দেহ হল সেই দুধ খাবার বাটি। 'উরু' মানে বৃহৎ। √ঘন্ ধাতুর দুটি অর্থ—ব্যাপ্তি ও সম্ভোগ, বৃহতের আনন্দই উর্বশী। উর্বশীর নৃত্যের তালে তালে মিত্র বরুণের ছন্দ নামে সাধকের আধারে। তখন একদিকে সে হয় বসিষ্ঠ, আলোয় আলো (√বস্—আলো দেওয়া), দ্যুলোকের পানে মেলে ধরা আলোর কমল, আর একদিকে সে হয় অগস্ত্য, কালো আগুন, অন্ধকারের খনি খুঁড়তে খুঁড়তে চলে অচেতনার সাগরের সন্ধানে, সেই সাগরকে শুষবে আত্মসাৎ করবে, জয় করবে সব দেববিরোধী অপশক্তিকে যারা মানুষী সত্তার কন্দরে কন্দরে ওৎ পেতে আছে—এই তার সঙ্কল্প।

ঋগ্বেদে ছয় ঋকের একটি ছোট্ট সূক্ত আছে—অগস্ত্য লোপামুদ্রা এবং অগস্ত্যশিষ্য এই তিনজনের সংবাদ অর্থাৎ কথোপকথন। এই সূক্তটিতে স্বল্পপরিসরের মধ্যে অগস্ত্যের এই পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে।

সুদীর্ঘ তপস্যার শেষে ক্লান্ত হতাশ লোপামুদ্রা বলছেন,

পূর্বীর্ অহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষা বস্তোর্ উষসো জরয়ন্তীঃ।
মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনাম অপ্যূ নু পত্নীর্ বৃষণো জগন্যুঃ

কত বচ্ছর দিন রাত শ্রম করেই চলেছি করেই...
এল আর গেল কত কত উষা, বুড়ো হলাম।
অঙ্গে অঙ্গে যত রূপ ছিল, জরা ঝরায়—
আর না। এখন পত্নীর কাছে পতি আসুক।

যে চিদ্ ধি পূর্ব ঋতসাপ আসত সাকং দেবেভির অবদন্ন ঋতানি।
তে চিদ্ অবাসুর্ ন হ্যন্তব্ আপুঃ সব্ উ নু পত্নীর্ বৃষণো জগম্যুঃ
ঋতের রসিক, ছিল যারা আগে,
দেববৃন্দের সঙ্গে কইত ঋতেই কথা,
তারাও সবাই নামিয়ে ও নেমে পায়নি তল,
যাস্নুক, এখন পত্নীর কাছে পতি যাস্নুক।

অগস্ত্য তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজের অদম্য সঙ্কল্প ঘোষণা করে বলছেন—

ন নূষা শ্রান্তং যদ্ অবন্তি দেবা বিশ্বা ইত্ স্পধো অভ্যশ্নবাব।
জয়াবেদ্ অত্র শতনীথব্ আজিং যত্ সম্যঞ্চা মিথুনাব্ অভ্যজাব
বৃথা হয়নি সে তপস্যা, প্রিয়ে, দেবতারা যাকে আগলে আছেন,
স্পর্ধিত যত শক্তিকে এস উপভোগ করি দুজনে।
শতমুখী সেই যুদ্ধকে জয় করবই জয়, এখানেই,
একার হয়ে যার দিকে ধেয়ে চলেছি আমরা যুগলে।

উপসংহারে অগস্ত্যশিষ্য দুটি ঋকে তুলে ধরলেন অগস্ত্যের জীবনদর্শন ও সাধনা—

ইমং নু সোমম্ অন্তিতো হৃত্সু পীতম্ উপ ব্রুবে।
যত্ সীম্ আগশ্ চকৃমা তত্ সু মৃলতু পুলুকামো হি মর্ত্যঃ
অগস্ত্যঃ ধনবানঃ ধনিত্রৈঃ প্রজাম্ অপত্যং বলম্ ইচ্ছমানঃ।
উভৌ বর্ণাব্ ঋষির্ উগ্রঃ পুপোষ সত্যা দেবেষু আশিষো জগাম
এই যে পেয়েছি সোম হৃদয়ের গভীরে
তার কাছাকাছি গিয়ে বলছি,
ক্ষমা কর নিঃশেষে যা কিছু করেছি পাপ,
মানুষের অনেক যে কামনা।

কত কি খন্তা দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে চলেছেন
অগস্ত্য—চেয়ে চেয়ে অক্ষয় সন্ততি, বীর্য।
তেজস্বী ঋষি দুটি বর্ণকে দিলেন যে পুষ্টি,
হলেন সত্যকাম, গিয়ে সব দেবতার মধ্যে।

এই দুটি বর্ণ হল দেবতা আর মানুষ। অদ্ভুতকর্মা তেজস্বী ঋষি দেবতাকে করেছেন মানুষ, মানুষকে করেছেন দেবতা। মিলিয়ে দিয়েছেন পার্থিব আর দিব্য বস্তু, পার্থিব জীবন আর দিব্য জীবন।

জ্ঞাতসারে হোক্, অজ্ঞাতসারে হোক, এই মহর্ষির সাধনাপূত ঐতিহ্যমণ্ডিত বেদপুরীকে তাঁর সাধনপীঠ করেছেন এযুগের দিব্যজীবনের ঋষি, সমুদ্রবিশাল চেতনার কবি শ্রীঅরবিন্দ।

যিনি একাধারে বসিষ্ঠ ও অগস্ত্য, দিবোদাস ও মহীদাস Son of God ও Son of Man—সেই উর্বশীর বর-ও-পুত্র অরবিন্দকে নমস্কার।

———

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

ভক্তি প্রসঙ্গে

ভক্তি হলো মুক্তির দুয়ারের চাবিকাঠি। —শ্রীমা

৪০৮—আমি প্রকৃত ভক্ত নয়, কারণ ভগবানের জন্য জগৎকে আমি ত্যাগ করিনি। কেমন ক'রে ত্যাগ করব, যখন নিজেই তা কেড়ে নিয়ে তিনি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবার নিজেই সেটি চাপিয়ে দিলেন। কাজেই তা আমার পক্ষে কঠিন দাঁড়িয়েছে।

৪০৯—আমি ভক্তও নই আর জ্ঞানীও নই, ভগবৎকর্মীও নই, তাহলে কী আমি? কেবল প্রভুর হাতের যন্ত্র মাত্র, দিব্য রাখালীর হাতের বাজাবার বাঁশি মাত্র, সেই প্রভুর প্রশ্বাস-বায়ুভরে ওড়া ছিন্নপত্র মাত্র।

৪১০—কর্ম ও জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি পুরোপুরি পাকা হয়না।

ভগবানের পিছু নিয়ে যদি তাঁর নাগাল পেতে চাও তাহলে আগে বাস্তবভাবে না পাওয়া অবধি তাঁকে ছেড়োনা। বাস্তব স্বরূপে পেলে তখন চাইবে তাঁকে সমগ্র ও সম্পূর্ণরূপে পেতে। প্রথম প্রাপ্তির ফলে লাভ করবে দিব্যজ্ঞান, আর দ্বিতীয় প্রাপ্তির ফলে হবে দিব্য-কর্মলাভ এবং বিশ্বগত মুক্তি ও নিরেট আনন্দ।

৪১১—অন্যজনেরা তাদের ভগবৎপ্রীতি নিয়ে গৌরব করে। কিন্তু আমার গৌরব এই যে ভগবানকে আমি নিজে চাইনি, স্বয়ং তিনিই আমাকে খুঁজে নিয়েছেন আর ভালোবেসেছেন আর বাধ্য করেছেন আমাকে তাঁরই নিজস্ব জিনিস হয়ে যেতে।

৪১২—যখন জানলাম যে ভগবান হলেন এক নারী, তখন কেবল দূর থেকেই তাঁকে একটু ভালোবাসতে শিখলাম; কিন্তু আমি নিজেই যখন নারী হয়ে বঁধুর ও পরমপ্রভুর দাসী হলাম তখনই ভালোবাসা পুরোপুরি জানলাম।

মা: শ্রীঅরবিন্দ পরিহাস করায় খুব পটু ছিলেন, তাই আমরা এখানে তাঁর এই কথাগুলি মেনে নিয়ে চুপ করেই থাকি। ২০-৩-১৯৭০

প্রশ্ন: মা, শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"আমি কেমন ক'রে ত্যাগ করি যা তিনি কেড়ে নিয়ে আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেই সেটি ফিরে চাপিয়ে দিলেন." আবার এখানে তিনি বলেছেন, "যখন জানলাম যে ভগবান নারী", এ সকল কথার অর্থ কি?

মা আমি বলতে পারি না, কারণ নরদেহে যখন ছিলেন তখন তিনি আমাকে এ

নিয়ে কিছু বলেন নি। কেউ যদি জানে যে ঠিক কোন সময়ে তিনি ওগুলি লিখেছেন তাহলে একটা হদিশ মিলতে পারে। হয়তো "ন" জানবে যে কখন তা লেখা হয়েছে, বা শ্রীঅরবিন্দ তাকে তখন কিছু বলেছেন কিনা।

(পরে জানা গেছে যে ওগুলি শ্রীঅরবিন্দ লেখেন পণ্ডিচেরিতে আসার ঠিক পরেই। তিনি তখন নিজের নামই করতেন কালী বলে আর বলতেন যে কৃষ্ণ ও কালী একই, আর শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন এক সময় নারীর মতো হয়ে আচরণ করেছিলেন কৃষ্ণভক্তিতে সেই ভাবই এখানে তিনি রহস্যচ্ছলে লিখেছিলেন।)

৪১৩—ভগবানের সঙ্গে ব্যভিচার ভোগের জন্যই জগতের সৃষ্টি।

প্রশ্ন : এটির অর্থ বুঝলাম না।

মা শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব পরিহাসপটুতার এ এক নিপুণ ভঙ্গী, এতে মানুষের নীতিবাদকে উপহাস করা হলো। সুন্দর এক ব্যাঙ্গোক্তিমাত্র। ২১-৩-১৯৭০

৪১৪—ভগবানকে ভয় করা মানে প্রকৃতপক্ষে তাঁর থেকে দূরে সরে থাকা, তবে লীলা বা খেলা করা হিসাবে ভয় করাতে বরং আনন্দের তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দেয়।

৪১৫—ভগবানভীত মানুষ হলো য়িহুদীর সৃষ্টি ; আর ভগবানজ্ঞানী ও ভগবৎপ্রেমিক মানুষ হলো ভারতের সৃষ্টি।

৪১৬—ঈশ্বরদাস জন্মেছে জুডিয়াতে (Judaea) ; আরবদেশে সেই মানুষ সাবালক হলো। আর ভারতের আনন্দ দাস-ভক্ত হয়ে।

৪১৭—পরিপূর্ণ প্রেমে ভয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ; তথাপি নির্বাসিতদের সম্বন্ধে মনের মধ্যে কিছু করুণ স্মৃতির ছায়া রেখো, এতে পরিপূর্ণতা হবে আরো পূর্ণতর।

৪১৮—তোমার আত্মা এখনও ভগবানের সমগ্র আনন্দের আস্বাদ পায়নি—যদি সে তাঁর পরিকল্পনাদির বিরুদ্ধে লড়াই করে মারাত্মক যুদ্ধে যেতে তাঁর শত্রু হবার যে আনন্দ তা উপভোগ না ক'রে থাকে।

৪১৯—নিজেকে যদি তুমি ভগবানকে দিয়ে ভালোবাসাতে সক্ষম না হও, তাহলে বরং তাঁকে তোমার বিরুদ্ধেই লড়িয়ে দাও। কারণ যদি তিনি তোমাকে স্নেহের আলিঙ্গন নাই দেন, তথাপি অন্ততপক্ষে কুস্তির ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে তাঁর তোমাকে জড়িয়ে ধরতে হবেই।

৪২০—ভগবানের সঙ্গে আত্মা আমার লড়তে গিয়ে তাঁর বন্দী হয়েছে। যদিও

সে লড়াই অনেক অনেক আগেকার, তথাপি তার স্মৃতি এখন একে আনন্দে ও আতংকে ও বিস্ময়ে ভরিয়ে রেখেছে।

প্রশ্ন : মা, "তাঁর শত্রু হবার মতো আনন্দ" শ্রীঅরবিন্দ এ কথা বলেছেন কেন?

মা তাঁর এ কথার উত্তর আমি ঠিক জানি না, তিনি আমায় কিছু বলেন নি। তবে আমার তরফ থেকে বলতে পারি নিজের সম্বন্ধে। ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত আমি জানতাম কেবল ধর্মের বোঝানো ভগবানের কথা, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যেমন ভাবে ভগবানকে বর্ণনা করিয়েছে, আর তেমন ভগবানকে আমি একেবারেই চাইতাম না। সে ভগবানের অস্তিত্বকে আমি অস্বীকার করতাম, তেমন ভগবান থাকলেও তাঁকে আমি ঘৃণাই করতাম। পরে যখন বয়স প্রায় ২৫ বছর তখনই আমি ভিতরের ভগবানকে আবিষ্কার করি, আর তখনই জানতে পারি যে পাশ্চাত্যের ধর্মগুলি যে ভগবানের কথা বলে থাকে সে পরম শত্রু ছাড়া কিছু নয়।

১৯১৪ সালে যখন ভারতে আসি আর শ্রীঅরবিন্দের দেওয়া শিক্ষাগুলি যখন আয়ত্ত করি তখন সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল। ২৪-৩-১৯৭০

৪২১—পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি ঘৃণা করেছি আমি ব্যথাবেদনাকে, কিন্তু ভগবান যখন আমাকে ব্যথা দিয়েই পীড়ন করলেন, তখন জানতে পারি যে ব্যথা আনন্দেরই বিকৃত বিরূপ মূর্তি।

৪২২—ভগবান যে ব্যথা আমাদের দেন তার চার রকম পর্যায় আছে অর্থাৎ ব্যথা যখন নিছক ব্যথাই ; আর যে ব্যথার মধ্যে সুখও থাকে ; আর যে ব্যথার অর্থ আনন্দ ; আর যে ব্যথার মধ্যে তীব্রতর আনন্দানুভূতি।

৪২৩—এমন কি যখন তুমি আনন্দের এতই চরমে উঠে গেছ যাতে ব্যথা মাত্রই অদৃশ্য হয়েছে, তখনও কিছু তা লুকোনো থাকে তীব্র উল্লাসের অসহ্যতাতে।

৪২৪—তাঁর আনন্দের উচ্চ থেকে উচ্চতর ধাপে উঠে যখন জানতে চাই যে এর আরো বেশি বাড়ার শেষ আছে কিনা, তখনও ভয় করি তাঁর দৃঢ় আলিঙ্গনের অত্যধিক চাপকে।

প্রশ্ন : মা, শ্রীঅরবিন্দ "ব্যথার চার পর্যায়" নিয়ে কি বলতে চেয়েছেন?

মা : তিনি যদি নৈতিক ধরনের ব্যথার কথা বলে থাকেন, অভিজ্ঞতা থেকে বলব যে তা হলো চেতনারই চার রকম অবস্থা, যা আভ্যন্তর ক্রমবিকাশ ও দিব্যানুভূতি দ্বারা ভগবৎ-মিলনের মাত্রা অনুযায়ী আসে। সেই পূর্ণ মিলনে তীব্র আনন্দানুভূতি ছাড়া আর কিছু নেই। আর দৈহিক ব্যথা সম্বন্ধে হলে বলব যে অবশ নির্ধারিত ভাবে তা জানা যায় না। তবে ভগবৎ মিলন যত এগোয় ততই ব্যথার দখল ছেড়ে যায়।* ২৫-৩-১৯৭০

—শ্রীমা

* অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচার্য

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

এপ্রিল ১৪, ১৯৫৪

প্রশ্ন মধুময়ী মা, এখানটা আমি বুঝতে পারিনি (মায়ের On Education থেকে) —"অভিব্যক্তির আদি থেকেই, মূল প্রেমের মূল উৎসতে দুই দিকের দুই রকম ক্রিয়ার একত্র মিলনের দ্বারা প্রেম সুসম্পূর্ণ হয়। একদিকেতে থাকে প্রবল আকর্ষণশক্তি, আর অন্য-দিকেতে থাকে অনিবার্য পুরোপুরি আত্মদান।"

মা এর মধ্যে না বোঝার কি আছে? ব্যাপারটি সত্যিই তাই। আকর্ষণশক্তি কাকে বলে তা নিশ্চয় জানো? আর আত্মদান কাকে বলে তাও তো জানা কথা? তা হলে ঐ দুটিকে মুখোমুখি মিলিয়ে দিলে যা হয়, তাকেই বলে প্রেম। একদিকে টান আর অন্যদিকে দান, অতি সোজা কথা। বলতে পারো একই পদকের এপিঠ ওপিঠ, কিন্তু তা বিপরীত ধরনের জিনিস নয়। দুইএরই প্রকৃতি হলো মিলনপ্রয়াসী, আর তা একত্রে নিলে গেলেই তার থেকে প্রেমের বাস্তব উন্মেষ।

প্রশ্ন ওর পরে আপনি বলেছেন—"ব্যক্তিচেতনা যখন মূল আদিচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তখন তাতে যে অনেকখানি অন্তরালের উদ্ভাবনা হলো, সেখানে একটি সেতুবন্ধ আনার পক্ষে ওর চেয়ে ভালো জিনিষ আর কিছু নেই।"

মা হাঁ, কারণ ব্যক্তিচেতনা যখন তার মূল উৎস দিব্যচেতনা থেকে পৃথক হয়ে গেল তখনই এসে পড়ল একটা ব্যবধান। দিব্যচেতনা চলেছে তার আপন রাস্তায়, কিন্তু ব্যক্তি-চেতনা যদি তার সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে অন্য রাস্তায় চলে বা গতিপথে পিছিয়ে পড়ে, তাহলে যথেষ্ট ব্যবধান ঘটে যায়। তার ফলেতেই আসে যত কিছু দুর্গতি। বিশ্বে সকল রকমের দুর্গতি জন্মায় এইরূপ পার্থক্য থেকেই, তা যেমন কারণেই সেরূপ পার্থক্য ঘটে থাক।... যদিও তার নিজ ইচ্ছাতে সে পার্থক্য নয়, কিন্তু সেখানে আর পূর্বের একাত্মতা রইল না। দিব্যচেতনা চলল একদিকে আর ব্যক্তিচেতনা চলল অন্যদিকে, কাজেই পরস্পরের মধ্যে ফারাক কেবল বাড়তেই থাকল। এর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক: একজন পথে চলছে যেভাবে, তার সঙ্গী অন্যজন যদি ওর সঙ্গে সমান তালে না চলে এবং তার থেকে পিছিয়ে পড়তে থাকে, তাহলে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বাড়তেই থাকবে, একজন কোথায় এগিয়ে গেল আর অন্যজন কোথায় পিছিয়ে পড়ে রইল; হয়তো প্রথম জন চলেছে উড়ে যাবার মত বা লাফিয়ে লাফিয়ে, আর দ্বিতীয় জন চলেছে ঢিমে তেতালাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তাহলে দুজনের মধ্যে পার্থক্য তো বাড়বেই। এই ভাবেই এসেছে এতখানি পার্থক্য, আর তারই ফলে বিশ্বের যত কিছু দুর্ভোগ ও দুর্গতি—অন্তত এই সব পার্থিব দুর্গতি, যেগুলির কথা আমরা জানি। সেই চেতনার পার্থক্য থেকে এসেছে এত রকম জগৎব্যাপী পার্থক্য,

বাস্তব পার্থক্য। চেতনার পার্থক্য হতেই নানা রকমের এই সব বস্তুগত ছাড়াছাড়ি ভাগা-ভাগি (আঙুল দিয়ে দেখালেন), এত হাজার হাজার জিনিস সবই আলাদা আলাদা, আর তাতেই নানা দুর্ভোগ। চেতনার অপৃথক রকমের বিল থাকলে এ-সব কিছুই হতে পারত না। ওর দ্বারাই এসেছে আকার প্রকারের পার্থক্য আর তেমনি যত প্রকার দুর্গতি। আবার যদি সেই বিল ফিরে আসে তাহলে এ সব কিছু থাকবে না।

প্রশ্ন : মা, প্রকৃতির রূপান্তর হবার পূর্বে কি কেউ অন্যকে ঠিক ভালোবাসতে পারে ?

মা অন্যকে ভালোবাসা ? আমি বলেছি যে তা অসম্ভব। এ কথাও বলেছি যে সঠিক ভালোবাসা জানতে হলে ভগবানকেই ভালোবাসতে হয়। তাতেই প্রকৃত ভালোবাসা কেমন তা জানা যায়। আরো বলেছি যে যাকে তুমি ভালোবাসো নিজেও ঠিক তারই মতো ক্রমশ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং ভগবানকে ভালোবাসতে পারলে তুমি সেই মনোভাবের ফলে ক্রমে ক্রমে তাঁরই অনুরূপ হয়ে তৈরী হতে থাকবে, আর তখন তাঁর দিব্যপ্রেমের সঙ্গে একাত্মতা লাভ ক'রে সে কেমন জিনিস তা জানবে। নতুবা জানা যাবেনা।

আর মানুষে মানুষে যে ভালোবাসা তা যেমনই হোকনা, সকল ক্ষেত্রেই তা নির্বোধিতা ও দুর্বলতা ভাব নিয়ে গড়া, উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধ তাতে থাকবেই। তেমন ভালোবাসাতে হয়তো আশা করেছিলে একটা অপূর্ব জিনিসের সাক্ষাৎলাভ, কিন্তু প্রথমেই দেখা দিল তার মাঝে যে এমন দুটো তিনটে পর্দা পড়েছে, যাতে আশ্চর্য হয়ে দেখলে সেই প্রত্যাশিত সুন্দর জিনিসের কেবল আভাসটুকুমাত্রই তাতে মিলেছে। যদি সরাসরি ভাবে তার সম্মুখীন হয়ে পর্দাগুলো সরিয়ে ফেল তাহলেই তখন জানবে যে জিনিসটা আসলে কিরূপ। কিন্তু যদি আড়ালের পর আড়াল সেখানে চাপা দিতে থাকো তাহলে অবশ্য কিছুই টের পাবেনা। কেবল আবছায়া মতো বোধ করতে থাকবে "আহা, এর মধ্যে সুন্দর কিছু অবশ্য আছেই, এই পর্যন্ত। আর অনেকে তার মধ্যে কোনো অপূর্বতার খোঁজ করেইনা, তারা শুধু প্রবৃত্তির বশে চলে, নিতান্তই পশুদের মতো, কেবল একটু মার্জিত ভাবে। তাদের কথা বাদ দাও। তারা যেমন খুশি চলুক, আমাদের তা নিয়ে কিছু বলার দরকার নেই। আমাদের পক্ষে ওতে কিছু ক্ষতি নেই, আর ঐ কথাগুলি আমি তাদের জন্যও লিখিনি।

প্রশ্ন প্রকৃত ভালোবাসতে জানার জন্য কি প্রকৃতির রূপান্তর দরকার ?

উত্তর : তোমার প্রকৃতির যখন যেমন রূপান্তর হবে, তার প্রেমও হবে তদনুরূপ।

প্রশ্ন : বুঝতে পারলাম না।

উত্তর : এ তো শিশুতেও বুঝবে। তোমার চেতনা যদি হয় পশুদের মতো, তখন তার প্রেমও হবে পশুদের মতো। চেতনা সাধারণ ও মামুলী হলে তার প্রেমও হবে তেমনি মামুলী। উচ্চস্তরের চেতনা থাকলে প্রেমটিও হবে উচ্চস্তরের, তার চেতনা যদি দেবতার মতো হয় তাহলে প্রেমও হবে দিব্য ভাবের। এ তো খুব সোজা কথা। সেই কথাই আমি

বলেছি। তাহলে তুমি যদি এক চেতনা থেকে অন্যরূপ চেতনাতে উত্তীর্ণ হও আর তা খুবই বিশাল ও উদার হয়ে ওঠে, তখন সেইরূপ উদার ও বিশাল চেতনাতে প্রেমকে তুমি উপলব্ধি করবে। এ তো যথেষ্টই স্পষ্ট কথা।

মনে করো তুমি পাহাড়ের মূল ঝর্ণার থেকে সুনির্মল জল আহরণ করে এনে এমন এক পাত্রের মধ্যে রাখলে যাতে অল্পবিস্তর কাদা বসে রয়েছে, তখন তাহলে জল তেমন নির্মল ও বিশুদ্ধ হলনা। অথচ তা সেই একই জল, কেবল পাত্রের ভিতরকার ময়লা তার সঙ্গে মিশে তা আর সেই আসল জিনিসটি থাকছেনা। তেমনি প্রেম হলো সেই পাহাড়ী নির্মল জলের মতো বিশুদ্ধ জিনিস, কিন্তু মানুষের চেতনার মধ্যে এসে তা কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে। সেখানে যতই বেশি কাদা সেখানে ততই বেশি তা ময়লা।

কথায় বলে, বাঘ যে গিলে খেয়ে ফেলে, ওটি হলো জাগতিক আদি প্রেমেরই মৌলিক নিদর্শন। আমার বোধ হয় যে বাঘের অস্তিত্বেরও অনেক আগেকার যুগে সমুদ্রগর্ভে যে সব আদিম জন্তুরা থাকতো, তাদের কেবল একটাই প্রধান যন্ত্র ছিল : ঐ পাকস্থলী। তারা কেবল সব কিছু গিলে ফেলাতেই নিযুক্ত থাকতো, তাই ছিল তাদের একমাত্র ক্রিয়া। অর্থাৎ জড়ের মধ্যে চেতনা এসে প্রথমে প্রেমের অভিব্যক্তি ঐভাবেই প্রকাশ হলো, নতুবা তার আগে ছিল শুধু অনড় অচল নিরেট অচেতনা। সেইরূপ প্রেম হতেই প্রথম শুরু হয় জীবনচাঞ্চল্য —চেতনার জাগরণ ও ক্রম রূপান্তরের সূচনা। তারই প্রথম অভিব্যক্তি হলো জড়ের মধ্যে প্রেমের ক্রিয়া। এবং সেটার প্রথম কাজ হলো নিজের মধ্যে গিলে ফেলা বা আত্মসাৎ করা, অর্থাৎ ঐ ভাবেই মিলন প্রয়াস—কিন্তু আমরা এখন যাকে প্রেম বলে থাকি তা হলো জগতের এক বিশেষ শক্তি (যা আগেকার যুগে ছিল সরাসরি গিলে ফেলা বা আত্মসাৎ করার মধ্যে) ; বাঘেরা নিশ্চয় এরূপ গিলে ফেলাতে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করে, তাই সে ক্ষেত্রে ওটি প্রেমেরই এক সবিশেষ লক্ষণ। ওদের চেয়ে উচ্চস্তরের জীব মানুষদের যে প্রেম তার মধ্যে থাকে প্রেমের উদ্রেকে অকুণ্ঠ আত্মদান, তাই কেউ মাতৃভূমির জন্য নিজেকে বলি দেয়, কেউ অন্যকে বাঁচাতে নিজের জীবন দান করে, ইত্যাদি। এমন প্রেম যথেষ্টই উঁচুদরের হলো বটে, কিন্তু তারও মধ্যে কিছু কর্দম মিশে রইল। তাকে সর্বোচ্চ বলা না গেলেও খুবই উচ্চ জিনিস বটে। তাহলে প্রেমের এই সকল পরম্পরাগুলি বুঝলে তো ? এর পরে আরো বেশি উচ্চ পর্যায়ের বা একেবারে বিশুদ্ধ খাঁটি জিনিস, যাকে এখানে বলেছি সর্বোচ্চ প্রেম, সেই কথাটাই এখানে আবার উল্লেখ করে বলি (তাঁর The Four Austerities পুস্তক থেকে)—"আসল প্রেম হলো একাত্মতা লাভ ও তার আনন্দানুভূতি : মিলনের অভেদতত্ত্বের পরমানন্দেই তার পরম অভিব্যক্তি।"

প্রথমত এই প্রেমের অভ্যুদয়ে রয়েছে "একাত্মতার আনন্দ," সেটির ধারণাই করা খুব কঠিন, তার সম্বন্ধে যা বলা হয় তা অনির্দিষ্টভাবে। কারণ মানুষের চিন্তাশক্তি বৈপরীত্যের তুলনা ব্যতীত কোনো কিছু ধারণাতে আনতে পারেনা, কিন্তু সেই চরম ভাবটি তখনই আসতে পারবে যখনি অভিজ্ঞতার সারা বিশ্ব ঘুরে এসে আবার তা মূলের অবস্থাতে উত্তীর্ণ হবে। তখন সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার পালা শেষ করে আবার ফিরে যাবে মূল উৎসের অভিমুখে। সুতরাং প্রথম যেখানে শুরু হয়েছিল তার উপরে অভিজ্ঞতাগুলি যুক্ত হয়ে আরো তা অধিকন্তু কিছু

জিনিস দাঁড়াবে। বস্তুত সৃষ্টি রহস্যের এটাই মূল কারণ। এই সৃষ্টির ভিতর দিয়ে অতিক্রম না করলে চেতনা এমন অভিজ্ঞ রকমের অবস্থাতে আসতেই পারত না। এই সৃষ্টি থেকে ঘুরে ফিরে যখন তা আবার গোড়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, সে অবস্থা কালের দ্বারা নিরূপিত হবার নয়—তার ধারণা আনতে পারা অত্যন্ত কঠিন, কারণ আমরা ধারণা করি স্থান কালের পারস্পর্যের হিসাবে যা সামগ্রিক নয়—যাতে আরম্ভ ও সমাপ্তিকে একত্রে নিয়ে গোটা জিনিসটা থাকবে অন্তর্ভুক্ত—সুতরাং সে প্রত্যাবর্তন কালের হিসাবে নয়, তা হলো চেতনারই প্রত্যাবৃত অবস্থা (কেমন ক'রে এটা বোঝাই...)। সেটি হবে প্রেমের ফিরে যাওয়া তার উৎসে, সেখানে শুধু একাত্মতার আনন্দ নয়, সম্পূর্ণ মিলে যাবার বিলনানন্দ। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বলতে গেলে তাই হলো বিশ্বলব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে চেতনার সমাক সমৃদ্ধি, প্রকারে ও প্রকরণে, এবং তা সম্ভব হতে পারেনা বিশ্বগত অভিব্যক্তি ভিন্ন। সৃষ্টির প্রকৃত কারণ সম্পর্কে এই হলো সব চেয়ে যুক্তিসাপেক্ষ কৈফিয়ৎ।

প্রশ্ন : মা, আপনার এই কথাগুলির অর্থ কি (Education থেকে)—"কেউ যখন অহংভাবে আবদ্ধ সংকীর্ণ গণ্ডীর সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে আত্মদানের মুক্তির মধ্যে উত্তীর্ণ হয়, সেই ত্যাগ অন্যের জন্য বা সংসারের জন্য, দেশের জন্য বা ধর্মের জন্যই হোক, তখন সে এই আত্মবিলুপ্তির মধ্যে অপূর্ব এক প্রেমের পূর্ণাস্বাদ পেয়ে মনে করে যে এর দ্বারা ভগবানের সংস্পর্শলাভ ঘটেছে ; কিন্তু সে সংস্পর্শ প্রায়ই ক্ষণস্থায়ী হয়, কারণ মানব-সত্তার ভিতরকার আপন অহংজনিত নিস্ক্রিয়া তার সঙ্গে মিশে গিয়ে তৎক্ষণাৎ প্রেমের বিশুদ্ধতা লুপ্ত হয়ে যায়। আর তাকে বিশুদ্ধ রাখতে পারলেও ভগবৎ উপস্থিতির যোগসূত্র সর্বদা স্থায়ী হয়না ; যেহেতু প্রেম হলো ভগবানের একটাই দিক মাত্র যা পৃথিবীতে এসে বিকৃত, সব কিছুরই মতো।"

মা এর মধ্যে কোন কথাটা বোঝোনি ? যে এই বিশ্ব জগৎ ভগবানের বিকৃত চেহারা ? বস্তুত জগৎ বর্তমানে যেমন চেতনার অবস্থাতে রয়েছে তাকে তাঁর এতে বিকৃত স্বরূপই বলতে হবে, সেই সঙ্গে তাঁর প্রেমও তাই এখানে বিকৃত। সুতরাং এই অভিব্যক্ত জগতে তোমার প্রেম যতই কেন বিশুদ্ধ হোক, তথাপি চেতনার রূপান্তর না হলে সে প্রেম ভগবানের সংস্পর্শ স্থায়ীভাবে পেতে পারেনা। কারণ এ কথা নিশ্চয় যে পার্থিব বিশুদ্ধতা ও ভগবৎ বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। বুঝেছ এবার ? থাক, এ কথা অন্যদিন হবে।

প্রশ্ন মা, বাপমায়ের প্রেম সন্তানদের প্রতি কেমন হয় ?

মা কেমন ধরনের ? সেও তো মানবীয় প্রেম,তাই নয় কি ? অর্থাৎ তাও মিশ্রিত নানা কিছুর দ্বারা। ওর মধ্যে মিশে থাকে কিছু অধিকারবোধ, আর দুর্বার রকমের একটা অহংভাব। অথচ প্রথমেই বলি, মাতৃপ্রেম নিয়ে কত রকমই বই লেখা হয়েছে তার অপূর্ব জয়গান ক'রে। জমকালো অত্যুক্তির বাক্যবিন্যাসের দ্বারা মানুষরা যতই কেন বলুক, তা বরং দেখা যায় উচ্চস্তরের পশুদের বেলাতে, যেমন বিশেষত স্তন্যপায়ী পশুদের মধ্যে তাদের সন্তানবাৎসল্য তেমনই উঁচুদরের, অর্থাৎ সেখানে তেমনই গভীর আগ্রহ ও প্রীতি

তেমনই আত্মবিস্মৃতি, তেমনই আত্মবিলোপ, তেমনই সাগ্রহে সন্তানকে শিকাদান, আর তেমনই ...আমি যত সব আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছি, যদি তা কোনো বিড়ালের নামের পরিবর্তে কোনো মানুষ মায়ের নাম দিয়ে লেখা হতো তাহলে তা হতো এক উৎকৃষ্টতর নভেলের মতো, আর লোকে তাই পড়ে বলতো, "আহা, এই সব গল্পের মেয়েদের মধ্যে মাতৃস্নেহের কি অপূর্ব নিদর্শন।" অথচ সেই একই জিনিস, কিন্তু বিড়ালদের তো বর্ণনা করার ভাষা নেই, তারা এই নিয়ে কিছু বলতেই পারেনা, আর বই লিখতেও পারেনা। কিন্তু আমি নিজে দেখেছি কত আশ্চর্য কাণ্ড। সেই ধরনেরই সহজ আত্মত্যাগ ও আত্মবিলোপ, তাই হলো প্রেমেরই প্রখর প্রকাশ। কিন্তু মানুষদের বেলা...সকল দিক বিবেচনা ক'রে আমার যথার্থই মনে হয় যে পশুদের বেলা সে প্রেম আরো বিশুদ্ধ ও খাঁটি, কারণ তাদের মনের মধ্যে কোনো চিন্তার বিধার কাজ থাকে না, কিন্তু মানুষ চিন্তার শক্তি নিয়ে ভেবে চিন্তে বিচার বিবেচনা ও হিসাবনিকাশ প্রভৃতি ক'রে যে জিনিস দাঁড় করায় তাতে ওর নির্মল সৌন্দর্যটুকু নষ্ট হয়ে যায়। ওর মধ্যে কেবলই ঢুকে পড়ে তাদের মনের যত কল্পনা, সন্দেহ, বিচারণা, বাগিয়ে গুছিয়ে মনোমত ক'রে নেওয়া।

যেমন, বাপমায়ের সম্পর্কে। তোমাদের মনের মোহটুকু ভেঙে যাবে জেনেও বলে দিলাম সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা কেমন হয়। আপন দেহসত্তা থেকে যে জন্মানো নিজের দেহেরই অংশস্বরূপ, সেখানে একটা বাস্তব বন্ধনসূত্রের টান থাকে, আপন গায়েরই মাংস হিসাবে একটা নিজত্বের ভাব অনেককাল পর্যন্তই থাকে, তার পরে সেটা ছিন্ন হয়ে যায়। ঐ বন্ধন যখন থাকে তখন একটা সূক্ষ্ম সংবেদনশক্তি সেখানে কাজ করে যার ফলে সন্তান যখন যেমন বোধ করছে মাও তখন সেটা বোধ করছে, যেন নিজের মধ্যেই সেটা অনুভব করছে। এটি মোটামুটি একটা একাত্মবোধ ছাড়া আর কিছু নয়। আর ভিতরের যে ভালোবাসার অনুভূতি তা আসে অনেক পরে (যা ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে) এবং তা হয় বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী। সে জিনিস নানা রকমেরই হতে পারে। এ সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু বলতে পারি, কিন্তু তবুও এ জিনিসকে খাঁটি প্রেমের পর্যায়ে এনে তার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা উচিত নয়। একটা মোটামুটি একাত্মবোধের ভিতর দিয়েই মা তার সন্তানের সুখদুঃখকে নিজের মধ্যে অনুভব করে। সন্তান যদি কিছু শক বা আঘাত পায় তা তার মাকেও লাগে, যা থাকে এমন কি দুই মাসও পর্যন্ত।

এই হল আসল ব্যাপার। তারপর যার ভিতরকার যেমন প্রকৃতি যার যেমন চেতনা-স্ফুরণ, শিক্ষাদীক্ষা, বোধশক্তি ও অনুভবশক্তি সেই অনুসারে হয়ে থাকে ওর কমবেশি। তার উপরে রয়েছে একটা সমষ্টিগত বা সম্প্রদায়গত ধারণা, যার উপরে নির্ভর ক'রে গল্প নভেলাদি লেখা হয়ে থাকে—মানুষরা নভেল বানাতে খুবই ওস্তাদ, সব কিছু নিয়েই তারা বেশ নভেল বানাতে পারে। যে ভাবটি আবহাওয়ার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে তাই ধরে নিয়ে কল্পনার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলে, আর যারা ওদের মধ্যে কল্পনাপ্রবণ তারা নিজেদের জীবনের মধ্যেও সেই জিনিসকে নিয়ে নিজেদের নভেল তৈরী করে। অথচ প্রকৃত আভ্যন্তর চেতনা ও চৈত্যসত্তার সঙ্গে এগুলির কোনই সম্পর্ক নেই—যদিও লোকেরা এই নিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাষাতে কত কিছুই বলে যাবে যা সবই ফেনায়িত কল্পনা। তোমরা

যদি এই বাহ্যমনের তরফের আবহাওয়ার চেহারাটি স্পষ্ট দেখতে পাও যে কেমন ভাবে তা মানুষকে অভিভূত করে আর এরই প্রেরণায় পরিচালিত করে, তাহলে নিজের ব্যক্তিসত্তাতে অনেক মোহের থেকে মুক্ত হতে পারবে। যা বলছি তা খুবই যথার্থ, তুমি জানো আর না জানো।

মনুষ্যত্ব সম্পর্কে, পৃথিবীতে এমন অনেক মানবাত্মা রয়েছে...যারা নাকি যথেষ্ট মার্জিত ও শিক্ষিত, যাদের মধ্যে কিছু উৎকর্ষ ঘটেছে আর ব্যক্তিত্বও গড়ে উঠেছে তারা একটা দলের মধ্যে মিলিত হয়ে থাকে। সংখ্যাতে বেশি না হলেও তাদের বলা যায় উন্নত সত্তার দল, কিন্তু সেখানে প্রকৃত উন্নতি কতখানি তার পরিমাপ করতে যেওনা। বাইরে থেকে দেখতে তা যেন উপুচে পড়া ফেনার মতো। কিন্তু তাদেরও মধ্যে হাজারে একটিও এমন মিলবে না যে প্রকৃতই ব্যক্তিসম্পন্ন, আত্মচেতন, চৈত্যসত্তার সঙ্গে মিলিত, আর আভ্যন্তরীণ চেতনাতে বাহ্য প্রভাবমুক্ত (সম্পূর্ণ না হলেও) ; অর্থাৎ যারা আভ্যন্তরীণ উন্নতির সঙ্গে সমুচিতভাবে যা স্বাভাবিক সঙ্গতিপূর্ণ তাই গ্রহণ করে আর যা বিপরীত তা বর্জন করে। যারা সহজে বিভ্রান্ত হয় না, সব কিছুকে মিশিয়ে তালগোল পাকায়না, যারা পরিণত ও আত্ম-চেতনাযুক্ত, জীবনের পথে কোথায় কেমনভাবে চলেছে সে কথা জানে।

তারাই হলো প্রকৃত মানুষ, এ কথা বলা যায়। বলা যায় যে প্রকৃতির হাতে মানুষ যতটা গড়া যেতে পারে তার চূড়ান্তে এরা পৌঁছেচে। এবং তার চেয়েও বেশি উন্নতির জন্য তারা প্রস্তুত, যদিও তা যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কতকটা পশু হয়েই থাকল, প্রকৃত মানুষ হবার এই প্রথম সূচনার কালে। সেই উন্নতিটি হয়ে গেলে তবেই হবে সম্পূর্ণ মানুষ। ইতিমধ্যে প্রত্যেকে নিজের ভিতর থেকে নিজেই বুঝবে আমি ঠিক মানুষ কিনা।

আচ্ছা এবার এসো। ঐ কথাগুলি আমি তোমাদের কাছে বললাম এই আশাতে যে তোমরা তাইই হবে।*

—শ্রীমা

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা বসু

(৩৫)

দেখলাম মন দিয়ে অনন্তকে ঠিকমত ধারণা করতে পারি না। এপারে নয় ওপারে, আমার নাগালের বাইরে, এককথায় সচ্চিদানন্দের অনুভব অবাঙ্মনসগোচরম্। একদিকে যেমন শাশ্বত কালাতীত ব্রহ্ম, বলা যায় সমাধিতে চেতনা যেমন—"শিব এব কেবলম্", আর তারই বুকে কালশক্তি কালী। এই হল ব্রহ্মে অস্পন্দ আর স্পন্দের প্রতীক। এখন মনের বাধা হল, সে শৈব হবে না শাক্ত হবে, এই তার দ্বিধা। সগুণ না নির্গুণ, সবিশেষ না নির্বিশেষ, এইভাবে শেষপর্যন্ত মনের দ্বৈতবোধ থাকে বলে, একটা দিক কেটে বাদ পড়ে যায়। শ্রীঅরবিন্দ জ্ঞানের দিক দিয়ে পূর্ণদৃষ্টিপাত করে বলছেন, জ্ঞানের পরম লক্ষ্য যে শাশ্বত ভিত্তি পাওয়া, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কালাতীত চৈতন্যেই এমন তুরীয়পরম-পদ রয়েছে যেখানে চৈতন্য তার সব স্ফুরত্তাবিক্ষোভকে নুলে ধরে আছে। শান্ত নিষ্ক্রিয় হলে শক্তি শিবের বুকেই মূর্ছিত (trance), সমাধিমগ্না ; কিন্তু আবার যোগীর হৃদয়-কমলে, শিবের বুকে নৃত্যকালী দেখবে না ? যত বেশী গভীরে মগ্ন হবে, শিবকে যত গভীরে বোধ করবে, শূন্য হৃদয়ের স্তরগুলি সব দেখবে, পেরিয়ে যাবে ; দেহ প্রাণ মন বিজ্ঞান আনন্দ সব উত্তিয়ে আত্মানুভব হলে আত্মদীপালোকে সবই দেখতে পাবে। দেহলী, দীপ ক্রমশঃ উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হতে থাকে, আর যত গভীর ততই আলো ছড়াতে থাকে, জ্যোতিষ্ক-স্তরে চতুর্দিক ব্যাপ্ত হতে থাকে —যোগবিজ্ঞানে প্রবেশ করে আনন্দআত্মা বা আনন্দী হওয়া। এর উপায়স্বরূপ উপনিষদুক্ত জ্ঞানের পথে দেখেছি, চেতনা সাঁ করে উপরে চলে যায়, অগ্রন্থিগুলি খুলে যায়। যোগাসনে যোগীর দেহ, স্তব্ধ নিঃশ্বাস ধীরে, শেষে মনের লয় হয়ে যায় , জ্যোতিতে জ্যোতি মিলে গেল। অস্তিতার বোধমাত্র শুধু—ফাঁকা এক শূন্যতায় গভীর শান্তি এক দৃঢ়তা। এইভাবে অটল থাকা, এর পরেও না অসৎ না সৎ, অনির্বচনীয় এক অবস্থায় মহাবায়ু সাঁ করে একবারে ওপরে উঠে যায়, ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে গেল, আর হয়তো ফিরেই আসে না। এই হল অনাবৃত্তি, শূন্যতায় ঝাঁপিয়ে পড়ার এক দুরাগ্রহ এসে আর কিছুতেই ফেরা হল না। নুনের পুতুল সমুদ্রে গলে গেল, জ্যোতিতে জ্যোতি মিলে গেল।

আবার যোগী জগতে ফিরেও আসেন, ঐভাব নিয়ে সবই তখন আনুনি লাগে। জগৎ তখন স্বপ্নের মায়া, অশাশ্বত বোধ হয় ; যেন মতিভ্রম। কিন্তু পূর্ণযোগের দাবি যে সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা—তাই এ অনুভবের প্রগাঢ়তা দিয়ে পরিপাকে সত্য প্রকাশিত হবে। এক উপদ্রষ্টার মত তটস্থভাব নিয়ে থাকা, বাহিরের জগতে আছি কিন্তু বাহিরের কিছুই আমাকে আলোড়িত করতে পারেনা। এইভাবে বারবার অগমলোকে

যাওয়া আসায় এক সংস্কার উৎপন্ন হয়, বাসনার কর্ম ক্ষীণ হয়ে যায়, এই ভূমিতেই দাঁড়িয়ে দেখতে হবে, আবার ডুব দিতে হবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, তিনলোকে আমার করার বা করে পাওয়ার কিছু নেই, তবু দেখ লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে যাই। প্রশ্ন আসে, বুদ্ধদেব মানবজাতিকে শাশ্বত শান্তিতে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, তিনি তখন জগতের খেলায় কি দৃষ্টি দিতে পারেন? গীতায় এর উত্তর আছে—দ্রষ্টার ভূমি থেকে সক্রিয় ব্রহ্মে যোগ দিতে হবে। গোড়ার দিকে অস্পন্দ (passive) পর্যন্ত না পৌঁছলেও, চিত্ত স্থিত থাকবে শান্ত ভূমিতে, এইভাবে তাঁর নিমিত্তমাত্র হতে হবে। যিনি বিশ্বরূপ, মানুষী তনু যে তাঁরই, তাই তাঁকেই সব দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে তাঁর নিমিত্ত হওয়া এটা একটা শ্রেষ্ঠ উপায়-স্বরূপ (highest code)। এইভাবে চলতে পারলেই অনুবর্তার অবস্থা এসে যাবে, প্রকৃতি বশীভূত, কর্মে রস পাওয়া যাবে। তখনই বোঝা যাবে, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, প্রকৃতির কর্মে আমারও অনুমোদন রয়েছে। উপনিষদে এই কর্মকে নাম দেওয়া হয় সুকৃত। এর পরে দেখি প্রজ্ঞানের অবিপ্লবতা, এক বৃহত্তর ছন্দ বৃহত্তর জ্ঞানে চলে যাওয়া—উপদ্রষ্টা অনুমন্তার গভীরের অবস্থা—ভর্তা ভোক্তা। ব্রহ্ম যে রসস্বরূপ, আনন্দব্রহ্ম তিনিই এই আধির মধ্যে প্রকাশিত—এই এক প্রত্যক্ষআদর্শবোধ তখন মহেশ্বরূপে, শিবস্বরূপরূপে প্রকাশ পাবে। জীবকে পুরোপুরি শিব হতে হবে না, হলে এ অবস্থা পাওয়াও যাবে না, বোঝাও যাবে না। প্রকৃতির ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ হলে ব্রহ্মে অস্পন্দই স্পন্দমান, তখন বোঝা যাবে Active ও Passive ব্রহ্ম একাকার হয়ে তখন সেখানে মিলে যাবে আর তখনই সচ্চিদানন্দবোধেরও পরিপূর্ণ সিদ্ধি। মনের বাধারও নিরসন হয়ে যাবে এ পর্যন্ত গতি হলে, তার পূর্বে নয়।

ব্রহ্মে অস্পন্দ ও স্পন্দ অবলম্বন করে শিবশক্তির সাধনাতে কোন ক্ষেত্রে মুখ্যতঃ শিবকে আবার কোন ক্ষেত্রে শক্তিকে প্রধান ধরে নিয়ে সাধনা প্রচলিত। আবার দর্শনের বিচারে পুরুষ ও প্রকৃতি একেবারে যুক্ত কিম্বা বিযুক্ত ধরা হবে, তাই নিয়ে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণা বা ভাবনা হল, আলাদা আলাদা করে না দেখলে অপবর্গ বা সৃষ্টি-কর্ম হতেই পারেনা। বলাবাহুল্য এ সবই মনের দিক দিয়ে সূক্ষ্ম বিচার। পুরুষ ও প্রকৃতিকে বোধ করি চৈতন্য ও তার শক্তি দিয়ে। যেমন কিনা জড় প্রকৃতিতে শক্তির যে খেলা আমরা দেখতে পাই, তাতে যখন সচেতনতা আসে বা চৈতন্য হয়, তখনই পুরুষের বোধ হয়। বোঝা যায়, সবকিছু স্পন্দমানতা প্রকৃতিতেই। কাজে কাজে সুখদুঃখ অনুরাগ বিরাগ, আকর্ষণ বিকর্ষণ যেন বাহির থেকে ঘটে যাচ্ছে। সেটা বুঝে দেখে হান-উপাদান অর্থাৎ ছেড়ে দেওয়া (rejection) আর গ্রহণ করা, এইভাবে সাধন করতে হয়। এই-রকম চলতে থাকলে যদি এসব বিধ্বা ঝামেলা মনে করে বিপর্যস্ত বোধ করি, তখনই চাই 'প্রশম'। প্রপঞ্চের উল্লাস থেকে প্রপঞ্চের উপশমে চলে যেতে চাই। সেই "শিবোঽহম্" এর অবস্থাই তো প্রশমের চূড়ান্ত ভাবনা। কিন্তু এই প্রশমের ভাবনায় সাংখ্যের বিবেক-জ্ঞানের সাধনধারার পরে বৈদিক সাধনধারায় কিছুটা ভেদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন কিনা দেখেছি, প্রকৃতির স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণভাবে পুরুষকে বিবিক্ত করা সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত।

তাই তিতিক্ষা দিয়ে সাধনা শুরু করে দ্রষ্টার আসন নিয়ে পুরুষ একেবারে বিবিক্ত হলে তবেই বিবেক-জ্ঞান লাভ হবে। এতে এখনও হয়েছে, প্রাণ মন বুদ্ধির ক্রিয়া ছাপিয়ে জীবন পেরিয়ে চলে যাওয়া একটা উল্লম্ফনের ধারা। জগতে থাকলেও "জ্যান্ত মরা" হয়ে কোনক্রমে টিকে থাকা। কিন্তু আর এক অবস্থা আছে যেখানে ক্রমিক ধারায় চরম উপলব্ধির পরেও আবার নেমে আসতে হয়। যেমন সেই "নি"তে সর্বক্ষণ থাকা যায় না, জীবন জগতে থাকলে মাধ্যাকর্ষণের টানে নেমে আসতে হয়, সব কিছু আলুনি লাগে ঠিকই। তবুও এই ওঠা-নামা আছে, জোয়ারে উজিয়ে যাওয়া যেমন আছে, ভাঁটার টানে ভাটিয়ে যাওয়াও আছে। তাই প্রকৃতিকে ভাল করে বুঝে দেখতে হবে, শক্তিকে জয় করে নিতে হবে। গীতোক্ত যোগের সাধনায় তার উত্তর পেয়েছি, দুই প্রকৃতিকে এবার বুঝে চিনে নিয়ে জীবনসাধনায় নেমে দেখতে হবে।

আমরা দেখেছি, সাধনার প্রথম দিকে অসহযোগ করতে হবে যার সঙ্গে, তিনি হলেন অপরা প্রকৃতি—প্রকৃতির নিম্নভূমির কর্তৃত্ব বা ক্রিয়াধারা। অপরার সঙ্গে বিবেক হলে, দুর্গুণগুলি ছাড়তে পারলে পরে পুরুষের ধর্ম দেখা দেয়, জ্ঞান বৈরাগ্য শুদ্ধাবৃত্তিগুলি এবং ঐ সঙ্গে ঐশ্বর্য। এসব তো পরা প্রকৃতির ক্রিয়া ও ধর্ম, সেখানেতো কোনও বিরোধ থাকতে পারেনা। তাঁরই স্বীয়া বা পরমা প্রকৃতির আবেশে আরও উর্ধ্বে সম্যকস্থিতি পেলে পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতির অখণ্ডতা বা ক্রমিক ধারাটি ধরা পড়ে। তার পূর্বে নয়। কাজে কাজেই সাংখ্যসাধনার সঙ্গে বৈদিক সাধনা মিলিয়ে দেখতে পারলে পুরুষপ্রকৃতির অখণ্ডবোধ পূর্ণতার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈদিক ধারায় আবার প্রকৃতি থেকে বিমুক্ত হবার কথাই ওঠে না, চেতনাকে বৃহৎ বিপুল করে ব্যাপ্ত করে দিতে হয় সবছাওয়া ব্রহ্মচৈতন্যে। আঁধার পেরিয়ে সূর্য উঠবে, তাই উষার আবির্ভাবে ক্রমে ক্রমে আলো ফুটতে লাগছে, আর নতুন করে প্রাণ পেয়ে জন্ম নিলাম ভূমার বৃহতে। চেতনা বিসর্পায়িত হতে অমৃতের সন্ধান পেলাম—শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনায় এই দিকটা খুব স্পষ্টভাবে স্বীকৃত—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এই সহজ সরল বিশ্বাস নিয়ে শ্রদ্ধাবিষ্ট ঋষি তো প্রকৃতিরই উপাসনা করেছেন, সেই দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে হবে। কবি রবীন্দ্রনাথ এই বৈদিক ঋষির প্রতিভূ হয়ে এযুগে সেই দৃষ্টির সন্ধান দিয়ে গেছেন। তাঁর কাব্যসম্ভারে, বিশেষ করে পদ্মা নদীতে নৌকায় বাস করে সহজ সরল ভাবটি মেলে ধরেছেন অপূর্বভাবে তাঁর ছিন্নপত্রাবলীতে। এথেকেই ধরতে ও বুঝতে পারব তৈত্তিরীয় উপনিষৎ যেমন বলেছেন, "আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি। এ যে চোখ মেলেই সহজ হয়ে দেখছি আলোর প্রপাত নেমে আসছে, এ দৃষ্টি যতই খুলে যেতে থাকে, অনুপ্রবেশ করি, দেহে প্রাণে মনে বিজ্ঞানে, এ যে আনন্দ আনন্দ অমৃত। বৃহৎ প্রেমের আলোর বন্যায় সহজ হয়ে যাই তখন, চলতে ফিরতে এই যোগ—সমস্ত জীবনটাই যে যোগ। অন্য ধারায়, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে ধ্যানে বসে মনের ওপারে অহং লয় করে দিয়ে সব ছাপিয়ে শূন্য হয়ে যেতেও পারব। এই সাংখ্যধারা ধরে অপরাপ্রকৃতির সঙ্গে অসহযোগ করে প্রথম দিকে চলতে হবে সন্দেহ নেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৃহতের বোধটি যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহলে ঠিকই চলবে। তাই প্রাথমিক নির্দেশ হল, নির্দিষ্ট সময় নিয়ে ধ্যানে বস, গুটিয়ে যাও, নিজের মধ্যে অন্তরে প্রবেশ কর, ধ্যানযোগে আলো পেয়ে ক্রিয়াযোগে তাকে আবার প্রতি-

ফলিত করা। ঐ ভাব নিয়ে থাক, এ তো প্রকৃতিতেই রয়েছে, তাই সামঞ্জস্য রেখে চলাই সত্যকার যোগ। অস্পন্দ ব্রহ্মেই স্পন্দ উপলব্ধি করা, "কৃত্যাকৃত্য"। শিবশক্তির দ্বৈত বা বিরোধ নিষ্পন্ন করে অদ্বৈত নিবিড় সামরস্যে যোগযুক্ত একরস থাকা—এই সাধনা শ্রীঅরবিন্দ যোগের একেবারে গোড়ার কথা। অপ্রকাশ অব্যক্ত অক্ষর অনির্দেশ্য যিনি, প্রকাশ তাঁরই স্বরূপ।

তাই বলা যায়, প্রথম দিকে প্রকৃতি পুরুষের বিবেক বিচার করে চলা শুরু করলেও ব্যাপ্তির মহিমা উপলব্ধি করলে ভাবের অভাব পূর্ণ হবে। উপনিষদযুক্ত জ্ঞানযোগে ওইভাবে সাংখ্য ও বেদান্ত দুধারাই মিলিত রূপটি দেখতে পাই। সাংখ্যের বিশ্লেষণ ব্যষ্টি আত্মাকে নিয়ে, আবার আত্মার এই স্বরূপ যদি বিশ্বাত্মার দেখতে যাই, তাহলে বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মকে পাই, এই দুটি দর্শন মূলতঃ এক,সাধনার পথে অন্তরমুখে দৃষ্টি ফিরে গেলে উপদ্রষ্টা হয়ে চললেও 'আবৃতচক্ষু' হওয়ার কথা আছে, অর্থাৎ দেখার ঝোঁকটা বাইরে মোটেই নয়, প্রত্যঙ্মুখী হয়ে ধীর অবিচলিত অটল থাকার প্রচেষ্টা চাইই। কেননা ছট্‌ফট্ করা, উত্তেজিত হওয়া ইত্যাদি কাঁচা আমির দুরাগ্রহ থেকে মুক্তি পেতে হলে উজানে চলতেই হবে। তখন বাহিরটা শূন্য ফাঁকা লাগে আর ভেতরপানে যেন একটা সর্বনাশা টান, তাতে শেষ পর্যন্ত বিরোধের সংস্কার পেরে বসে, অর্থাৎ বহির্জগৎ সবই ছায়া, ছায়ার মায়ার মতও লাগে। অনুরাগও নেই, বিরাগও নেই, বাইরে যন্ত্রবৎ মিছিল চলছে। আরও গভীরে প্রবেশ করলে সব বাইরের মিছিল, ভাবনার মিছিলও বন্ধ হয়ে যায়—জড়ের খেলা প্রাণের খেলা মনের খেলা সবই এক মহাশক্তির স্পন্দমাত্র—যোগীর সুষুপ্তি। একদিকে পুরুষের নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি, অপরদিকে প্রকৃতির গুণবিক্ষোভ বা শক্তি পরিণাম। সুতরাং প্রকৃতিতে সবই জড় বলা চলে—কেবল ওদের মধ্যে গুণের তারতম্য। পুরুষ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ—স্ফটিকের মত। এই হল সাংখ্যের বিবেক দর্শন। চিৎস্বরূপ পুরুষ, তিনি দ্রষ্টাচৈতন্য। ভোক্তাচৈতন্য, আর কর্তৃ-চৈতন্যে রং আছে, চেতনা জড়িয়ে যায়, রসে আর শক্তিতে অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে। বিশুদ্ধ দ্রষ্টৃত্ব, নির্লুপ্ত, আর তাই পুরুষের স্বরূপ স্থিতি, কিন্তু এওকি সহজ? তাই সাংখ্যের বিবেকদর্শন পূর্ণযোগের সাধনায় অপরিহার্য হলেও তাকে ঐকান্তিক করলে চলবে না, এই কারণে প্রাথমিক সাধনেও অন্তরের ভাবনা বেদনা ও সঙ্কল্পকে সম্পূর্ণ প্রশমিত রাখতে ও বাইরের কর্ম ত্যাগ করা চলবে না, সেখানে যুক্তচেষ্ট হতে হবে।

সাধারণ জীবনেও পর্যায়ক্রমে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি আসে। গভীর প্রশমের অবস্থা সুষুপ্তির ভূমিতে। তখন এরকম দর্শন হয় যে, বাইরে সব যন্ত্রের মতই ঘটে যায়, জ্ঞান-যোগের আশ্রিত কর্ম। জ্ঞানী বা বিদ্বান যে ভাবে কর্মে নেমে আসেন, আবাহন নেই, বিসর্জনও নেই। কোন কিছুতে মুখ ফেরাই না, তোমায় জগৎ প্রত্যাখ্যান করব না, তোমাতে থেকে যদি দেখি, তখন তাতে সুখ আছে, আনন্দ আছে। এ অনুবন্তার অবস্থা, কিন্তু রসের সন্ধান না পেলে এতো সম্ভব নয়। কিন্তু এইভাবে সংসারে থাকতে পারলে তোমারই নির্দেশে চললে আনন্দ চেতনাও এসে যায়, আর তাই বাঁচিয়ে রাখে। ঐকান্তিকভাবে বিবেক অতি-রিক্ত হয়ে গেলে জ্ঞান শুষ্ক হয়ে যায়, কর্মেও রস পাওয়া যায় না। প্রকৃতির সুর যদি মিলিয়ে চিনতে না পারি, তোমার প্রকৃতি বলেই বা বুঝব কি করে? তার মানেই গভীরের টানও

শেষ পর্যন্ত যায়নি, বিশ্বপ্রকৃতি আর চৈত্য প্রকৃতিতে ভেদ রয়ে গেছে। লক্ষ্য স্থির করে নিতে হলে সংসারের সঙ্গেও পূর্ণ বিচ্ছেদ হয়। ঐকান্তিকভাবে তাকে বিসর্জন দিয়ে লক্ষ্য হয় শুধুই প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। কিন্তু জ্ঞানলাভ হলে বৃহতের বোধ বিশ্বব্যাপ্ত হবে, আর সেই সঙ্গে গভীরও হবে। জ্ঞানের প্রসারে শুধুই বস্তুর উদ্ভাস নয়, জানতে বুঝতে পারা ও হয়ে জানা দুদিকেই অর্থ নিহিত রয়েছে। তাই অন্তরের শক্তি যত গভীরে নামবে, বিশ্ববোধ ও নৈর্ব্যক্তিক তুরীয় বোধ দুদিক দিয়েই পূর্ণতা আসবে—গভীরতায় প্রসারে ও উচ্চতায় জ্ঞানের প্রকাশ। সব কিছু রেখে জগৎকে ভাবের চোখে দেখার গভীরে থাকবে আত্মপ্রত্যয়, প্রজ্ঞান। ক্রমে তা বেড়েই চলবে, জগৎ ও আমি একাকার, জগৎকে ছাপিয়ে জগৎ হয়ে যাওয়া, এই হল বিশ্বাত্মক হওয়া। এ কিন্তু অজ্ঞানা, অজ্ঞেয়বাদ নয়, বিশ্বোত্তীর্ণ স্থিতিতে থেকে বিশ্বাত্মক বোধে কর্ম করে যাওয়া, এরকম হলে কর্মে ও জ্ঞানে বিরোধ থাকে না। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের সত্য অনুভব করা যায়—"বেদান্তজ্ঞান আঁচলে বেঁধে সংসার কর", তা সম্ভব। যতটা উচ্চে উঠতে হবে, গভীরেও ততটা নামতে হবে, সেখানে একবিন্দু চাঞ্চল্য নেই। বৃহৎকে সেখানে যদি ব্যাপ্ত করে দিতে পারি, কর্মের লক্ষ্যও তখন পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হয়, প্রজ্ঞানের প্রসার কিভাবে হয়, তাও বোঝা যাবে। মানুষ অজ্ঞান দিয়ে জীবনে তাকে নামাতে যায়, ব্যাপ্ত হয়ে দশের কাজে ঝুঁকে পড়ে, মনে করে মস্ত কাজ করছি। কিন্তু মূল জ্ঞানের অভাব থাকলে ভুল থেকে যাবে। কেননা জগৎ-জ্ঞান হতে হলে, অর্থাৎ ঐ তুঙ্গতা ও গভীরতার সঙ্গে ব্যাপ্তিবোধ এলেই তবে জগৎ-জ্ঞান পূর্ণ হবে। প্রজ্ঞানের উৎকর্ষ ঘটাতে হবে, তবেই না দিব্যজীবন। যে জীবনকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছি, তাতে থাকবে জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য-বর্ম। জ্ঞান না হলে সত্যকার বর্ম হয় না, বর্মে প্রলয় ঘটে যেতে পারে। জ্ঞানসহযোগে কর্ম করলে শক্তির মুক্তি ঘটে। জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হবে "সর্বেষাম্ অবিরোধেন"। বিজ্ঞানের সিদ্ধিতে আমরা সর্বজনীন সিদ্ধির কতকটা ধারণা করতে পারি, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর হতে উচ্চতন সমন্বয় আসা চাই। চাই এমন চিন্তার শক্তিপ্রবাহ যাতে সবটা—জগৎময় এক পরিবর্তন আসতে পারে। এই রূপান্তরের কাজই মহাজনের পথ, সকলের জন্য, তা একার হতে পারে না। তাতে ঐশ্বর্যের প্রকাশ হবে, কিন্তু রাশ টেনে ধরবে বৈরাগ্য। এখন দেখি বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য অশান্তি বাড়িয়েই চলেছে; সেই উচ্ছৃঙ্খলতার রাশ টেনে ধরতে না পারলে চলবে না। পুরুষকেই হতে হবে প্রকৃতির ভর্তা যার তা হতেই আনন্দের সন্ধান মিলে যাবে। তিনিই তখন ভোক্তা, আর তারপর মহাসমন্বয়ে তিনিই উপদ্রষ্টা মহেশ্বর, তখন প্রকৃতি তাঁর স্ত্রী, তার রূপান্তর ঘটে গেছে। তাই চেতনার বিকাশের অনুকূলে কর্ম করার অর্থ বাহিরের শিক্ষা ও সাধনার সঙ্গে অন্তরের বিকাশ স্ফূর্তি ঘটানো চাই। এই চেতনার বিকাশে বুদ্ধির ক্ষেত্রে ও ব্যবহারে যেমন অগ্নিক্ষেপী বার্তা দণ্ড নীতি ইত্যাদির ভিতর দিয়েও ঘটবে, তেমনই বোধির স্ফুরণে অন্তরলোকের বিকাশ ঘটা চাই, যাতে আত্মচৈতন্যের ভূমিগুলি উন্মোচিত হবে। তবেই না দিব্যজীবনের দিব্যসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এখনও তা দূরের লক্ষ্য।

চিন্তা করতে গেলে আবার স্মরণ করি, মনস্তত্ত্বমূলক বিচারে আমরা দেখেছি যোগীর কর্মের স্তর তিনটি, অকর্তার কর্ম, নিমিত্ত কর্ম ও পরিণামে দিব্যকর্ম। কর্মীর অহঙ্কার না

রেখে কর্তব্যকর্ম সুরু করেছি, হয়তো রস পাইনি। কিন্তু জ্ঞান হলে দেখতে পাই, আমি উপলক্ষ্য মাত্র, প্রকৃতির মূলে রয়েছে একটা উদ্দেশ্য, সে তাঁরই ইচ্ছা, তাতেই যে সর্বজনকল্যাণ। এইভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষগণ তাঁরই কর্ম করে চলেন। এই বোধে নিমিত্তকর্ম বুঝতে পারলে দেখব, জীবনের ব্রত কল্যাণ তাতেই। আর নিমিত্ত কর্তা হলে কর্মে রস সঞ্চার হয়। ফল না পেলেও বোধ হবে, তাঁর দেওয়া স্বকর্ম সাধিত হল, হয়তো একটিদুটি সাড়া দিল, আর কেউ বুঝল না। কিন্তু এ যে আমার জীবনের যোগযুক্ত ব্রত, একদিন তার সিদ্ধি হবেই এই জ্ঞান লাভ হয়, ফলের আকাঙ্ক্ষা করাতো চলবে না। সেদিকটা চাইলেই গোলমালে পড়তে হবে।

এরপর দিব্যকর্মের কথা বলতে হয়, সে অতি উচ্চস্তরের বোধ। আবিষ্ট হয়ে কর্ম করা, কে করায় বোঝা যায় নাকি যখন বুঝি আনন্দ পাই যে, এ তো তুমিই। কিন্তু সংশয়ী চিত্ত এখন প্রশ্ন তোলে, তাও কি সম্ভব? কিন্তু এর উত্তরটা এখন থেকে জেনে রাখা ভাল যে এরকম হলেই সত্যকার কর্ম বেশী হয়। প্রাকৃতভাবে আবিষ্ট হয়ে যান্ত্রিক কর্ম যে করে, সে হয়তো জানে না, সে কি করে। অপ্রাকৃতই বা কর্ম হবে না কেন? তা শুধু বাইরের কর্ম তো নয়, জ্ঞানেরও চূড়ান্ত কর্ম। রামকৃষ্ণদেব ও শশধরতর্কচূড়ামণির সাক্ষাৎকারের ঘটনা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। Mother-এর জীবনে এর পরিচয় পাওয়া যায়। এ অবস্থা আগে এসে পড়লে জড়িয়ে যাবার ভয় একটা থাকে, সে ভয় কাটাতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথায় ও সুরে কত ভয় ভেঙে দিয়েছেন—"প্রাণ বেঁধে রেখোনা, খুলে দাও। বাঁধ ভেঙে দাও, ভাঙো...সর্বনেশে ডাক। কিন্তু তরুণ চিত্ত এতে উৎসাহিত—"ব্যাঘাত আসুক নব নব, আঘাত খেয়ে অচল রব"। এই উদ্দীপনা নিয়ে জ্ঞান সহকারে কর্ম করলে, তাকে রুখবে কে? আসক্তি নিয়ে কর্ম করা নয়, আবার জড়িয়ে পড়ব বলে কর্ম এড়িয়ে চলব, তাও নয়। ভুল ভ্রান্তি যাই আসুক, তোমার পথে চলেছি লক্ষ্য স্থির ঐ তুরীয় লোকে। আমি তো কিছু করিনে, কর্ম হয়ে চলেছে আর তাতে সকলের কর্ম—সবাকার ধর্ম। গীতা আমাদের সামনে এই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ; কোরাণেও এই ভাব মুসলমানদের উদ্দীপ্ত করে, তাতে প্রচুর বল (শক্তি)। কিন্তু আমরা এখনও গীতার শিক্ষাকে জীবনে রূপ দিতে পারলাম কই? শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য উপদেশ—হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, যুদ্ধ করে চল, অদ্ভুত। গীতার সঙ্গে কোরাণের মিলও পাওয়া যাবে। গীতাতে জ্ঞানীর কর্মের উপদেশ নিপুণ যুক্তির অবতারণা। আর কোরাণে যেন ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় ঘটে, যাকে বলা যায় শিব-শক্তিরই সমন্বয়, ব্রহ্মই সক্রিয়, ব্রহ্মই অক্রিয়, একই সঙ্গে বুঝে চলতে হবে।

তাহলে দেখলাম; পূর্ণযোগের সাধনায় বিবেকদর্শন অপরিহার্য হয়েও ঐকান্তিক নয়। তাই প্রথমদিকে সাধনার নির্দেশ—অন্তরের ভাবনা বেদনা সঙ্কল্পকে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যে প্রণবে রেখে বাহিরের কর্মেও যুক্ত থেকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নানারকম প্রশ্নও আসে, যে নিস্তরঙ্গ চিত্তে ভাবনা আবেগের প্রেরণা না থাকলে কর্ম করা সম্ভব কিসের জোরে? দেহপ্রাণের অনেক ক্রিয়া সেভাবে চললেও মনের ক্রিয়া চলতে পারে কি?

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ ক্রিয়ায় আমরা আজকাল জানতে পেরেছি আমাদের ভাবনা বেদনা সংকল্পের অনেক প্রেরণাই অবচেতন মন থেকে আসে। সজাগ মনের যে অবস্থাটা আমরা জানি, সেটা একটা মধ্যবর্তী অবস্থা মাত্র, "মধ্যব্যক্ত", তার ওপারে ও নীচে দুটি অব্যক্তের বিপুল অধিকার—একটি মানসোত্তর ও নীচেরটি অবমানস। একটির খবর দেয় যোগবিজ্ঞান, অপরটির খবর আধুনিক মনোবিজ্ঞান দিয়ে থাকে। যথাক্রমে বোধি ও আশয় থেকেই তরঙ্গগুলি নামতে উঠতে থাকে। যোগে চেতনা অন্তরাবৃত্ত হলে বোধির উন্মেষ হয়। মনের সাহায্য না নিয়ে বোধি কেবল ইন্দ্রিয়ের সহায়ে নিখুঁতভাবেই সব কর্ম চালাতে পারে, এটা পরীক্ষিত সত্য। তাই জাগ্রত মনই যে বুদ্ধির একমাত্র ভাণ্ডার, এ সংস্কার ত্যাগ করতে হবে। এ বুদ্ধি বিশাল বুদ্ধির আংশিক সামান্য প্রকাশ মাত্র। জড়-প্রাণ মন সব কিছুর মধ্যে সক্রিয় মহৎতত্ত্বই সেই বিশালবুদ্ধির ভাণ্ডার—অব্যক্তের অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির প্রচ্ছদটা, তারও ওপারে পুরুষ। তাই যোগী যখন ঐ পুরুষতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, তখন আধারের সমস্ত ক্রিয়া তার বিবিক্ত চেতনার সম্মুখে চলে মহাপ্রকৃতির প্রশাসনে। তখন তিনি অন্তরে অস্পৃষ্ট থেকেও বাহিরে স্পন্দিত। কিন্তু বাহিরের স্পন্দ তাঁর অন্তরের নৈস্পন্দ্যকে স্পর্শ করে না, তাই তিনি স্বতন্ত্র (free)।

এই স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী পুরুষ কর্ম করেও কর্ম করেন না, পরমপুরুষের অধ্যক্ষতায় বিশ্বপ্রকৃতি তখন তাঁরই ইচ্ছামত কর্ম করে চলেন—তিনি উদাসীন সাক্ষীমাত্র। এ অতি উচ্চ অবস্থা কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, পূর্ণযোগের পক্ষে এ সিদ্ধি পর্য্যাপ্ত নয়। অখণ্ড-ব্রহ্মের ভাবনায় ব্রহ্ম শুধু সৎচিৎ নয়, আনন্দময় এবং শক্তিমান। আনন্দ ও শক্তিই তাঁর স্বরূপপ্রকৃতি। সত্তায় ও চেতনায় যিনি উপশান্ত, তিনিই আনন্দে ও শক্তিতে উল্লসিত। তাই উত্তমপুরুষের প্রকৃতি শুদ্ধসত্ত্ব, তাঁর স্বীয়া প্রকৃতি। তাঁকে আশ্রয় করেই পুরুষের স্বাতন্ত্র্য, আনন্দে ও শক্তিতে ভোগে এবং ঐশ্বর্যে পুরুষ শুধু উপদ্রষ্টা মাত্র নন, তিনি ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর।

আত্মচৈতন্যের ব্রহ্মচৈতন্যের বিস্ফারণ যদি সাধনার লক্ষ্য হয়, তাহলে ব্রহ্মের মত আত্মাও চতুষ্পাৎ—সত্তার প্রশান্তি চৈতন্যের দীপ্তি আনন্দের উন্মেষ শক্তির বিচ্ছুরণ কোন-টার অভাব না থাকলে, কারও সঙ্গে মনগড়া বিরোধ থাকবে না। আকাশে আদিত্য যেমন আত্মদীপ্তিতে ঝলমল করে, মাটির গর্ভেও তেমনি ফুল ফোটায়, খনির গর্ভে কয়লার মধ্যেও সান্দ্র হয় হীরকের দ্যুতিতে। যেমন সত্য অস্পন্দ আকাশ, তেমনিই সত্য আদিত্য হৃদয়ে ব্রহ্মক্ষোভের পরিস্পন্দ। অস্পন্দেরই স্পন্দ—এই হল সত্য।*

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি

(ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা)

শ্রীঅরবিন্দ

আমি বুদ্ধিগত সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় ভাবের মোটা কাঠামোটি বিবৃত করেছি, কারণ সেটাই সেই সমালোচকদের দৃষ্টিকোণ যাঁরা তার মূল্য অতিছিল্য করতে প্রয়াসী। আমি দেখিয়েছি যে বিদেশী এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারেও ভারতীয় সংস্কৃতি একটা উদার মহৎ অন্তঃপ্রেরণার সৃষ্টি বলে চিহ্নিত। হৃদয়ে মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, ব্যক্তিগত মানুষত্ব এবং তার বহুধা শক্তি ও সম্ভাব্য পরিপূর্ণতার চমৎকার ও ঊর্ধ্বগামী ভাবের দ্বারা আলোকিত সামাজিক এক স্থাপত্যের সুপ্রশস্ত পরিকল্পনার সঙ্গে সুসিনাস্ত হয়ে তা শুধু একটা প্রবল দার্শনিক, বৌদ্ধিক ও শৈল্পিক সৃজনশীলতারই দ্বারা নয়, একটা মহৎ উদ্‌জীবনী ফলপ্রসূ প্রাণশক্তিরও দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। কিন্তু শুধু এতেই তার অন্তরাত্মা বা মহত্ত্বের যথাযথ বর্ণনা হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গ্রীক বা রোমক সভ্যতার বিবরণ দেওয়া যায় এবং তাতে গুরুত্বপূর্ণ কিছুরই তেমন বাদ পড়ে না; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা একটা সাংস্কৃতিক প্রণালী মাত্র নয়, তা মানবাত্মার বিরাট ধার্মিক প্রয়াস।

ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সংস্কৃতির পার্থক্যের মূলে রয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক লক্ষ্য। এই যে লক্ষ্য ধরে দিয়েছে তার সকল সমৃদ্ধ ও অপর্যাপ্ত বিচিত্র রূপ ও ছন্দের এমন ভঙ্গিমা তা-ই দিয়েছে তাকে বিশিষ্ট প্রকৃতি। তাই অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে যেখানে তার মিল সেখানেও এটির দরুণে পড়েছে প্রত্যক্ষ মৌলিকত্ব ও একক মহত্ত্বের ছাপ। আধ্যাত্মিক আশ্পৃহা ছিল এই সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রনী শক্তি, মনীষার মণিপুর, তার প্রধান প্রবৃত্তি। এরই ফলে আধ্যাত্মিকতা শুধু জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যই হয়েছিল না, বরং চেষ্টা ছিল—মানব জাতির অতীত সেই অবস্থায় যতটা সম্ভব—জীবনের সমস্তখানিই আধ্যাত্মিকতার দিকে ফিরিয়ে ধরা। অথচ যেহেতু মানবমনে অপূর্ণ হলেও ধর্মই আধ্যাত্মিক প্রবণতার প্রাত্যহিক আদিরূপ, তাই অধ্যাত্মভাবের আধিপত্য, জীবনটাকে গ্রহণ করার তার প্রয়াস অনিবার্য করে তুলেছিল ধর্মের ছাঁচে চিন্তা ও কর্মকে ঢালাই, জীবনের সকল অবস্থার মধ্যে ধর্মীয় তাৎপর্য নিরন্তর অনুপ্রবেশ; এরই দাবি একটা সর্বব্যাপী ধর্মদার্শনিক সংস্কৃতি। ধর্মীয় রূপ ও নীতিসূত্র-শাসিত জিজ্ঞাসার নিম্নতর স্তরের বহু ঊর্ধ্বে উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার উদার উন্মুক্ত বিহার; এসবের বাঁধাবাঁধি তার কাছে দুঃসহ, যার আদৌ গ্রহণ করলেও তাদের ছাড়িয়ে চলে সে; যে-অভিজ্ঞতায় তার প্রাণ, স্থূলবাদী ধর্মীয় মনের কাছে তা অবোধ্য। কিন্তু মানুষ বলামাত্র এই উচ্চতম আন্তর শিখরে এসে পৌঁছয় না, এবং তার কাছে ওরকম

চাইলেও সে কখনো তাতে পৌঁছত না। প্রথমে তার প্রয়োজন নিরন্তর অবলম্বন এবং উত্তরণের তরাবলি ; তার চাই নীতিসূত্র উপাসনা প্রতিমা সংকেত আকার প্রতীকের একটা কিছু তারা, বিশ্রিত আধা-প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির খানিকটা প্রশ্রয় ও অনুমোদন যার উপর ভর করে অন্তরে সে গড়ে তুলতে পারে আত্মার মন্দির। সে-মন্দির সম্পূর্ণ গঠিত হলেই অবলম্বন সরানো যাবে, তারাটি অদৃশ্য হবে। যে ধর্মীয় সংস্কৃতি আজ হিন্দুধর্ম বলে পরিচিত তা এই উদ্দেশ্য শুধু সফলই করেনি, এই লক্ষ্য সম্বন্ধে সজাগও ছিল—যা অন্য কোন নীতিধর্মের ক্ষেত্রে বলা চলে না। কোনো নাম ধারণ করেনি সে, কারণ কোনো দলীয় সীমানা তার উদ্দেশ্য ছিল না ; বিশ্ব-আনুগত্যের দাবি তোলে নি সে, একমাত্র অভ্রান্ত নীতি বলে রব তোলে নি, মুক্তির একক সংকীর্ণ পথ বা দ্বার বলে খাড়া করে নি ; একটা ধর্মবিশ্বাস বা প্রথার চেয়ে এটি অনেক বেশি হয়েছিল মানবাত্মার নিত্যপ্রসারী ভগবন্মুখী প্রয়াসের এক ঐতিহ্য। একটা আধ্যাত্মিক আত্মগঠন ও আত্মাবিষ্কারের জন্য প্রচণ্ড বহুদিক ও বহুস্তর-সমন্বিত সুযোগ—একে একটিমাত্র জানা নামেই ডাকার যা-কিছু অধিকার তার ছিল—সনাতন ধর্ম। যদি ভারতীয় ধর্মের আন্তরিক এই অর্থটির সঙ্গত ও যথার্থ মর্যাদা দিতে পারি আমরাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারব।

ঠিক এইখানেই প্রথম বাধা যাতে য়ুরোপীয় মন হোঁচট খাচ্ছে ; সে নিজে ঠিক বুঝেই উঠতে পারে না হিন্দুধর্ম কী। প্রশ্ন তার, কোথায় এর আত্মা ? কোথায় এর মন ও সুনির্দিষ্ট চিন্তা ? এর অবয়বের রূপটি কোথায় ? ধর্ম সেখানে কি করে থাকতে পারে যেখানে কতক অচলায়ত অনুশাসন নেই যা অনন্ত নরকের ভয় দেখিয়ে বিশ্বাস উদ্রেক করে,—নেই কোনো দৈবী সিদ্ধান্ত, কোনো নির্দিষ্ট দৈবতত্ত্ব, কোনো বিশ্বাস,—যা বিরুদ্ধ ও বিরোধী ধর্ম থেকে তাকে পৃথক করে ধরে ? কি করে একটা ধর্ম হয় যার বাধা হিসাবে পোপ নেই, কোন ধর্মীয় শাসকগোষ্ঠি নেই, গীর্জা উপাসনাগৃহ বা কোনো ধর্মীয়সম্বাবেশ প্রথা নেই, অনুগামীদের পক্ষে অপরিহার্য কোনো রকম বাধ্যবাধক ধর্মীয় রূপ নেই, কোনো একটিমাত্র শাসন বা শৃঙ্খলা নেই ? কারণ হিন্দু পুরোহিতরা তো ধর্মধারীর কর্তৃত্বভাবহীন অথবা শাস্তিবিধানের ক্ষমতা-হীন উৎসব উদ্‌যাপক মাত্র আর পণ্ডিতরা তো শুধুই শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা, তাঁরা ধর্মের আইন প্রণেতা বা তার কর্তা নন। তাছাড়া হিন্দুকে ধর্ম কি করে বলা যায় যখন সে বরণ করে যাবতীয় বিশ্বাস—এক ধরণের সমূর্ধ্বগামী আস্তিক্যবাদ এবং নিরীশ্বরবাদের অবকাশ দিয়ে, এবং যাবতীয় সম্ভাব্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও সব রকম ধর্মীয় অভিযান সমর্থন করে ? একমাত্র নির্দিষ্ট অটল সমর্থক স্বচ্ছ হল সামাজিক নিয়ম,—তারও আবার বর্ণ অকল গোষ্ঠি হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বর্ণই শাসন করে, গীর্জা নয় ; অথচ সেই বর্ণ কাউকে তার নিজের বিশ্বাসের জন্য শাস্তি দিতে পারে না, বহুমতে বিশ্বাস নিষিদ্ধ করতে পারে না কিম্বা একটা বৈপ্লবিক নবতন্ত্র অথবা অভিনব আধ্যাত্মিক নেতা গ্রহণে বিরত করতে পারে না। যদি খ্রীষ্টান ও মুসলমানকে নিষ্ক্রান্ত করে সেটি তার ধর্মীয় বিশ্বাস বা আচরণের জন্য নয়, তা সেটি সামাজিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্যই। ফলত, বলা হয়েছে হিন্দু ধর্ম বলে

কিছু নেই, আছে শুধু একটা হিন্দু সামাজিক প্রথা যার ভিতরে গৃহীত একান্ত বিরোধী সব ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান। হিন্দুধর্ম একটা ইন্দ্রিয়াতীতের নিষ্ফলা রঙে প্রলিপ্ত লোকগাথার স্তূপ—বোধহয় বিষয়টি সম্পর্কে হালকা পাশ্চাত্য মনের এই-ই চূড়ান্ত রায়।

ধর্ম সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় মন ও সাধারণ পাশ্চাত্য বুদ্ধিকে আলাদা করে ধরেছে তার থেকেই এই মতানৈক্যের জন্ম। এই পার্থক্য এত বিপুল যে তার সেতু-বন্ধন হতে পারে শুধু একটা নমনীয় দার্শনিক অনুশীলন অথবা সুপ্রসর আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির দ্বারা; কিন্তু পাশ্চাত্যে অনুশীলিত ধর্মের প্রতিষ্ঠিত সব আয়তনে এবং দার্শনিক চিন্তার অনমনীয় পদ্ধতিতে দুটির একটিরও কোনো অবকাশ নেই। ভারতীয় মনের কাছে অনুশাসন ধর্মের ন্যূনতম মূল্যবান অংশ; আসল হল ধর্মীয় ভাব, তাত্ত্বিক মনশ্চিত্র নয়। বিপরীত পক্ষে পাশ্চাত্য মনের কাছে একটা ধর্মপন্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল স্থির নির্দিষ্ট মানসিক বিশ্বাস; তার কাছে এটিই তাৎপর্যের নাভিকেন্দ্র, এটিই অপরের থেকে তাকে পৃথক হবার বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। যেহেতু তার এই নির্দিষ্ট বিশ্বাসই তাকে সত্য বা কপট ধর্মের মর্যাদা দেয়,—তার সমালোচকের ধর্মবিশ্বাসের অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া অনুযায়ী। বুদ্ধিগত সত্যই যে উচ্চতম সত্য এবং, এমন কি, তা ছাড়া আর কিছু নেই, এটি পাশ্চাত্য এই ভ্রান্ত ধারণার—যতই বুদ্ধ ও হালকা হোক—আবশ্যকীয় পরিণাম। ভারতীয় ধর্মের চিন্তাবীর জানেন সকল উর্ধ্বতন শাশ্বত সত্য অন্তরাত্মার সত্য। পরম সত্য ন্যায়তর্কের কঠোর সিদ্ধান্তও নয়, মতানুযায়ী বাচনের স্বীকৃতিও নয়, তা বরং আত্মার আভ্যন্তরীণ অনুভূতির ফল। বুদ্ধিগত সত্য মন্দিরের বহিঃচত্বরের দিকে একটি দরজা মাত্র। আর যেহেতু অসীমের দিকে ফেরা বুদ্ধিজাত সত্য স্বভাবতই বহুমুখী হতে বাধ্য এবং একমুখী নয়, নানা বুদ্ধিগত বিশ্বাসও তেমনি সমানভাবে সত্য হতে পারে—কারণ, তারা অসীমেরই বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত করে ধরেছে। বুদ্ধিগত দৃষ্টের ব্যবধান যতই হোক, তারা তবু আশেপাশের দরজা যা দিয়ে মন পায় জ্যোতির্ভুবনের ক্ষীণ একটু রশ্মি। খাঁটি বা মেকি ধর্ম নেই, সব ধর্মই নিজের নিজের ভাবে ও মাত্রায় সত্য। প্রত্যেকে সেই এক শাশ্বতের দিকে নানান রাস্তার কোনো একটি।

ভারতীয় ধর্ম মানবজীবনের সামনে চারটি আবশ্যকীয় জিনিস ধরে দিয়েছে। প্রথম, মনের উপর চাপিয়েছে এই বিশ্বাস যে আছে একটা উচ্চতর চেতনা কিম্বা বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত এক সৎ—যা থেকে সবকিছুর উদ্ভব, যাতে না জেনেও সত্তার অস্তিত্ব ও আত্ম-সঞ্চালন এবং যার সম্বন্ধে সকলকেই এক সময়ে না এক সময়ে সচেতন হতে হবে, ফিরতে হবে তার দিকে যা পূর্ণ শাশ্বত অসীম। আরো, ব্যক্তিগত জীবনকে দিয়েছে এই বোধ যে তার প্রয়োজন ক্রমবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা আত্মপ্রস্তুতি, যতক্ষণ না মানুষ এই বৃহত্তর অস্তিত্বের সত্তো সচেতনভাবে গড়ে উঠবার চেষ্টার জন্য তৈরি। তৃতীয়, এটি দিয়েছে সুপ্রতিষ্ঠ সু-নিরীক্ষিত বহুধা-বিস্তৃত এবং সদাপ্রসারী জ্ঞানের, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সাধনার পন্থা। শেষ, যারা এখনো এই উর্ধ্বতর সোপানাবলীর জন্য প্রস্তুত নয় তাদের দিয়েছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত

জীবনের একটা শৃঙ্খলা, ব্যক্তিগত ও সমাজগত শৃঙ্খলা ও আচরণের একটা ছক, মানসিক নৈতিক ও প্রাণিক ক্রমোন্নতির একটা কাঠামো—যার সাহায্যে নিজের নিজের সাধ্যের মধ্যে নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী চলে তারা প্রত্যেকে প্রস্তুত হয়ে ওঠে শেষে বৃহত্তর জীবনের জন্য। এই সব উপাদানের প্রথম তিনটি যে-কোনো ধর্মের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য, কিন্তু হিন্দুধর্ম শেষোক্তটির উপরও আরোপ করেছে বিরাট গুরুত্ব : তা জীবনের কোনো অংশকে ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক জীবন থেকে ধর্মনিরপেক্ষ বা অনাবশ্যক বলে বাহিরে সরিয়ে রাখেনি। তথাপি ভারতীয় ধর্মের ঐতিহ্য শুধু—অজ্ঞ সমালোচক ভ্রান্তভাবে যেমন কল্পনা করে বসেন —একটা ধর্ম-সমাজ ব্যবস্থার রূপ নয়। একটা সামাজিক নবযাত্রার মুখে যতই তার মূল্য থাক, রক্ষণশীল ধার্মিক মন যতই কঠিনভাবে সমস্ত উচ্চকিত বা আমূল পরিবর্তনে বাধা দিক, হিন্দুধর্মের মূলকেন্দ্র আধ্যাত্মিক—একটা সামাজিক শৃঙ্খলা নয়। বাস্তবিকপক্ষে দেখতে পাই শিখধর্মের মতো ধর্মগুলিও বৈদিক পরিবারের মধ্যে গণিত যদিও তারা পুরানো সামাজিক ঐতিহ্য ভেঙে ফেলেছে এবং আবিষ্কার করেছে নূতন একটা অঙ্গরূপ, অথচ জৈন ও বৌদ্ধরা বরাবর রীতিমতো এই ধর্মের আওতার বাহিরে স্বীকৃত হলেও তারা হিন্দু সামাজিক প্রথা মেনে এসেছে এবং হিন্দু বিবাহ করেছে, কারণ তাদের আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা ও শিক্ষার শুরুতে ছিল বৈদিক সত্য অস্বীকার এবং বৈদিক পন্থার প্রবাহ থেকে বিচ্ছেদ। এই যে চার উপাদানে গঠিত হিন্দুধর্ম সেখানেও নানা দলে, শ্রেণীতে, সম্প্রদায়ে ও জাতে মুখ্য ও গৌণ পার্থক্য রয়েছে; অথচ তা সত্ত্বেও সর্বত্র রয়েছে একটা আত্মিক ঐক্য, বৌদ্ধ ধরন ও আকারের এবং আধ্যাত্মিক মেজাজের ঐক্য—যা অমন অবাধ তারল্যের মধ্যে সৃষ্টি করেছে ঘনবদ্ধতার এক বিরাট শক্তি এবং ঐক্যের একটা প্রবল নীতি।

সকল ভারতীয় ধর্মের মূলগত ভাবটি সর্বদেশে উচ্চতম মানবচিন্তার সেই একটিই। সকল অস্তিত্বের পরম সত্য হল এমন এক পুরুষ বা অস্তি যা এখানে আমাদের সকল মানসিক ও শারীরিক প্রত্যক্ষীভূতের অতীত। মন প্রাণ দেহের ঊর্ধ্বে রয়েছে চিৎসত্তা বা আত্মা যাতে বিধৃত যা কিছু সান্ত ও অনন্ত, যা সবকিছু আপেক্ষিকের অতীত, যা এক পরম অক্ষর, সৃজন ও ধারণ করছে এই সবকিছু নশ্বরকে, এক অক্ষয় শাশ্বত। এই এক নিষ্পাতীত নিষ্পগত অনাদি শাশ্বত দৈব কিম্বা দিব্য সৎ-চিৎ-শক্তি-আনন্দ—সর্বভূতের উৎস, আধার ও আধেয়। আত্মা প্রকৃতি প্রাণ এই আত্ম-সচেতন মহাকাল এবং এই সচেতন শাশ্বতের একটা প্রকাশ বা আংশিক সঙ্কুচন মাত্র। কিন্তু ভারতীয় মন সত্তার এই সত্যকে শুধু একটা দার্শনিক গবেষণা, একটা দৈবতাত্ত্বিক সূত্রসার, বুদ্ধিকল্পিত একটা ভাব মাত্র নয়। এটি পাঠককে বলে ভাবুকের মনোরঞ্জনের ভাবনামাত্র নয়, জীবনের সঙ্গে যার অন্য কিছু কার্যকরী সম্বন্ধ নেই। মানুষের বিশ্ব এবং প্রকৃতি নিয়ে কারবারে অবজ্ঞা করা চলে এটি এমন মিস্টিক ঊর্ধ্বোন্নয়নও নয়। এটি ছিল জীবন্ত সত্য, একটি সত্তা, একটি শক্তি, একটি সান্নিধ্য যা আপন যোগ্যতা অনুযায়ী সর্বজনগ্রাহ্য এবং জীবন ও জীবনাতীতের মধ্যে দিয়ে সহযুগধাত্রী সত্য। জীবনে প্রস্ফুটিত করে ধরা হত এই সত্য, চিন্তনা জীবন ও কর্মের নিয়ামক ভাবনা হিসাবে সর্বভূতের

অন্তরালে এই কিছু বা কোনো সর্বোত্তমের স্বীকৃতি ও অনুসরণ ভারতীয় ধর্মের এক সর্বগ্রাহ্য মতপ্রত্যয়,—এটি যদি সহস্র রূপ নিয়ে থাকে তবে তাতেই তার প্রাণপ্রাচুর্যের জাজ্বল্য প্রমাণ। অনন্ত আছে বলেই সান্তের অস্তিত্ব আর সান্তের নিজস্ব কোনো পৃথক মূল্য বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। জীবন যদি মায়া না হয়, তাহলে দিব্য লীলা, অনন্তের মহিমারই এক প্রকাশ। অথবা এ মন এক পন্থা যার সাহায্যে প্রকৃতির মধ্যে বহিষ্কৃ আত্মা অগণিত জন্ম ও অসংখ্য রূপের ভিতর দিয়ে প্রেম জ্ঞান বিশ্বাস ভক্তি ও কর্মে ভগবদ্‌মুখী এষণার সাহায্যে এই বিশ্বাতীত পুরুষ ও অনন্ত সত্তার সান্নীপ্য স্পর্শ ও অনুভূতি পেতে পারে, তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। এই পরমাত্মা বা এই স্বয়ম্ভু সত্তাই একমাত্র পরম সত্য, অন্য সব কিছু আপাতদৃশ্য কিম্বা এর উপর নির্ভর করেই সত্য। ফলত, প্রাণবন্ত এবং বুদ্ধিমন্ত মানব জীবের মহৎ কারবারই হল আত্মসিদ্ধি ও ভগবৎসিদ্ধি। শেষে সমগ্র জীবন এবং চিন্তা হল এই আত্মসিদ্ধি ও ভগবৎসিদ্ধির অভিমুখে প্রগতির এক উপায়।

পরম সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধিগত বা ধর্মবিজ্ঞানমূলক ধারণাগুলিকে ভারতীয় ধর্ম কেন্দ্রীয় গুরুত্বের একমাত্র নাভিস্থানীয় আদৌ মনে করে নি। যে-কোনো ধারণায় বা রূপে সেই সত্যের অনুসরণ, আন্তর অভিজ্ঞতায় তাতে পৌঁছানো, চেতনায় তাতে বাস করা, এটিকেই সে একমাত্র প্রয়োজনীয় জেনেছিল। কোন মত বা সম্প্রদায় হয়ত জেনেছে আসল মানবাত্মা বিশ্বাত্মা বা পরমপুরুষের সঙ্গে অভিন্ন একাত্ম। অন্য কোথাও মানুষ ভগবানের সঙ্গে মূলত এক অথচ প্রকৃতিতে পৃথক। তৃতীয় কোনো ভাবনায় হয়ত ঈশ্বর, প্রকৃতি ও মানবাত্মা তিনটিই সত্তার চির স্বতন্ত্র শক্তি। তবে সকলের ক্ষেত্রেই আত্মার সত্যটি সমান বলবৎ ছিল, যেমন দ্বৈতবাদীর ক্ষেত্রেও ঈশ্বর হলেন এমন পরমাত্মা ও পরমসত্য যার ভিতরে যার সহায়ে প্রকৃতি ও মানুষ জীবন্ত সচল বাস্তব, সেখানে তার বিশ্বাবলোকন থেকে ঈশ্বরকে বহিষ্কার করে দিলে প্রকৃতি ও মানুষ তাদের সমস্ত অর্থ ও গুরুত্ব হারায়। ভারতবর্ষের যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায় এবং পরস্পরবিরোধী ধর্মদর্শন সকলেই সর্বদা স্বীকার করেছে চিৎপুরুষ, বিশ্ব-প্রকৃতি (মায়া, প্রকৃতি কিম্বা শক্তি—যে নামই দেওয়া হোক) ও জীবগত আত্মা এই তিনটি সত্যকে। একথাও সর্বত্র স্বীকৃত ছিল যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধির শর্ত মানুষের ভিতরে ভগবান পরমাত্মা বা শাশ্বত ব্রহ্মের সঙ্গে মানবের অন্তর্বাসী আত্মার আধ্যাত্মিক সত্তা, তার অন্তরের অপার্থিব আত্মাকে আবিষ্কার করা এবং কোনো এক রকম জীবন্ত ও মিলনাত্মক সংস্পর্শ কিম্বা একান্ত একাত্মতা। আমরা ভগবানকে নির্ব্যক্তিক অক্ষর ও অনন্তের রূপে ভাবনা ও অভিজ্ঞতায় ধরতে কিম্বা তাকে বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত শাশ্বত পরমপুরুষ রূপে জানতে ও উপলব্ধি করতে পারি : কিন্তু যে-পথ ধরেই তাঁকে ছুঁই না, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার একমাত্র গুরুত্ব-পূর্ণ সত্যটি হল—তিনিই সর্বভূতের হৃদয়ে ও কেন্দ্রে, আর এই সর্বভূত রয়েছে তাঁরই মধ্যে এবং তাকে পাওয়াই মহত্তম আত্মাবিষ্কার। ভারতীয় মনের কাছে বিশ্বাসের নানা মত সর্বা-ন্তরস্থ একই আত্মা ও ঈশ্বরকে দেখার নানা পথ। আত্মোপলব্ধিই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস : আন্তর চিৎপুরুষের দিকে উন্মীলন, আনন্ত্যে বসবাস, শাশ্বতের সন্ধান ও আবি-

ভার, ভগবানের সঙ্গে মিলন—এই হল ধর্মের সর্বগ্রাহ্য ধারণা ও লক্ষ্য, আধ্যাত্মিক মুক্তির অর্থ, সার্থককর ও মুক্তিপ্রদ সত্য। উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্য ও উর্ধ্বতম আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের এই রকম প্রবল অনুসরণই ভারতীয় ধর্মের মিলনসূত্র এবং তার সমস্ত রূপের অন্তরালে নিজস্ব একই সর্বচর সারবস্তু।

ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক প্রতিভা কিম্বা ভারতীয় সভ্যতার আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি হিসাবে প্রথম সারিতে দাঁড়াবার দাবির স্বপক্ষে আর কিছু বলার না থাকলেও এই একটি মাত্র তথ্যেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা প্রমাণ হত যে নিভিক ঔদার্যে পরিদৃষ্ট, অতুলনীয় তীব্রতায় অনুভূত ও প্রকাশিত, সকল সম্ভাব্য দিক থেকে লভ্য এটি শুধু বহত্তম প্রশস্ততম আধ্যাত্মিক সত্যই নয়, এটিকে সজ্ঞানে অনুপম উন্নয়নকারী জীবনাদর্শ, যাবতীয় চিন্তার মণিপুর, সকল ধর্মের ভিত্তি, মানব অস্তিত্বের গূঢ়ার্থ ও বোধিত পরম লক্ষ্য করে তোলা হয়েছিল। বিঘোষিত সত্যটি ভারতীয় চিন্তার একান্ত সম্পদ নয়; শ্রেষ্ঠ মন শ্রেষ্ঠ আত্মা সর্বদেশে তাকে দেখেছে ও অনুসরণ করেছে। তবে অন্যত্র তা হয়েছে মাত্র কতিপয় চিন্তাবীর কিম্বা বিরল নিগূঢ়িক অথবা অসাধারণভাবে সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক স্বভাবের জাগ্রত নির্দেশক হিসাবে। কিন্তু আপামর সাধারণের এই লোকোত্তর কিছুর সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান, কোনো স্পষ্ট ধারণা, একটা প্রতিবিম্ব দর্শনও ছিল না; তারা জীবনে ধরেছিল ধর্মের নিম্নতর দলগত দিকটা, কুলদেবতার নিকৃষ্টতর ধারণাটি, আর না হয় প্রাণের বহির্মুখী ও জাগতিক নানা দিক। নিজের কল্পনাদৃষ্টির প্রয়াস, অনুসন্ধানের তীব্রতা, অনুধাবনের সাত্বিকতা দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি যা আর কোনো সংস্কৃতি পারেনি তাই করতে সফল হয়েছে। পেরেছে ধর্মের উপর যাঁটি আধ্যাত্মিকতার মুখ্য আদর্শের একটা ছাপ ফেলতে; ধর্মের সকল ক্ষেত্রে একান্ত উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের কিছু জীবন্ত প্রতিফলন এবং তার প্রভাবের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এনে ধরতে পেরেছে। ভারতীয় সাধারণ ধার্মিক মন ভারতীয় ধর্মের উচ্চতর আধ্যাত্মিক অথবা তাত্ত্বিক সত্যগুলি আদৌ বুঝতে পারেনি—এর চেয়ে অসত্য কিছু বলা যেতে পারে না। তারা চিরকাল আচার-অনুষ্ঠান, দলমত এবং সম্ভাবনুলির বহিরাঙ্গের মধ্যে জীবনধারণ করেছে একথা বলা নির্জলা মিথ্যা অথবা মতলবপূর্ণ ভুলবোঝার প্রচার। বরং, ভারতীয় দর্শনের প্রধান তাত্ত্বিক সত্যগুলি তাদের প্রশস্ত ভাবরূপে কিম্বা একটা নিবিড় কাব্যিক ও সক্রিয় রূপায়নে সাধারণ জনমানসের উপর ছাপ ফেলেছে। পথে পথচারী এবং মন্দিরে পূজারীর কাছে যেমন তেমনি নিভৃতের দার্শনিকের কাছে, মঠে সন্ন্যাসী এবং কুটিরে সাধুর কাছে মায়া, লীলা, দৈব সর্বব্যাপিত্বের ভাবসমূহ সুপরিচিত। যে আধ্যাত্মিক সত্য তারা প্রতিফলিত করে, যে গভীর অভিজ্ঞতার দিকে তাদের অঙ্গুলিনির্দেশ তা সমস্ত জাতির ধর্মে সাহিত্যে শিল্পকলায়, এমন কি জনপ্রিয় ধর্মসংগীতেও ছড়িয়ে গিয়েছে।

একথা সত্য যে জনসাধারণ চিন্তার কষ্টসাধ্য প্রয়াস ব্যতীত ভক্তির ভাবোদ্দীপনায় আরো সহজেই এসব উপলব্ধি করতে পেরেছে—তাই তো হতে বাধ্য এবং হওয়া উচিত—যেহেতু বুদ্ধির চেয়ে মানুষের হৃদয় পরম সত্যের আরো কাছে। একথাও সত্য যে বহিরঙ্গের

উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দেবার প্রবণতা বরাবরই এখানে ছিল এবং তার ক্রিয়া গভীরতর আধ্যাত্মিক লক্ষ্যটি আচ্ছন্ন করেছিল ; তবে সেটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই কিছু একটা অস্বাভাবিক নয়, এটা মানব প্রকৃতিরই একটা সর্বত্র সুলভ ত্রুটি, কম তো নয়ই বরং এশিয়ার চেয়ে য়ুরোপেই বেশি প্রকট। সত্যটির প্রাণবত্তা বজায় রাখতে এবং আকার অনুষ্ঠান আচারের প্রাণঘাতী দুর্ভার প্রতিহত করতে প্রয়োজন হয়েছিল সাধুসন্ত, ধর্মভাবুক ও সিদ্ধসন্ন্যাসীদের শিক্ষার এক নিরবচ্ছিন্ন ধারা। অবশ্য এই সত্য ধ্রুব যে আত্মার এমন বাণীবাহকদের অভাব কখনো হয় নি। আরও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল এই বাণী শুনবার জন্য সাধারণ লোকমানসের প্রসন্ন আগ্রহেরও কোনো কালে অভাব ঘটে নি। সাধারণ জড়াশ্রিত আত্মা, বহির্মুখী মন অন্যত্র যেমন তেমনি ভারতেও সংখ্যাগরিষ্ঠ। য়ুরোপীয় সমালোচকের পক্ষে এই আমাদের মানবত্বের সর্বত্রগোচর তথ্যটি ভুলে যাওয়া এবং এই ভঙ্গিকে ভারতীয় মতিগতির অস্বাভাবিক চিহ্ন বলে গ্রহণ করাই সহজ! তবে ভারতবাসীর—অন্ত জনসাধারণের পর্যন্ত—অন্তত এই বৈশিষ্ট্য আছে যে বহু শতাব্দীর প্রশিক্ষণের ফলে তারা সব আভ্যন্তরীণ সত্যের নিবিড়তর নিকটবর্তী, সেসব থেকে অপেক্ষাকৃত হালকা বিশ্বব্যাপী অজ্ঞতার এক পর্দা দিয়ে বিচ্ছিন্ন, এবং যে-কোনো স্থানের জনসাধারণ কিম্বা বিদগ্ধজনের চেয়ে অধিকতর অনায়াসে ঈশ্বর, পুরুষ, আত্মা ও শাশ্বতের জাগ্রত দর্শনে প্রচালিত। আর কোথায় বুদ্ধের সমুচ্চ কঠোর ও দুরূহ সাধনা এত তাড়াতাড়ি জনমানসকে আকৃষ্ট করতে পারত? আর কোনখানে তুকারাম রামপ্রসাদ কবীর ও শিখ গুরুদের গান, উচ্ছল ভক্তি এবং সেই সঙ্গে গভীর আধ্যাত্মিকচিন্তা-জড়িত তামিল সন্তদের গীতি এমন দ্রুত সাড়া পেয়েছে, ধরেছে এমন জনপ্রিয় ধর্মসাহিত্য? আধ্যাত্মিকতার এই প্রবল সংক্রামণ অথবা একান্ত ঘনিষ্ঠতা একটা গোটা দেশেরই মনে উচ্চতম সত্যের দিকে ফিরবার প্রস্তুতাবস্থা, একটা প্রাচীন বাস্তব, এখনো জীবন্ত ও অপরিসীম আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির চিহ্ন ও পরিণাম।*

---

* Foundations of Indian Culture থেকে। অনুবাদ : সমীরকান্ত গুপ্ত

টুকরি

নিশিকান্ত রায়চৌধুরী

বোয়ে গেছে

কাকাবাবু আজ এনেছে আমার
নতুন হারমোনিয়ান।
আমার বরাতে নেই বুঝি গান শোনা।
গাড়ী ছেড়ে দেবে তিনটে তেতাল্লিশে।
ভারি বোয়ে গেছে। কাজ থাকে চ'লে যাও।

ভাঙা কার্ণিশে

তেতলা ছাদের ভাঙা কার্ণিশে উঠেছে অশথ চারা,
তারই কচি ডালে বসে আছে প্রজাপতি
ঐ টুকুতেই মিটায় বনের আশা।

ছেলের মা

বড় মোক্তার নরেশবাবুর বউ
কহিলেন জ্ঞানদাকে—
"ওরে গেনি, শোন, তোর তো তিনটি ছেলে,
আমাকে একটি দে না।"
জ্ঞানদা কহিল—"তুমি যদি আমি হতে
আমার ছেলেটি তবেই তোমার হ'তো।"

নরেন বাবু আর যতীনবাবু

সারাটা সকাল ভাবতে ভাবতে গেল,
—কোন উত্তর দেবো।
যত পড়ি বোসে নরেন বাবুর চিঠি,
তত মনে পড়ে যতীন বাবুর কথা।

আস্তাকুঁড়ের উৎসব

বিয়ে বাড়ীতে চুকে গেছে কাল
ভুরিভোজনের পালা,
এঁটো খুরী আর এঁটো কলাপাতা
পড়ে আছে চারি পাশে।
সেখানে এখন ভোজ লাগিয়েছে কুকুরে ও দাঁড়কাকে;
খেঁড়া কেনারাম তাদেরই মধ্যে বোসে
ভ'রে নেয় তার ফুটো বাটি আর
কানাভাঙা থালাখানি।

আকাশের চাঁদ

মনের ভিতরে রাখাতো সহজ
স্বপ্ন আসন পেতে;
খড়ের চালায় রাখবো কোথায় ওকে?
কলেজের ক্লাসে হয়েছিল দুটো কথা,
সে কথার শেষ গাজনতলায়
এঁদো পুকুরের পাড়ে।

বিদ্যুৎ

রাত্তিরবেলা কালো কালো মেঘে মেঘে আকাশ ঢাকা,
বিদ্যুৎ চমকায়
এ পাড়ায় যত ঘর বাড়ী আছে থেকে থেকে হয় আলো।
আলো লাগে ঐ বাতাবী লেবুর গাছে,
আর লাগে ঐ দোতলা বাড়ীর খোলা জানালার ধারে
কার বিছানায়,
মনে মনে দেখি ছবি।

নদী

চারিপাশে ঐ শাদা বেলে বেন
পড়েছে বালির চর;
মাঝখানে তার নীল আকাশের
ক্ষীণ নদীটির রেখা।

প্রবোধবাবু

সুপ্রভা এসে বলে,—
"সুনীলা, লুকাস কেন,
ঐ বুঝি তোর প্রবোধ বাবুর চিঠি?"
কেড়ে নিয়ে দেখে শুভবিবাহের পত্রখানি,
আসছে পঁচিশে তনিমার সাথে
প্রবোধ ঘোষের বিয়ে।

ইলেকট্রিক

চৌরঙ্গীর বড় বাড়িটায় সানাই বাজে,
ব্যারিষ্টারের ছেলের সঙ্গে জজের মেয়ের বিয়ে।
আমি শুধু দেখি বাহিরে দাঁড়িয়ে পথে
ইলেকট্রিকের নিষ্ঠুর আলোগুলো।

টর্চ

তখনো অন্ধকার;
কিসের শব্দ? বাগানে ঢুকেছে গরু?
নয়তো বাদুড় এসেছে আমের লোভে।
টর্চের আলো জ্বালিয়ে দেখি,
জামরুল গাছে একটা ছেলে
তলায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আঁচল পেতে।

তন্ময়

কলেজের বই খোলাই হলোনা মোটে;
লজিকের নোট বন্ধ খাতার বাঁধা।
টেবিলের কোনে ইজি চেয়ারের পাশে
অকারণে আজ পুড়ে যায় মোমবাতি।
বারীণ কোথায় চায়ের নিমন্ত্রণে
কুড়িয়ে পেয়েছে একটি চুলের কাঁটা।

কনে দেখা

ছয় মাস আগে কলেজ ছেড়েছ?
শেলী পড়েছ তো, কবি ব্রাউনিং?
ঘরের কোণের হার্মোনিয়াম তোমারি বুঝি,
বাজাতে জানো তো?
গাও তো একটা নজরুল ইস্‌লাম।

ফণি ও রেবা

ফণিবাবু বলে নবীনা বধূরে ডেকে,
"দেখো রেবা আজ বাইরে যাব না,
শরীর খারাপ বড়ো।"
রেবা বলে—
"আজ ললিতবাবুর জন্মতিথি,
আমাকে যে গান গাইতে হবে।
চুপ কোরে তুমি শুয়ে থাকো লক্ষ্মীটি,
ফিরতে আমার দেরী হ'তে পারে কিছু।"

উধাও

রাঙা পথখানি ফ্যাকাশে হয়েছে চাঁদের আলোয়,
ধূ ধূ করে খোলা মাঠ;
একা তাল গাছ শূন্যে তাকায়ে রয়।
থেকে থেকে আজ দমকা হাওয়ায়
আঁচলে পাঞ্জাবীতে
বাধায় হুলুস্থুল।

মুখার্জি

আঃ!
এত রাতে কের ডাকাডাকি কেন, কে তুমি
কি চাও?
সতীশটা বুঝি?
আবার মরেছে?

বিশ্রাম নেই, ঘরেই চলেছে ঘন্টায় ঘন্টায়।
এখনি তো যাবো একটাকে নিয়ে নিমতলা ঘাটে
জ্বালিয়ে দিলাম
আবার মরলো কে?
বাজারের মেয়ে, ফেলবার লোক নেই?
তা বুঝেছি আমি।
তা না হ'লে এই লক্ষ্মীছাড়াটাকে ডাকবে কেন?
বর্ষা চুরোট বুঝি?
দাও ভাই, আগে নিজেই নিজের মুখাগ্নি সেরে নিই?
তারপর গিয়ে ও বেটির মুখে আগুন দেব।

কাগজের নৌকো

আজ বাদলের জল বহে যায়
সাম্‌নের নালা দিয়ে—
টুকরো কাগজে নৌকো বানিয়ে শিশু
ভাসিয়ে দিয়েছে, তুলে নিয়ে দেখি, লেখা
"সুলেখাকে মনে রেখো।"

দু'বছর পরে

—এই যে মালতী!
—একি! একি! তুমি! আপনি। কখন
—এক্ষুনি এই সাড়ে তিনটের গাড়ীতে এসেছি।
খুব ভয় পেয়ে গেছ?
—না না, ভয় কেন? তবু এতদিন—
এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?
চিঠি তো লেখনি।
সেই কত কাল আগে
মোটে দুটো চিঠি।
—সে চিঠিতে আর কাজ কি এখন,
পুড়িয়ে ফেলো। এই নেও দেশলাই।

কাঁদছো কেন ?
মালতী, মালতী, —সতি।
এখন তো তুমি—
থাক তবে আমি যাই।

ড্রইংরুম

ওগো দেখো, দেখো, এই ঘরটাই
কোরবো ড্রইংরুম।
দরজা দুটোয় পর্দা
ঝোলাবো কুলকাটা নক্সনে
ওকোণে থাকবে তোমার টেবিল,
একোণে আয়নাখানা।
ভালো দেখে দুটো ফুলদানি কিনো,
কুসন যে কটা পারো।
পাঁচখানা ছোট কার্পেট চাই,
আর বেছে এনো ভবানী নাহার ছবি।

আমার কথাটি ফুরোলো

আমার কথা ফুরোয়, তবু
আমার কথা জমে।
নতুন নটে গজিয়ে ওঠে
নতুন শাকের ক্ষেতে।
পরু চরে মুড়িয়ে দেয়,
ভাত দিতে বৌ ভোলে,
কেন ভোলে সেই কথাটি
বলা রইলো বাকি।

(সমাপ্ত)

বিচিত্রা, ১৩৩৮

শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী সংস্করণ

Words of Sri Aurobindo	1st Series	2·50
,, ,,	2nd Series	4·00
যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০
উত্তরপাড়া অভিভাষণ	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম		২·০০
গীতার ভূমিকা	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
মাতৃবাণী	শ্রীমা	১·৫০
মায়ের আলাপ	শ্রীমা	৩·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী (৩য় সংস্করণ)		২·০০
মা কি বলেন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·০০
শতাব্দীর প্রণাম		৩·৫০
স্মৃতির পাতা (২য় পর্যায়)		৪·০০
শ্রীঅরবিন্দায়ন (সচিত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন, বাণী ও সাধনা)	(২য় সং) নীরদবরণ	৪·০০
অরবিন্দ-প্রসঙ্গ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১·৮০
শ্রীমা-প্রসঙ্গ	কে, আর, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	২·৮০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও যোগ	প্রমোদকুমার সেন	৫.০০
বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা	চারুচন্দ্র দত্ত	৩·৫০
কে এই মা ?	পশুপতি ভট্টাচার্য	৫·০০
দিব্য জীবনের সন্ধানে		৩·৫০
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মযোগ	সুধা বসু	৫·০০
Sri Aurobindo on Man	D. P. Chattopadhyaya	1·80
শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ		৭·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২৩৭৬

সাধক কবি নিশিকান্ত রচিত

কালজয়ী কাব্য

নীলাঞ্জন

ইন্দ্র দুগ্গার অঙ্কিত আটখানি বহুবর্ণ চিত্র ও বিবিধ রেখাচিত্রে অলঙ্কৃত

পরিবেশনে :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশনী বিভাগ
পণ্ডিচেরী—২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

বিক্রয়কেন্দ্র :

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

একটি চিত্তাকর্ষক কাব্য গ্রন্থ
বাংলা সাহিত্যে একটি অভিনব সংযোজন—
মূল তামিল থেকে বাংলায় অনুবাদ—

আলবার পদাবলী

সমীরকান্ত গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনের পদাবলী, দাক্ষিণাত্যে তামিলদেশে তেমনি আলবারদের 'প্রবন্ধন্' বা পদাবলীর সমার্থক স্তবমালা। বেশ-কয়জন আলবারের পদসংগ্রহ এই গ্রন্থে তাঁরা হলেন—

তিরুমঙ্গৈ আলবার পেরিয়ালবার
কুলশেখরণ আলবার অণ্ডাল নম্মালবার

বঙ্গানুবাদের ভাষা, তার লালিত্য, শব্দব্যঞ্জনা, ধ্বনিঝঙ্কার, মন্ত্রধ্বনিমুখর কাব্যশৈলী পাঠকদের মুগ্ধ করবে।

মূল্য : দশ টাকা

—প্রকাশক—

শৃঙ্খল

৬৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

34-3720

With the best Compliments from:—

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street

Calcutta-12

শ্রীঅরবিন্দায়ণ

নীরদবরণ

(শ্রীঅরবিন্দের সচিত্র জীবন, কর্ম ও সাধনা)

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য চার টাকা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বাণী বহ
একমাত্র আধ্যাত্মিক মাসিক পত্রিকা

শৃণ্বন্তু

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রতি সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ

★ শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের ধারাবাহিক অনুবাদ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

★ শ্রীঅরবিন্দের কাব্য সাহিত্য দর্শন সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তামূলক একাধিক গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ।

★ শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ জীবনালেখ্য
"ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ"—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

★ দৈনন্দিন সমস্যাপীড়িত জীবনের পথে দিশারী ও প্রেরণাস্বরূপ শ্রীমায়ের বাণী ও মায়ের আলাপ।

বার্ষিক চাঁদা (সডাক) দশ টাকা।
বৈশাখ সংখ্যা হইতে বর্ষ আরম্ভ।
বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

যোগাযোগের ঠিকানা

শৃণ্বন্তু
৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

It is the darkest nights that prepare the greatest dawn.
—Sri Aurobindo

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers

149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)

Gram : UNIBOX Phone :

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works (P.) Ltd.

90, BENARAS ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-2434

34-2665 Gram: Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড	একাদশ বারশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০
অষ্টম খণ্ড	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়	২·০০
	প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড একত্রে বাঁধাই	২০·০০

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field:
SREEPORE BAGHARGHOLE
P. O. BONHOOGHLY, 24 PARGANAS

Head Office:
34/1, Puddapukur Road
CALCUTTA 20

PHONE : 47-2869

FOR
NEAT PRINTING
AND
QUICK SERVICE

Specialist in Colour Print

Please Contract :—

Mahamaya Press

2, Bhupendra Bose Ave., Cal-4

Phone : 55-9124

শ্রীঅরবিন্দ
জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

(আগষ্ট ১৫, ১৯৭২)

সম্পূর্ণ রচনাবলী

ইংরাজীতে : ৩০ খণ্ডে সম্পূর্ণ
সুশোভন রাজ সংস্করণ—১০০০৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)
সুলভ সংস্করণ—৭৫০৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)

বাংলায় শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলায় রচিত (গীতার ভূমিকা, ধর্ম ও জাতীয়তা, কারাকাহিনী, পত্রাবলী, বিবিধ রচনাদি) দুর্লভ খণ্ড সহ অন্যান্য রচনার নয় খণ্ডে অনুবাদ। ১৬৲ টাকা

আঞ্চলিক ভাষা
হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী, ওড়িয়াতেও অনুবাদ

13 JUL 1973

বুক সেলস্ ডিপার্টমেন্ট, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

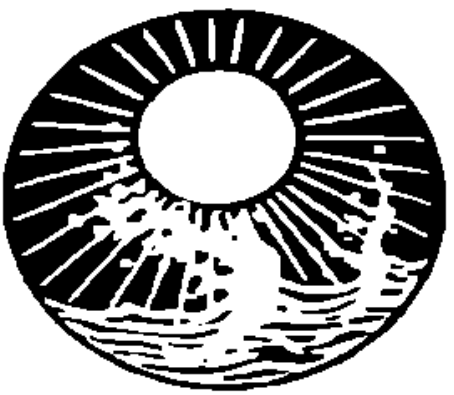

CALCUTTA
UNIVERSITY

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৫

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্ত্তিকা

(২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৩)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

মধুময়ী মা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
সাবিত্রী	...
বেদমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী	...
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা
কঠিন ডানায় ওড়া	বীরবাহু

বর্ত্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: **Nolini Kanta Gupta**
Published by: Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by: Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

12 2. 69.

Be more eager
for truth than for
success.

Blessings

মধুময়ী মা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

(১০)

"একটি দিন আরও"

মা তাঁর ধ্যান ও প্রার্থনায় (Prières et Méditations) ১৯১৪ সালে ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখের দৈনন্দিন লিপিতে লিখেছেন :

"নূতন এক জ্যোতি পৃথিবীর উপরে ফুটে উঠবে,
নূতন এক জগৎ জন্মগ্রহণ করবে,
যা কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে
সবই পরিপূর্ণ হবে।" *

পরে, বেশ কিছু পরে, চল্লিশ বৎসর পার হয়ে গেলে, ১৯৫৬ সালে (২৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৯শে মার্চ তারিখে) এই ঘোষণাটির মধ্যে তিনি একটা পরিবর্তন এনে দিলেন, তিনি লিখলেন :

"নূতন জ্যোতি এক পৃথিবীর উপর ফুটে উঠেছে,
নূতন জগৎ এক জন্মগ্রহণ করেছে,
যা কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল,
তা পরিপূর্ণ হ'ল।" †

ভবিষ্যৎকালের পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করলেন বর্তমান কাল। এই পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছিল কারণ সৃষ্টির ধারায় পৃথিবীর অবস্থা-ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই একটা আমূল পরিবর্তন

---

* A new light will break upon the earth,
A new world will be born,
And the things promised will be fulfilled.
* * *
Une lumière nouvelle poindra sur la terre.
Un monde nouveau naîtra,
Et les choses promises seront accomplies.

† A new light breaks upon the earth,
A new world is born,
The things that were promised are fulfilled.
* * *
Une lumière nouvelle poind sur la terre.
Un monde nouveau est né,
Et les choses promises sont accomplies.

দেখা গিয়েছে। মা নিজেই এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর আর একটি বাণীতে; তা তিনি প্রকাশ করেছিলেন মাসখানেক পরে ১৯৫৬ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে। মা বললেন,

"পৃথিবীর উপরে অতিমানসের আবির্ভাব আর প্রতিশ্রুতি মাত্র নয় তা হ'ল জীবন্ত ঘটনা, বাস্তব সত্য।

"তা কাজ করে চলেছে এখানে, একদিন আসবে যখন যারা অতি অন্ধ অতি অচেতন, এমন কি একান্ত অনিচ্ছুক তারাও বাধ্য হবে একে স্বীকার করতে।" *

মা পুন:পুন: বলছেন তাঁর এই সত্যদৃষ্টির কথা এবং দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,

"এই যে নূতন জগৎ তা জন্মেছে, জন্মেছে, জন্মেছে"—তিন সত্য যেন। সে রয়েছে নেপথ্যে কিন্তু চলছে ফিরছে সকল বাধাবিঘ্নের আবরণ ভেদ করে অদম্য অজেয় বেগে। অজ্ঞানের কোন বাহ্য ভারই তাকে নিত্যকাল দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

আমরা এগিয়ে চলেছি। মা আবার ঘোষণা করলেন ১৯৫৮ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে অর্থাৎ প্রায় দুবৎসর পরে—অসামান্য অপূর্ব্ব এক ঘোষণা। পৃথিবীর কূলে এসে উপস্থিত হয়েছে পরিপূর্ণ আকারে অতিমানস জাহাজ এক। এর কাজ হ'ল পৃথিবীতে যেসব মানুষ তৈরী হয়েছে অতিমানস জীবনের জন্য তাদের তুলে নেওয়া। দৃশ্যের বিবরণ এত সুন্দর এত পরিস্ফুট, এত চিত্তাকর্ষক ছিল যে বাহির থেকে একটি অল্পবয়সী মেয়ে তা পাঠ করে মাকে লিখল যে সে ঐ জাহাজের যাত্রী হ'তে উৎসুক এবং মায়ের কাছে সেজন্য অনুমতি চায়। মা আরও বুঝিয়ে বলেছেন, এই নূতন জগৎটি যে উপাদানে গঠিত তা হ'ল অতিমানস অর্থাৎ যে বস্তু স্থূল জগতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে, অতিমানস বস্তুর সর্ব্ব-প্রথম প্রকাশ জড়স্তরে।

আরও একবার তাঁর দৃষ্ট সত্যের সত্যতা মা পুনরুক্তি করেছেন তাঁর সন্তানদের কাছে ১৯৬১ সালে নববর্ষের বাণী দিয়ে—

—"এই যে অপরূপ আনন্দময় জগৎ আমাদের দুয়ারে এসে, আমাদের আহ্বানের অপেক্ষায় রয়েছে পৃথিবীতে নেমে আসবে বলে।" †

বলা বাহুল্য এখানেই শেষ নয়, অন্তিম পরিণতি এও নয়। আর এক পা' এগিয়ে

---

* The manifestation of the Supramental upon earth is no more a promise, but a living fact, a reality.

It is at work here and one day will come when the most blind, the most unconscious, even the most unwilling shall be obliged to recognise it."

* * *

La manifestation du Supramental sur la terre n'est plus seulement une promesse, mais un fait vivant, une realité.

Il est à l'œuvre maintenant, ici-bas, et un jour viendra où le plus aveugle, le plus inconscient, même le plus volontairement ignorant sera obligé de le reconnaître.

† This wonderful world of delight waiting at our gates for our call, to come down upon earth.

* * *

Ce monde merveilleux de félicité, à nos portes, qui attend notre appel pour descendre sur la terre.

যেতে হবে—জড়তম জড় স্পর্শ করতে হবে, নূতন করে গড়তে হবে এর অর্থ একটা ছেদ, যতি বা বিরতি, কালক্ষেপ কিছু। সৃষ্টির ধারা এই ক্রম অনুসরণ করে : যে জিনিসটি সৃষ্টি করতে হবে পৃথিবীর উপরে, দেহের মধ্যে ধরে দিতে হবে তা প্রথমে তৈরী হয় একটা সূক্ষ্মজগতে। যখন তা প্রস্তুত, সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত সেই জগতে, তখন সে নেমে আসে জড়জগতে ধীরে হোক, ক্রমে হোক, অকস্মাৎ হোক, বিশ্ববিধাতার ইচ্ছা অনুসারে। কথাটি বুঝিয়ে বলবার জন্য একটা উদাহরণ, মা নিজেই দিয়েছেন। একসময়ে যাকে জিজ্ঞাসা করা হয় ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে—১৯১৫ সাল হবে, যখন ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ দাসত্বের অটুট শৃঙ্খলে যেন মা উত্তর দিলেন কিছুমাত্র দ্বিধা না করে : "ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে।" তিনি বললেন না, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, বললেন শুধু "ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে", ঘটনাটি যেন সে সময়ে বাস্তব ঘটনা। কিন্তু বাস্তব ঘটনাটি হয়েছিল ১৯৪৭ সালে অর্থাৎ সূক্ষ্মজগতে ঘটবার ৩২ বৎসর পরে। মায়ের মন্তব্য হয়েছিল—এতে দেখিয়ে দেয় বাহ্য অভিব্যক্তির পক্ষে, স্থূলসিদ্ধির পক্ষে বাধা রয়েছে কতখানি।

শুধু সৃষ্টি নয়, ধ্বংসও ঘটে ঠিক একই ধারায়। ধ্বংস প্রথমে ঘটে সূক্ষ্মজগতে, তার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে স্থূলে ঘটে ধ্বংস। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন অর্জুনকে, "এই যে সব সৈন্য-সামন্ত তোমার বিরুদ্ধে ব্যূহবদ্ধ তারা সব ইতিমধ্যে নিহত হয়েছে আমার হাতে, তুমি শুধু হবে এখন নিমিত্তমাত্র"—ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব।

* * *

সাবিত্রী ফিরে চলেছে পৃথিবীতে তার সাধারণ স্বাভাবিক জীবনে, শেষ বিজয় তার সম্পন্ন হয়েছে। এই পূর্ণ বিজয়ের নবজীবন, মূর্ত দিব্যজীবন অন্তরে ধারণ করে পার্থিব জীবনে সে প্রবেশ করল তবে আপনার চারিদিকে, আপনার সিদ্ধির চারিদিকে একটা যবনিকা টেনে নিয়ে। "আরও একদিনের" কাজ রয়ে গিয়েছে জড়তম জড়ের "আরও একদিন"। আপনাকে সে পূর্ণ প্রকাশ করে ধরবে না যতদিন সে "একদিনের কাজ" শেষ না হয়েছে। যবনিকা টেনে দেওয়া হ'ল বটে কিন্তু তার পিছনে রয়েছে তাঁর তৈরী সমস্ত প্রাসাদটি তার পূর্ণ অক্ষত সৌন্দর্য্য এবং সার্থকতা নিয়ে। আজ আমরা বাহ্যতঃ দেখছি বটে আমাদের সম্মুখে একটা ধূসর বিপদাকীর্ণ জগৎ, যেমন আছে রয়েছে চিরদিন, কিন্তু যবনিকা একদিন উঠে যাবেই, ব্যক্ত করে ধরবে যে জিনিষটি সে ঢেকে রয়েছে, অতি ধীরে হতে পারে, অথবা হতে পারে একটা ডিম্বকোষের মত তা ফেটে পড়তে পারে এবং তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে পরিপূর্ণ নবজীবন এক...কি রকমে হবে তা, এই উন্মা-দনা, এই মহা অভিব্যক্তি? ভবিষ্যৎ ঘটনা তা দেখাবে। ইতিমধ্যে এই নবসৃষ্টিকে, এই বৃহত্তর উষাকে মা ধারণ করে রয়েছেন তাঁর অন্তরে, সযত্নে তাকে ঘিরে রেখেছেন তাঁর অপরূপ জ্যোতির্ময় অঙ্কের মধ্যে।

সাবিত্রী

২য় পর্ব—১১শ সর্গ

(বৃহত্তর মনোময় লোক এবং তাদের দেবতাবৃন্দ)

(১)

শ্রমরত মহাশক্তির এখানেই হল শেষ সীমান্ত।
তবে সত্তার ও সৃষ্টির শেষ নয় এখানেই।
মনীষা সেখানে অতিক্রম করে যায় মর্ত্য মানসের চক্রাবর্ত,
আপন পার্থিব যন্ত্রের অপেক্ষা মহত্তর সে
মানসের সঙ্কীর্ণ অবকাশে নিষ্পিষ্ট যে দেবতা
ফেটে বের হয়ে যায় চারিদিকে বৃহৎ প্রসারের মধ্যে
অনন্তের অভিমুখে পথ ধরে।
চিরন্তন চলেছে সে চিন্ময়ের আপন ক্ষেত্রে,
ধেয়ে চলেছে সুদূর অধ্যাত্মজ্যোতির অভিমুখে,
শিশুসন্তান সে, সেবক সে চিন্ময়শক্তির।
তবে মনও ফিরে আসে বিমুখ হয়ে অনাদি এক শিখর হতে।
সত্তা তার চলে যায় চিন্তার দৃষ্টিকে অতিক্রম করে।
চিন্ময়পুরুষ চিরন্তন জন্মহীন,
মহত্ত্ব তার চিন্তার সৃষ্টি নয়,
চিন্তার সহায়ে জ্ঞান তার দেখা দেয় না।
আপনাকে জানে সে, আপনার মধ্যেই জীবন তার,
চলেছে সে নাই যেখানে কোন চিন্তা, নাই কোন রূপ।
পদভার তার স্থির সান্ত জিনিসের 'পরে,
পাখা মেলে দুঃসাহসে অনন্তকে চলে অতিক্রম করে।
দৃষ্টিপথে আসে তার বিচিত্র আকাশ এক,
পদযুগল তার লভে আবরণ মহান্ অপরূপ সব সাক্ষাৎকারের তরে;
সত্যচিন্তা সেখানে ভর করে আছে চিন্তার অতীত এক সত্যদৃষ্টির উপরে,
গড়ে তোলে জগৎ এক অচিন্ত্যের আশ্রয়ে।
তুঙ্গশিখরের 'পরে কল্পনা যেখানে পথ পায় না,
অশ্রান্ত দৃষ্টিশক্তির চক্রবালপ্রান্তে,
শাশ্বতের সুনীল আবরণতলে
দেখা যায় আদর্শ মানসের ঐশ্বর্য যত

প্রসারিত রয়েছে পরিচিত বস্তুর সীমানা অতিক্রম করে।
স্বল্প যে আমরা, উৎস সে তার,
বহন করে সে অন্তহীন আরও যা কিছু আমরা হয়ে উঠব,
মানুষী সামর্থ্য যা কিছু সম্পাদন করে অবলম্বন তার,
পৃথিবীর অলব্ধ যত কিছু আশা, সৃষ্টা তার,
ক্রম-প্রসারিত বিশ্বের সীমানা পার হয়ে প্রসারিত সে :
পার হয়ে স্বপ্নের সীমানা যত উড়ে চলে সে,
এই জীবনের তুঙ্গতম শিখরের উর্ধ্বে উঠে গিয়েছে।
জাগ্রত সে জ্যোতির্ময় মণ্ডলে ঘিরে রাখে নাই যারে চিন্তাবৃত্তি,
উন্মুক্ত সে সর্বজ্ঞাননয় যত বৃহৎ প্রসারের ভূমিতে,
আমাদের জগতের পরে ছড়িয়ে দেয় সে তার মহত্তম উর্ধ্বতন প্রভাব যত,
তূর্ণগতি তার মুহূর্তের অলস পদক্ষেপ পশ্চাতে ফেলে চলে যায়,
বীর্য তার সর্বজয়ী পদক্ষেপে চলে যায় কালধারা পার হয়ে
আর সেই মহাবল যত তুলে ধরে সেতুবদ্ধ মানুষের আর ভগবানের মাঝে
আর সেই জ্যোতির্লেখা যত যুদ্ধ করে চলে যারা অজ্ঞানের আর মৃত্যুর সঙ্গে।
মহামানসের বিপুল প্রসারে
সৌন্দর্য ও শক্তি যেখানে চলে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে,
চিন্ময় সত্য সব সেখানে গ্রহণ করে জীবন্ত দেবতার রূপ,
প্রত্যেকেই গড়ে তুলতে পারে জগৎ এক আপন স্বাধিকারে।
আকাশে বাতাসে সেখানে সংশয় ও ভ্রান্তি রেখে যায় না কোন কলুষ রেখা
রেখে যায় না তাদের বিকৃতির কলঙ্ক,
সংযুক্ত রয়েছে সে অন্তরঙ্গ ধ্যানে
সেই সত্যের সঙ্গে দেখে যে অভ্রান্ত আলোকে
দৃষ্টি যার দ্বিধাহীন চিন্তা যার নয় পথহারা,
পৃথিবীর গুরুভার অশ্রু হতে মুক্ত সে,
স্বপ্ন দেখে সে জ্যোতির্ময় আপন সৃষ্টির,
চেয়ে দেখে মহান্ যত ভাবনায় পূর্ণ শাশ্বত।
আনন্দের সর্ব-কর্তৃত্বের সূর্য-প্রজ্বলনে
উর্ধ্বে সমাসীন আদর্শ-মানসের অধিপতিবৃন্দ
নিবিড় স্বস্তির পদবীতে,
জ্যোতির্ময় নিঃসংশয়ের রাজ্যে সব।
বহুদূরে সেসব রাজ্য আমাদের কর্মশ্রম আর আকাঙ্ক্ষা আর আহ্বান হতে,
পরাসিদ্ধির রাজ্য আর পূত মন্দির,
প্রবেশ করে না সেখানে মানবমনের অনিশ্চিত চিন্তারাজি,
সুদূরে তা মর্ত্যজীবনের মলিন স্রোতধারা হতে।
তবে আমাদের প্রচ্ছন্ন অন্তঃপুরুষ ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিজন তাদের,

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্ত্তিকা

অনন্ত দেবত্বের নিঃশ্বাস এক
এসে দেখা দেয় আমাদের মর্ত্যের ক্ষেত্র অসিদ্ধ এই পৃথিবীর 'পরে ;
সমুজ্জ্বল আকাশের সোনার হাস্য পার হয়ে
আলো এক এসে পড়ে আমাদের বিব্রত অতৃপ্ত জীবনের 'পরে।
চিন্তা এক নেমে আসে আদর্শ মানসলোক হতে,
অনুপ্রাণিত করে আমাদের এই এখানেই নূতন করে গড়ে তুলতে
তাদের মোহিনীশক্তির প্রতিবিম্ব কিছু
সেই অত্যাশ্চর্যের কিছু মানুষী আশার সীমাপারে।
দিনের পর দিন একই গুরুভার সরন্ধপতার মাঝে
মানুষী বিধান লঙ্ঘন করে রয়েছে
প্রত্যয় এক এমন জিনিসে সব এখন নাই যা কিন্তু হবে একদিন,
এই জগতেরই আনন্দে বেদনায় সঙ্গীতরূপে রয় যে
প্রচ্ছন্ন অন্তঃশক্তির নিষিদ্ধ বাসনার সন্ধান
জন্মেছে যে শাশ্বতের সঙ্গে তার প্রণয়ের ফলে।
আমাদের অন্তশ্চেতনা তার আবেষ্টন ভেঙ্গে দিয়ে মুক্ত হয়ে আসে :
ভবিষ্যৎ নিকটে নিয়ে আসে তার অদ্ভুতকর্মা আননখানি,
আগামী দেবতা চেয়ে রয় তার বর্তমান দৃষ্টি দিয়ে ;
যে কর্ম ছিল অসম্ভব হয়ে ওঠে তা স্বাভাবিক ;
অনুভব করি আমরা লাভ করেছি বীরপুরুষের অমরত্ব,
সাহস আর সামর্থ্যকে মৃত্যু স্পর্শ করে না,
জাগে তারা নর্ত্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, তনুর হৃদয়ে ;
আমরা চলে যাই এমন এষণার ক্ষিপ্র প্রেরণায়
তুচ্ছ করে যায় যে নশ্বর কালের বিলম্বিত পদক্ষেপ।
এইসব প্রেরণা আসে না কোন পরদেশী লোক হতে :
সেই দেশজননীর আমরাই নাগরিক-সন্তান
অভিযান করেছি দুঃসাহসে, উপনিবেশ স্থাপন করেছি এই জড়ত্বগুলের রাত্রিমাঝে।
কিন্তু বর্তমানে আমাদের অধিকার সব খণ্ডিত, অনুমতিপত্র সব মূল্যহারা ;
স্বেচ্ছায় নির্বাসিত আমরা এখন আমাদের স্বর্গীয় ভবন হতে।
অমর মানসের বিভ্রান্ত রশ্মিরেখা এক
গ্রহণ করেছে পৃথিবীর অন্ধতা, হয়ে উঠেছে
আমাদের মানুষী চিন্তা, অজ্ঞানের সেবক।
নির্বাসিত শ্রমিক এক এই অনিশ্চিত পৃথিবীর উপরে
অবরুদ্ধ সে প্রাণশক্তির নিশ্চেতন দৃঢ় আলিঙ্গনে, চালিত বশে তার,
তামস দেহকোষ আর প্রবঞ্চক স্নায়ুধারা ব্যাহত করে গতি তার,
স্বপ্নে শুধু দেখে সে সুখকর স্থিতি আর মহত্তর সামর্থ্যরাজি,
স্খলনমুক্ত দেবতাদের স্বভাবজ অধিকার

স্মৃতিমাঝে জাগে এখনও অতীতের হারান প্রভুষ।
পৃথিবীর এই কুয়াশা-কুহুঞ্ঝটিকা পঙ্ক আর শিলাখণ্ড
তারই মাঝে এখনও স্মরণ করে তার সনুন্নত ভুবন
সেই দেবপুরী যেখানে জ্যোতির্ময় জন্ম তার।
স্মৃতি এক লুকিয়ে চলে আসে সত্যের হারান স্বর্গ হতে,
অবাধ মুক্তি এক আসে নিকটে, আসে আহ্বান এক মহিমার,
মুখ বাড়িয়ে চেয়ে রয় শক্তি এক, প্রত্যাশী আনন্দ এক।
অর্ধ-অবগুণ্ঠিত আলোকে উদ্দীপিত পথে পথে
চলেছে নিয়ত, আপনি আপনার সমুজ্জ্বল ছায়া যেন,
অন্ধ দেবতাদের এই ত্রস্ত অনিশ্চিত নেতা,
ক্ষুদ্র দীপমালার সেবক এই, কর্মব্রতী দাস এই
মনের দেহের বেতনভুক পার্থিব ব্যবহার তরে
ভুলে যায় কর্ম তার রূঢ় বাস্তবের সংঘাতে।
পুনরায় গ্রহণ করে সে তার পরিত্যক্ত সম্রাট-অধিকার,
পরিধান করে পুনরায় তার চিন্তার রাজকীয় পরিচ্ছদ,
পুনরায় দেখে আপনারে মানস আদর্শের দ্রষ্টারূপে রাজারূপে,
অজাত সত্যের বাহন আর বাণীবহ,
আনন্দের অমরত্বের উত্তরাধিকারী।
সবই বাস্তব সেখানে যা কিছু এখানে স্বপ্ন শুধু,
আমাদের অজ্ঞাত গভীরে সুপ্ত রয় তাদের সত্যের ভাণ্ডার,
আমাদের অনধিগম্য শিখরে রাজত্ব তাদের, নেমে আসে তারা
আমাদের চিন্তায় ধ্যানে ছড়িয়ে তাদের আলোকের অঞ্চল।
কিন্তু আমাদের বালখিল্য সংকল্প আর অসার বাস্তববোধ
এই সব স্বর্গীয় অতিথিদের প্রবেশে দেয় বাধা
আদর্শ মানসের শিখরে অপেক্ষায় রয়েছে তারা
অথবা গোপনে রক্ষিত তারা আমাদের অদৃশ্য আন্তরসত্তার মাঝে
তবুও কখনও-বা ছড়িয়ে দেয় দীপ্তি তাদের জাগ্রত চেতনা পার হয়ে
আমাদের বাহ্যজীবনের অন্তরালে রয়েছে তাদের মহত্ব, সৌন্দর্য, শক্তিমত্তা।
এই বর্তমান আমাদের কখনো বা অনুভব করে তাদের স্পর্শমহিমা,
আমাদের ভবিষ্যতের প্রয়াস এগিয়ে চলতে তাদের জ্যোতির্ময় সিংহাসনের অভিমুখে :
তারা তাকিয়ে রয়েছে তাদের অধ্যক্ষ গুহাভ্যন্তর হতে,
অমর পদধ্বনি সব শোনা যায় মনের অলিন্দমাঝে :
আমাদের অন্তরাত্মা উঠে যেতে পারে প্রদীপ্ত লোকসকলে,
উদার প্রসার হতে নেমে আসে তারা, হতে পারে তা আমাদের আপন গৃহ।
অনাবৃত দৃষ্টির স্বাধিকার লাভ করেছে মনোময় পুরুষ,
প্রবেশ করেছে দেবতাদের নন্দনে

পান করে পুনরায় তার বিশুদ্ধ বিপুল উৎধারা হতে।
অটল ছন্দে বাঁধা প্রশান্তি ও পুলকে
দেখে সে, অবাধ মুক্তির সীমাহীন আলোকে,
অটুট লোকসব, মানসসৃষ্ট জগৎসব ;
সত্যজ্ঞান সেখানে কর্মের দিশারী,
জড়বস্তু গঠিত চিন্তা-উপাদানে
আর অনুভব—স্বর্গের বিহঙ্গ যেন স্বপ্নময় ডানায় ভর করে রয়েছে—
সত্যের আহ্বানে সাড়া দেয় জননীর কণ্ঠ শোনে যেন,
রূপ জ্যোতির্ময় আকারে ছুটে আসে রূপকার রশ্মি হতে,
ইচ্ছাবল দেবতাদের সচেতন রথ যেন,
আর প্রাণবল—ধ্যাননগ্ন মহাশক্তির প্রদীপ্ত প্রবাহ—
বয়ে নয় সে অলৌকিক যত সূর্যমণ্ডলের কণ্ঠ।
বহন করে সে পরমসুখ এক অধ্যেচ্চারিত সত্যের।
তার প্রবাহে চলে, আকাশের বক্ষ মধুময় করে,
হাস্য এক মহানন্দের অমর হৃদিতল হতে,
আর কালাতীতের অতুল পুলক,
অজ্ঞাতের বুকে মহাজ্ঞানের মৃদুল আলাপ,
অদৃশ্য অসীমের সকল প্রসার।
সুনীল আকাশের স্বচ্ছ উল্লাসে
শৃঙ্খলমুক্ত সর্বশক্তিমান মনোময় পুরুষ
আদর্শ ভাবের নীলপদ্মের ধ্যানে সমাহিত।
কালাতীত মহাসত্যের হিরণ্ময় তুঙ্গ-সূর্য এক
ঢেলে দিয়েছে শাশ্বতরশ্মির রহস্য
পার হয়ে নৈঃশব্দ্য এক স্পন্দিত জ্যোতির্ময় বাক্যে
অন্তহীন সাগরের পরে নব আবিষ্কার অভিমুখে।
সুদূরে দেখে সে দুটি গোলার্ধ সংযুক্ত হয়েছে
ধ্যাননগ্ন সমাহিতির ধারা বেয়ে
মননশক্তির বিপুল সোপানাবলী উঠে গিয়েছে উর্ধ্বে অজ্ঞাতশিখরে যত :
কালের শেষ সীমানা স্পর্শ করে সেখানে শাশ্বতের ব্যোমমণ্ডল,
প্রকৃতি কথা বলে চিন্ময় কৈবল্যের সঙ্গে।

বেদমন্ত্র

ঋষি অত্রির অগ্নিমন্ত্র

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৫ম মণ্ডল—বিংশ সূক্ত

যমগ্নে বাজসাতম ত্বং চিন্ মন্যসে রয়িম্।
তং নো গীর্ভিঃ শ্রবায্যং দেবত্রা পনয়া যুজম্ ॥১॥
যম্—যে
অগ্নে—হে অগ্নি
বাজসাতম—পরম-পূর্ণ তাজয়ী
ত্বম্—তুমি
চিৎ—নিশ্চয়
মন্যসে—মনের মধ্যে ধারণ কর
রয়িম্—আনন্দসম্পদ
তম্—তাকে
নঃ—আমাদের জন্য
গীঃ-ভি—গীর্ভিঃ—বাক্‌রাজি দিয়ে
শ্রবায্যম্—শ্রৌতজ্ঞানময়, অনুপ্রেরণাময়
দেবত্রা—দেবতাদের মধ্যে
পনয়—সক্রিয় করে তোল
যুজম্—সহযোগী হয়ে

হে অগ্নি, তুমি পরম পূর্ণ তাজয়ী, যে আনন্দধন তুমি তোমার মনে ধারণ কর, তাকে দিব্যবাক্‌সহায়ে শ্রৌতজ্ঞানে ভরে দাও, সহযোগী করে তাকে সক্রিয় করে তোল দেবতাদের মধ্যে ॥১॥

যে অগ্নে নেরয়ন্তি তে বৃক্ষা উগ্রস্য শবসঃ।
অপ দ্বেষো অপহ্বরোন্যব্রতস্য সশ্চিরে ॥২॥
যে—যারা
অগ্নে—হে অগ্নি
ন—না চলে
ঈরয়ন্তি—চলে
} চলে না, চালিত হয় না
তে—তারা

বৃক্তাঃ—বর্দ্ধিত হয়েছে
উগ্রস্য—তেজস্বীর, তেজবলের
শবসঃ—বলের সহায়ে
অপ—সরে গিয়েছে
দ্বেষঃ—বিরোধের দিকে
অপ—সরে গিয়েছে
দুরঃ—কুটিলতার দিকে
অনব্রতস্য—বিধর্মীর
সশ্চিরে—সঙ্গে যুক্ত হয়েছে

হে অগ্নি, তেজস্বী তোমার বলে সমৃদ্ধ হয়ে তারা চলে না ঋজুপথে, তারা সরে গিয়ে শত্রুতাকে ধরেছে, ধরেছে কুটিলতাকে, বিধর্মীর সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে ॥২॥

হোতারং ত্বা বৃণীমহোগ্নে দক্ষস্য সাধনম্।
যজ্ঞেষু পূর্ব্বং গিরা প্রয়স্বন্তো হবামহে ॥৩॥
হোতারম্—আহ্বানকারীকে
ত্বা—তোমাকে
বৃণীমহে—বরণ করি আমরা
অগ্নে—হে অগ্নি
দক্ষস্য—দিব্য বিচারণার
সাধনম্—সাধয়িতা তুমি
যজ্ঞেষু—সকল যজ্ঞের
পূর্ব্যম্—পুরোভাগে তুমি
গিরা—মন্ত্রের সহায়ে
প্রয়স্বন্তঃ—অর্ঘ্য অর্পণ করে আমরা
হবামহে—তোমাকে আহ্বান করি।

আহ্বায়ক তুমি, হে অগ্নি, তুমি দিব্য বিচারণা গড়ে তোল সকল যজ্ঞের তুমি প্রাচীন পুরোধা, মন্ত্রের সহায়ে অর্ঘ্য নিয়ে এসে তোমাকে আমরা আবাহন করি ॥৩॥

ইত্থা যথা ত উতয়ে সহসাবন্দিবেদিবে।
রায় ঋতায় সুক্রতো গোভিঃষ্যাম সধমাদো বীরৈঃ স্যাম সধমাদঃ ॥৪॥
ইত্থা—যথাযথভাবে
যথা—যেমন করে
তে—তোমার
উতয়ে—বৃদ্ধির জন্য
সহসাবন্—হে শক্তিময়
দিবেদিবে—প্রতি দিন, দিনে দিনে

রায়ে—আনন্দের মধ্যে
ঊতয়ে—সত্যের মধ্যে
সুক্রতো—হে সিদ্ধকর্মী, হে সত্যসঙ্কল্পী
গোভিঃ—সকল জ্যোতিসহ
স্যাম—হই যেন
সধমাদঃ—সহভোগী, সহ-আনন্দভোগী
বীরৈঃ—বীর্য্যদের সহ
স্যাম—হই যেন
সধমাদঃ—সহভোগী, সহ আনন্দভোগী

তুমি যথাযথভাবে তাই কর যাতে আমরা তোমার সমৃদ্ধির জন্য দিনে দিনে বলীয়ান্ হয়ে উঠি, আনন্দের মধ্যে সত্যকর্ম্মের মধ্যে আমরা, সকল জ্যোতির মধ্যে হয় আমাদের একই আনন্দভোগ, সকল বীর্যের মধ্যে হয় আমাদের একই আনন্দভোগ ॥৪॥

৫ম মণ্ডল—একবিংশ সূক্ত

মনুষ্বৎত্বা নি ধীমহি মনুষ্বৎ সমিধীমহি।
অগ্নে মনুষদঙ্গিরো দেবান্দেবয়তে যজ ॥১॥
মনুষ্বৎ—মানুষরূপে
ত্বা—তোমাকে
নি-ধীমহি—অন্তরে স্থাপন করি
মনুষ্বৎ—মানুষরূপে
সম্-ইধীমহি—সমিদ্ধ করি, প্রজ্বলিত করি
অগ্নে—হে অগ্নি
মনুষ্বৎ—মানুষরূপে
অঙ্গিরঃ—অঙ্গিরা, জ্বলন্ত শিখা
দেবান্—দেবতাদের উদ্দেশ্যে
দেবয়তে—দেবত্বকামীদের, দেবত্ব-অভিমুখীদের জন্য
যজ—যজ্ঞ সম্পাদন কর

মানুষরূপে তোমাকে অন্তরে স্থাপন করি, মানুষরূপে প্রজ্বলন্ত করি, হে অগ্নি, হে জ্বলন্ত শিখা, দেবত্বকামীদের জন্য দেবতাদের উদ্দেশ্য করে যজ্ঞসম্পাদন কর ॥১॥

২। ত্বং হি মানুষে জনেগ্নে সুপ্রীত ইধ্যসে।
সুচস্ত্বা যন্ত্যানুষক্ সুজাত সপিরাসুতে ॥২॥
ত্বম্—তুমি
হি—ই (তুমিই)

মানুষে—মানুষে, মানুষী
জনে—জনের মধ্যে
অগ্নে—হে অগ্নি
সুপ্রীতঃ—সুপ্রীত, সন্তুষ্ট
ইধ্যসে—প্রজ্বলিত হয়েছ
সুচঃ—চমসসব
ত্বা—তোমার দিকে
যন্তি—চলেছে
আনুষক্—নিরন্তর
সুজাতঃ—সুজাত, সুষ্ঠু জন্ম যার
সপিঃ আসুতে—হে ঘৃতধারাযুক্ত

তুমিই মানুষীজনমধ্যে, হে অগ্নি, সন্তুষ্টচিত্তে প্রজ্বলিত হয়েছ, আহুতিবহ চমস তাদের তোমারই দিকে চলেছে প্রতিনিয়ত, শোভন জন্ম তোমার, জ্যোতির ঘন ধারা তুমিই প্রবাহিত করে ধরেছ ॥২॥

ত্বাং বিশ্বে সজোষসো দেবাসো দূতমক্রত।
সপর্যন্তস্ত্বা কবে যজ্ঞেষু দেবমীড়তে ॥ ৩ ॥
ত্বাম্—তোমাকেই
বিশ্বে—যাবতীয়, সকল
সজোষসঃ—সংযুক্ত হয়ে, সমচিত্তে
দেবাসঃ—দেবতারা
দূতম্—দূত
অক্রত—করেছে
সপর্য্যন্তঃ—সেবকেরা, পরিচরবৃন্দ
ত্বা—তোমাকে
কবে—হে কবিদ্রষ্টা
যজ্ঞেষু—যজ্ঞের মধ্যে
দেবম্—দেবতারূপে
ঈড়তে—পূজা করে

যাবতীয় দেবতারা সমান প্রীতিভরে তোমাকেই দূত করেছে, তোমার পরিচর্য্যা করে যারা, হে দ্রষ্টা, তোমাকেই যজ্ঞসকলের দেবতারূপে পূজা করে ॥ ৩ ॥

দেবং বো দেবয়ায়াগ্নিমীড়ীত মর্ত্যঃ।
সমিদ্ধঃ শুক্র দীদিহ্যতস্য যোনিমাসদঃ সদস্য যোনিমাসদঃ ॥৪ ॥
দেবম্—দেবতা
বঃ—তোমাকে

দেবযজ্যায়া—দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞের জন্য
অগ্নিন্—অগ্নিকে
ঈড়ীত—পূজা করে যেন
মর্ত্যঃ—মর্ত্যজন
সমিদ্ধঃ—সমিদ্ধ, প্রজ্বলিত হয়ে
তনূ—তনু হয়ে
দীদিহি—দীপ্ত হও
ঋতস্য—সত্যকর্মের
যোনিন্—উৎস
আ-অসদঃ—উপবেশন কর
সদস্য—পরম শান্তির, আনন্দের
যোনিন্ আ-অসদঃ—উৎসে উপবেশন কর

দেবতাকে, অগ্নিকে, তোমাকেই যেন মর্ত্যজীব পূজা করে দেবগুণ সাধনের জন্য প্রজ্বলিত হয়ে শুভ্রবর্ণে তুমি দীপ্ত হও, সত্যকর্মের উৎসস্থানে আসন গ্রহণ কর, আসন গ্রহণ কর পরমশান্তির উৎসে ॥৪॥

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

(মাঝে মাঝে মায়ের ব্যাখ্যা সহ)

৪২৫—ভগবৎ প্রেমের যে বিমল আনন্দ তার মাধুর্য আরো বেশি বাড়ে মানুষদের মধ্যে ভগবানকে ভালোবাসলে ; সে আনন্দ বহুধা হয়ে আরো প্রসার পায়।

৪২৬—একদারা হওয়া দেহস্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, কিন্তু বহুদারা হওয়ার যে সীমাহীন আনন্দ তা পাবে সেই আত্মা, যে সকল মানুষের মধ্যে ভগবানকে ভালোবাসতে পারবে ; অথচ সেখানে পরম রহস্যের কথা এই যে সকলের মধ্যেও সে একজনকেই ভালোবাসবে।

৪২৭—সমগ্র দুনিয়া আমার অন্নময়কোষ, আর এখানকার যত কিছু জীব এবং অজীব তারা সকলেই আমাকে আনন্দ দেবার যন্ত্রস্বরূপ।

মা ভগবানে ভালোবাসা যে-কেউ অনুভব করে, সে তা ছাড়া অপরকে তেমন ভালোবাসতে না পেরে অন্য যারই উপর তার স্নেহ প্রীতি থাকুক তার মধ্যেও সে কেবল ভগবানকেই ভালোবাসবে। আর তাই হলো সব চেয়ে সেরা জিনিস, কারণ তার মধ্যেও যে ভগবান আছেন এই চেতনাটি তার মধ্যেও প্রকট হবে। ২৭-৩-১৯৭০

৪২৮—আমি কৃষ্ণকে বেশি ভালোবাসি না কালীকে, এটা কিছুকাল পর্যন্ত জানতাম না ; কালীকে ভালোবেসে তখন দেখতাম যে আমি তাতে নিজেকেই ভালোবাসছি, আর কৃষ্ণকে ভালোবেসে দেখতাম যে অপর একজনকে ভালোবাসছি,—তথাপি তা নিজের দিকেই হচ্ছে। তাই শেষে কালীর চেয়ে ভালোবাসা কৃষ্ণের উপরেই বেশি হলো।

মা শ্রীঅরবিন্দের বলার ভঙ্গী চিরদিনই এমনি অসাধারণ ও নিজস্ব।

২৯-৩-১৯৭০

৪২৯—প্রকৃতিকে সনীহ ক'রে কিংবা তাকে শক্তিস্বরূপিণী বা জাগ্রতা দেবী রূপে অর্চনা ক'রে কি লাভ আছে? আর তাকে সৌন্দর্যকৌশলী বা নিপুণ কারুশিল্পী বলে বাহবা দিতে থাকলেই বা কি লাভ আছে? আসল কাজ হলো আপন আত্মার মধ্যে তাকে উপলব্ধি করা ও উপভোগ করা, দেহের দ্বারা নারীকে যেমনভাবে উপভোগ করা হয়।

৪৩০—হৃদয়ের ভিতরকার দৃষ্টি যখন খোলে, তখন তাবৎ সমস্ত কিছুতেই—প্রকৃতির মধ্যে যতকিছু, আর ভাবনা, ধারণা, কল্পনা, বিভিন্ন রকমের বস্তু ও বিভিন্ন রকমের আস্বাদ, বাইরের কাজকর্ম, সব কিছুই আবার অতি প্রিয় হয়ে দাঁড়ায়,—সবের মধ্যেই পাই প্রভূত আনন্দ।

মা এখানে আমার বলবার কিছু নেই। ৩০-৩-৭০

৪৩১—বিজ্ঞ দার্শনিক যারা জগৎকে মিথ্যা মায়া বলে বর্জন করে, তারা অবশ্য যথেষ্টই জ্ঞানী ও সাধু ও পবিত্রচেতা, কিন্তু আমি মাঝে মাঝে বলে করি যে তারা খানিকটা বোকাও নিশ্চয়, তাই ভগবান অনায়াসে তাদের ঠকাতে পারছেন।

৪৩২—নিজের মতে আমি এই কথা বলি যে জগতের বাইরে ছাড়া এর মধ্যেও ভগবানের নিজেকে উপস্থিত রাখতে হবে। সে দায়িত্বটা যদি না রাখতে চান তাহলে এমন জগৎটাকে তিনি রচনাই বা করলেন কেন?

৪৩৩—ব্যক্তিগত ভগবান আমাদের স্বপ্ন মাত্র বলে উড়িয়ে দিয়ে মায়াবাদীরা নির্ব্যক্তিক ভগবানের ধ্যান করে; আবার বৌদ্ধেরা তাকেও আজগুবি কথা বলে কেবল নির্বাণ ও শূন্য ধ্যানের মধ্যে আনন্দ খোঁজে। এমনি ভাবে প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বপ্নটিকেই একমাত্র সত্য বলে ঘোষণা ক'রে অন্যের গুলির নিন্দা করে। কিন্তু আত্মা প্রকৃত তৃপ্তি পায় কেবল আসল সদ্‌বস্তুর চিন্তাতে।

৪৩৪—ব্যক্তি ভগবানকে ছাপিয়ে মায়াবাদী দেখে এক অব্যক্তের অস্তিত্ব; আমি তাকে অনুসরণ ক'রে দেখি যে সেই অব্যক্তের আড়ালে আবার কৃষ্ণই রয়েছেন।

মা: শ্রীঅরবিন্দের এই সব আশ্চর্যভাবে কথা বলার ধরনের ভিতর দিয়ে তিনি নির্দেশ করছেন যে মূঢ় মানুষরা কেমন ক'রে কেবল নিজের আবিষ্কার ও নিজের অনুভূতিটিকে ছাড়া অন্য সকলের পাওয়া জিনিসকে অস্বীকার করতে থাকে। কিন্তু যেখানে সকল তত্ত্ব ও সকল বিরুদ্ধ মতকেই মানা হয়, সেখানেই প্রকৃত প্রজ্ঞার কাজ শুরু হয়।

১-৪-১৯৭০

৪৩৫—কৃষ্ণকে যখন প্রথম দেখলাম তখন পরম বন্ধু ও খেলার সাথী বলেই তাঁকে ভালোবেসেছিলাম, কিন্তু আমাকে তিনি ছলনা করলেন; তাতে আমার রাগ হয়ে গেল, আমি তাঁকে ক্ষমা করলাম না। অতঃপর তাঁকে ভালোবাসতে পারলাম প্রেমিকের মতো, তাতেও তিনি ছলনা করলেন; যদিও তাতে আরো বেশি রাগ হয়ে গেল, কিন্তু এবার তাঁকে ক্ষমা করলাম।

৪৩৬—আমাকে তিনি চটিয়ে দিয়ে ক্ষমা করতে বাধ্যই করলেন, কিন্তু সেটা আপসে মিটিয়ে নিয়ে নয়, আরো বেশি দোষ করে।

৪৩৭—যতদিন পর্যন্ত ভগবান চেষ্টা করছিলেন আমার প্রতি তাঁর অপরাধগুলোকে শুধরে নিতে, ততদিন পর্যন্ত মাঝে মাঝে ঝগড়া হয়ে যাচ্ছিল; যখন তিনি তাঁর ভুল বুঝলেন তখন ঝগড়াটা থামল, কারণ তখন তো আমার নিজেকে পুরোপুরি ভাবেই দিয়ে ফেলতে হলো।

৪৩৮—যখন আমি নিজেকে আর কৃষ্ণকে জগতের সব কিছু থেকে বাদ রেখে আলাদা ক'রে দেখতাম, তখন আমাদের দুজনের এই সম্পর্কের কথা সকলের কাছে গোপন করেই রাখতাম, কিন্তু তার পরে যখন থেকে তাঁকে ও আমাকে সর্বত্র সব কিছুর মধ্যেই দেখছি তখন থেকে হয়ে গেছি বেহায়া ও বাচাল।

মা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এই সব লেখার মধ্যে তাঁর অনুভূতির আশ্চর্য কথাগুলি অতি সাধারণ প্রাকৃত কথার ছাঁদে বোঝাতে চেয়েছেন, যেন সেগুলি খুবই সাদাসিধে ও সহজ জিনিস, এমনি ভাবে বলা তাঁর খুব প্রিয় ছিল।*

---

* অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচার্য

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

২১ এপ্রিল ১৯৫৪

মা : "Elements of Yoga" থেকে পড়া শুরু ক'রে শ্রোতাকে বললেন তুমি কিছু প্রশ্ন করেছিলে। এখন আবার প্রশ্নের উপর প্রশ্ন আছে। তাই কি ?

প্রশ্ন : মা, ঐ বইতে লেখা রয়েছে—"আমাদের যোগের লক্ষ্য হলো নিজের দেহ-চেতনাতে এবং অতিমানসের স্তরে ভগবানের সঙ্গে মিলন।" তাহলে দেহচেতনার পক্ষে ঐরূপ ভগবৎ মিলনের পরেই কি আসবে রূপান্তর ?

মা হাঁ, কিন্তু "পরেই" মানে তখনই নয়, তাতে সময় লাগবে। কেবল যদি দেহ-চেতনার মধ্যে ভগবানের অবতরণ ঘটে—কিংবা আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে দেহচেতনার যদি পুরো গ্রহিষ্ণুতা আসে—তখন রূপান্তরের কাজ রীতিমতভাবে হতে থাকবে। সেটা বাজিকরের কাঠি ছোঁয়ানো ম্যাজিকের মতো হয় না। কিছু সময় লাগে, আর ক্রমে ক্রমে তা আসে।

প্রশ্ন : কিন্তু দেহচেতনার ঐরূপ মিলনের ফলে নিশ্চয়ই তা হবে তো ?

মা এ কথার জবাব পরে বলব।

প্রশ্ন : অর্থাৎ সেটাই যখন চরম বা শেষ লক্ষ্য—কিন্তু তাতে রূপান্তর যদি না হয় ?

মা না, ওকে আমরা ঐভাবে শেষ লক্ষ্য বলব না। তবে রূপান্তর ক্রমশ এগে যাবে আপনা হতেই। অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে সামগ্রিক রূপান্তর বা পূর্ণাঙ্গ পাকা পরিণতির দিক থেকে কতদূর পর্যন্ত হলো তাই নিয়ে কথা, তার মানে এই রূপান্তরের অনেক স্তর বা ধাপ আছে। কিন্তু আমরা "রূপান্তর" কথাটা প্রায় ব্যবহার করি অনেকটা অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট ভাবে ; অর্থাৎ মনে করি যে রূপান্তর মানেই তখনই একেবারে সমস্ত কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে, মোটামুটি যা কিছু বাধাবিঘ্ন সব দূর হবে ; সব রোগপীড়া সেরে যাবে ; সব দৈহিক অপূর্ণতা এককালে ঘুচে যাবে। কিন্তু এগুলো অস্পষ্ট ধারণাই মাত্র।

এটা বিশেষ ক'রে মনে রাখা দরকার যে প্রকৃত সাফল্য আসবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দেহচেতনা সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ক'রে কিছুই জানতে পারে না। যখন তার স্পষ্ট নির্দেশ পাবে তখন জানবে প্রথমে যে কেমন ভাবে তা হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ কোন কোন রকম ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে আসছে একটা সামগ্রিক রূপান্তরের প্রকাশ ? তার কোন ধাপের পরে কোন ধাপটি আসবে ? গোড়াতে কি হবে ? তার পরে কি হবে ? এমনি বিশদ ক'রে সুনির্দিষ্ট আভাস যখন মিলবে তখন জানবে যে এবার তোমার সাফল্য আসন্ন।

তেমন দৃষ্টি মিলতে পারে সামগ্রিক ভাবেই। যেমন, আগে আসবে দেহচেতনারই মধ্যে একটা রূপান্তরের ক্রিয়া, তারপর একে একে তোমার দেহযন্ত্রগুলির ক্রিয়ার উপর নিজের

কর্তৃত্ব ও দখল, তখন আসবে ক্রিয়াগুলিরও রূপান্তর (এখানেও সেই অস্পষ্ট ধারণা)— অর্থাৎ কোনো পরিবর্তন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তাঁর শেষকালের একটি লেখাতে ("The Supramental Manifestation") যাতে তিনি বলেছেন যে দেহযন্ত্রগুলিরও রূপান্তর ঘটবে তাদের ক্রিয়াশক্তিগুলির একটা (বিভিন্ন ক্রিয়াগুলিকে নিয়ে) কেন্দ্রীকরণের দ্বারা, কাজেই তাদের এখনকার মতো ক্রিয়ার রীতি পাল্টে যাবে—যদিও আমার ছেলেরা, তা অনেক দূরের কথা বলেই জেনে রেখো...তার কোনো অভিসন্ধি এখন খুঁজে পাবেনা। যেমন, ধরো আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রের কথা, তার এখনকার মতো পাম্প ক'রে সারা দেহে রক্ত চালনার কাজটা তখন বদলে গিয়ে অন্যরকম কি ভাবে তা হতে পারবে? ফুসফুসের সর্বক্ষণের ক্রিয়া কি ভাবেই বা অন্য কোনো কেন্দ্রীভূত শক্তিতে হতে পারবে? এই সমস্ত হলো অনেক পরের কথা। কিন্তু এখন তা জানা সম্ভব নয়, কেবল অস্পষ্ট ধারণামাত্রই আসতে পারে। কিন্তু...

দেহের পক্ষে তার কিছু জানবার জন্য আগে তার নিজের মধ্যে জিনিসটা হওয়া দরকার। এর একটা এখনকারই দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি। তোমরা বিশেষ কোনো জিম্‌ন্যাষ্টিকের কসরৎ নিজে না করা পর্যন্ত জানতে পারোনা যে কেমনভাবে সেটা হতে পারে। যখন নিজে করতে পারো কেবল তখনই জানতে পারো যে কিভাবে তা হলো, তার আগে নয়। করতে পারার সঙ্গে জানতে পারাও আসে। সব জিনিসেই তাই, রূপান্তরের বেলাতেও তাই। আরো কয়েক বছর পার হলে তখন বলতে পারবো কেমন ভাবে কি হতে পারে, এখন এই পর্যন্ত বলতে পারি যে তার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এর পরের ২৪ এপ্রিল তারিখের বুলেটিনটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখো, তাতে বুঝবে এই কথা। পরে তোমাদের বলবো তার কি অর্থ। এই পর্যন্ত।

আর কোনো প্রশ্ন আছে?

প্রশ্ন পরে মানে কখন? কখন তা বোঝাবেন?
মা কখন? তা জানিনা গো ছেলে!!

প্রশ্ন মা, একটা বুঝতে পারিনি, "সাধনাতে সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা"।
মা : সক্রিয় আর নিষ্ক্রিয় কাকে বলে তা জানোনা? এ দুটি কথার মানে জানো তো?

প্রশ্ন : হাঁ। জানি।
মা : জানো? যখন বলো আমি সক্রিয়, তখন তার অর্থ কি?

প্রশ্ন : অর্থাৎ যখন আমি কিছু কাজ করি।
মা কাজ করো? বেশ। আর নিষ্ক্রিয় হও যখন বুঝি ঘুমোও? (হাস্য)

প্রশ্ন : নিষ্ক্রিয় যখন আমি আলস্যে থাকি, কিছু করতে পারিনা।
মা : তা ঠিক নয় গো ছেলে, নিষ্ক্রিয় হওয়া মানে ঐরকম অকর্মা হওয়া নয়। যখন

তুমি নিজের ভিতর থেকে কোনো শক্তিকে প্রয়োগ করো, যখন তা বাইরে বেরিয়ে যাবে, —হয়তো কোনো কর্ম বা চিন্তা বা অনুভব করা পর্যন্ত—যখন তা অন্য কারো দিকে কিংবা বাহ্য জগতে বেরিয়ে আসে, তখন তুমি হও সক্রিয়। আর নিষ্ক্রিয় হও যখন তুমি নিজের মধ্যে নিজে চুপচাপ নিশ্চল হয়ে অক্রিয় আছো কেবল নিজেকে খুলে দিয়ে, কেবল বাইরের থেকে কিছু এলে তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করো। তখন বাহ্য ভাবে তুমি স্থির হয়ে রয়েছ কিংবা নড়াচড়া করছ, তা নিয়ে কিছু যায় আসেনা। অর্থাৎ সক্রিয় হওয়া মানে চেতনাকে বা শক্তিকে বা কোনোরূপ স্পন্দনকে ভিতরদিক থেকে বাইরে প্রক্ষেপ করা। আর নিষ্ক্রিয় হওয়া মানে ভিতরে অনড় অটল থেকে বাহির থেকে যা আসছে তাকে গ্রহণ করা। এখানে তাই লেখা হয়েছে (বইএর পাতা খুলে) "সক্রিয় আত্মদান" তার মানে তোমার আত্মদানটি বেরিয়ে যাচ্ছে ভগবানের উদ্দেশে (তোমার তপস্যার দ্বারা), আর সেই সঙ্গে তোমার সাধনার বিরুদ্ধ সকল শক্তিকে তুমি প্রত্যাখ্যান করছ। এই দুটি হলো সক্রিয়তার কাজ।

কিন্তু এখন, যদি তুমি প্রকৃতই কোনো প্রেরণা লাভ করতে, কোনো আভ্যন্তরীণ নির্দেশ বা পথের দিশা পেতে চাও, এমন কিছু শক্তি পেতে চাও যা তোমাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে,—তাহলে তখন তুমি একদম সকল ক্রিয়াস্পন্দন থামিয়ে দেবে (দৈহিক বলছিনা), অর্থাৎ তোমার ভিতর থেকে বাইরে কিছু প্রক্ষিপ্ত বা স্পন্দিত হতে না দিয়ে স্থির নিস্তরঙ্গ নীরব হয়ে থাকবে,—নিজেকে যতটা সম্ভব উদার উন্মুক্ত ক'রে রেখে, আর যে শক্তি ভিতরে গ্রহণ করতে চাইছ তার জন্য অপেক্ষা ক'রে। এই হলো আসল নিষ্ক্রিয়তার কাজ। এতে বহির্গামী সকল চাঞ্চল্যকে স্তব্ধ ক'রে শান্তভাবে সুস্থির থেকে নিজেকে এমনভাবে খুলে দেবে যাতে সমস্ত ছিদ্রগুলি পর্যন্ত খোলা হয়ে থাকে, তখন উচ্চশক্তি তোমার মধ্যে নেমে এসে তোমার চেতনার ও কর্মের যথোচিত রূপান্তর আনতে পারবে।

এই নিষ্ক্রিয়তার ফলে আসবে তোমার মধ্যে সেই গ্রহণযোগ্যতা।

প্রশ্ন কিন্তু মা, ঐরূপ নিষ্ক্রিয় হতে গেলে তাতেও তো প্রয়াস করা চাই, তাই নয় কি?

না তার কোনো মানে নেই, সেটা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের উপরে।

প্রয়াস করা? হাঁ, তাই অবশ্য ইচ্ছা করা চাই। ইচ্ছা করাও কি প্রয়াস? অবশ্য তার জন্য চিন্তা করতে হবে, তা চাইতে হবে। কিন্তু সে তো একসঙ্গেই হবে, নয় কি?

একটা সময় আসে যখন আত্মদান এবং নিষ্ক্রিয়তা দুই রকম জিনিসই—পরে পরে হওয়া নয় কিন্তু এককালেই হতে পারে। একই সঙ্গে ইচ্ছার দ্বারা উপরকে তুমি আহ্বান করো, আর নিজেকে খুলে রেখে গ্রহিষ্ণু হয়ে থাকো,—অর্থাৎ উপরের শক্তিকে যখন তোমার মধ্যে নেমে আসতে ডাকছো, সেই সঙ্গেই সম্পূর্ণ স্থির থেকে তার প্রবেশের জন্য নিজেকে খুলে ধরছো, কারণ ঐভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে নিজেকে খুলে ধরলেই তা সেখানে এসে ঢুকতে পারবে, আর তুমি গ্রহণক্ষম হয়ে তাকে নিতে পারবে। এই দুটি জিনিস একত্রেই হতে পারে পরস্পর বিরোধী না হয়ে, কিংবা উপর্যুপরি হলেও এত ঘনিষ্ঠভাবে হতে পারে যে ধরা যায় না। আবার এমন হতে পারে যে তোমার হৃদয়ের আত্মদান জলন্ত

শিখার মতো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে সেই সঙ্গে অন্তরটিও খোলা ফুলদানির মতো ফাঁকা হয়ে রইল, যা আসবে তাকে গ্রহণ করবার জন্য।

দুই জিনিসই একত্রে হতে পারে এবং তাই সর্বক্ষণের জন্যও হতে পারে, অন্য যাই কিছু তুমি করতে থাকো। কেবল চেতনার অল্প কিছু নড়াচড়া হতে থাকে প্রায় অজ্ঞাতে যখন সেই চেতনা শিখাস্বরূপও হচ্ছে আর সেই সঙ্গে ফুলদানির মতোও গ্রহিষ্ণু হয়ে থাকছে —অর্থাৎ শিখা হয়ে ডাকছে আর ফুলদানি হয়ে নিচ্ছে—এটা ওটা যেন পেণ্ডুলামের মতো চলতে থাকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে যেন উপর্যুপরি না হয়ে একত্রেই হচ্ছে।

(নীরব হয়ে থেকে)

দেহ সত্তা যখন রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত তখন এটাই তুমি আবিষ্কার করবে। আশ্চর্য রকমের যন্ত্র হয়ে এই দুটি বিভিন্ন জিনিসকে একত্রেই অনুভব করতে থাকবে। চেতনাতে সেই অবস্থা আসবে যাতে অন্য সময়ের চেতনার পক্ষে যা পরস্পরবিরোধী বা অমিলের বা পরম্পরাক্রমের জিনিস বলে জানতে সেগুলিকে সমগ্র রূপে মিলিয়ে তখন একত্রেই নিতে পারবে। যদি মন ও প্রাণের সেরূপ উন্নতির অবস্থাতে পৌঁছে থাকো যাতে সকল বিপরীত-কেই নিয়ে একটা সঙ্গতি আসে (এবং তাই আসা অপরিহার্য), তখন দেখতে পাবে যে কিছু তারতম্য হলেও দেহচেতনা ঠিক অনুভব করছে ("অনুভব"-এর পরিবর্তে বরং "জানতে পারছে" বলাই ভালো) সবগুলিকেই একযোগে, যেন ঠাণ্ডা-গরম একত্রে বোধ করার মতো, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় একত্রেই হবার মতো—আর সকল বিষয়েই তেমনি। অতঃপর তুমি জানবে দেহকোষগুলির সমগ্রতার কথা। তাতে তখন স্বভাবতই এসে যাবে দেহের নিখুঁত পূর্ণতা, অন্যান্য অংশের তুলনায়। এমনি জিনিস চলতে থাকলে তাতেই প্রমাণ হবে যে দেহযন্ত্রটাই সব চেয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত। কিন্তু এইজন্যেই দেহের এমন রূপান্তর আসা এত বেশি কঠিন।

ছেলেরা, আজ এই পর্যন্তই থাক। এমনি ভাবে অগ্রসর হতে পারলে তিন-চার দফাতেই বই শেষ হবে, তারপর ভাবা যাবে অন্য কিছু নিয়ে...

প্রশ্ন : মধুময়ী মা, এর পরে "মা" বইটির কথা।

মা ও, সেই বই ধরতে চাও। আচ্ছা তাই ঠিক রইল। শুভ রাত্রি।

২৮ এপ্রিল ১৯৫৪

প্রশ্ন : মা, "তীব্র প্রতিরোধ" বলতে কি বোঝায়?

মা : তীব্র? ঐরকম বলা হয় জিনিসটা বোঝাবার জন্য। অর্থাৎ খুব জোরালো, সুতীক্ষ্ণ রকমের—বুঝলে না? সে প্রতিরোধ এমনই ধারালো যেন নখ দিয়ে আঁচড়ে ধরার মতো। নাছোড়বান্দা।

প্রশ্ন : মা, এ প্রশ্নের এই উত্তরটি ঠিক বুঝতে পারিনি—"আস্পৃহার জোর কি বিভিন্ন সাধকের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন রকমের হবে?"

মা : ও। হাঁ। কিন্তু ঐ প্রশ্নটি বোধহয় ঠিকভাবে করা হয়নি। কারণ যে ঐ প্রশ্ন করেছে সে হয়তো "জোরের" বদলে "আশ্পৃহার সাফল্য" কতখানি তাই নিয়ে জানতে চেয়েছে। বস্তুত আশ্পৃহার জোর সকলের বেলাতেই সমান। কিন্তু তার যা ফল হয় তা হয় ভিন্ন রকমের। যেই কেন প্রকৃত আশ্পৃহা করুক, তার সেইরকম জোর আছেই, কিন্তু উপরের সাড়া নেলে ভিন্ন রকমের, এবং সেটা নির্ভর করে প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের গ্রহিষ্ণুতার উপর। আমি এমন অনেককে জানি তারা বলে, "নাঃ, আমি এতকাল সর্বক্ষণের আশ্পৃহা সত্বেও তেমন সাড়া কিছু পেলাম না"। কিন্তু তা অসম্ভব, কারণ সাড়া নিশ্চয়ই এসেছে, কেবল যথোচিত গ্রহিষ্ণুতা না থাকাতে তারা তাকে গ্রহণ করতে পারেনি।

অনেক লোক এমন আছে যাদের আশ্পৃহা সত্যই যথেষ্ট, তারা উচ্চশক্তিকে সত্যই ডাকতে পেরেছে আর সেই শক্তি নেমে এসে তাদের মধ্যে প্রবেশও করেছে, তথাপি তারা এমন অচেতন যে সে কথা জানতেই পারেনি! এমন প্রায়ই হয়ে থাকে। শক্তি এসে সেখানে তার কাজ করলেও সে-বিষয়ে চেতন না হওয়াতে তারা অজ্ঞান ভাবেই থাকে। এমনও অনেককে আমি যাদের মধ্যে রূপান্তর এসে গেছে কিন্তু তারা নিজেরা সেটা জানেনা। হয়তো অনেক কাল পরে চেতনা ঘটলে তখন জানতে পারে। অপরপক্ষে এমনও অনেকে আছে যারা পুরো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে এবং যথেষ্ট উন্নীলিত ও একাগ্র থাকাতে সামান্য মাত্র শক্তির ছোঁয়া পেলেই তখনই তা জেনে তাকে সচেতন ভাবে কাজে লাগায়।

তোমার আশ্পৃহা যদি জীবন্ত ও জোরালো হয় তাহলে সে তার কাজ করবেই। তার সাড়া সে টেনে আনবে। কিন্তু তাতে যদি তুমি অমনোযোগী থাকো কিংবা গ্রহিষ্ণু হতে না পারো তাহলে সাড়া এলেও তুমি তা জানবে না। এমন প্রায়ই হয়, আর তখন সেই ব্যক্তি বলে, "আমি আশ্পৃহা করেও সাড়া পেলাম না!" সাড়া ঠিকই এসেছে, কিন্তু সে তা জানতে পারেনি, কেবল কলের চাকার মতো একভাবেই ঘুরে চলেছে।

প্রশ্ন : মা, প্রকৃতির ভুলের মতো পুরুষেরও কি ভুল হয়না?
উত্তর : ওটা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার...আমি তা জানিনা।

প্রশ্ন : মা, আমার প্রকৃতির একটা অংশ না খুললে কেমন আশ্পৃহাতে তা খুলবে?
মা যে অংশ খুলেছে তাকেই আশ্পৃহা করতে হবে অপর অংশকে খোলাবার জন্য। এই নিয়ে লেগে থাকতে পারলে সেই অংশও খুলে যাবে। এই কাজই তখন করতে হবে। এক একটা অংশ এমন থাকে যে কোনোমতে খুলতে চায়না, বেঁকে দাঁড়ায়। একগুঁয়ে শিশুর মতো বলে, "আমি ও চাইনা, চাইনা, যেমন আছি তেমনি থাকবো, এর থেকে একটুও নড়বো না।" কিন্তু এমন বলতে সাহস করেনা যে "আমি এতেই বেশ খুশিতে আছি।" আত্মবিরাম নিয়ে তার থেকে সে একটুও নড়বে না।

প্রশ্ন : কিন্তু সে অংশ যে কোনটি, তা কি আশ্পৃহার দ্বারা জানা যাবে না?
মা : ও। তা আন্তরিক হলেই জানবে। আন্তরিক ভাবে নিজের ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলে নিশ্চয় তা জানা যাবে। নতুবা উটপাখির মতো মুখ লুকিয়ে যদি থাকো

তাহলে কেমন ক'রে জানবে? অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে কেবল বলবে, "কৈ, কিছু দোষ নেইতো।" কিন্তু সরাসরি সামনে যদি চেয়ে দেখ তবে নিশ্চয় দেখতে পাবে—কোন একটা কোণের মধ্যে দিব্যি কায়েম হয়ে তা বসে আছে। আর সরাসরি যদি তার উপর আলো ফেলতে থাকো, তাহলে তখনই সেই জায়গাতে চন্‌চন্‌ ক'রে উঠবে, তাই না?

প্রশ্ন: না, ঐ গ্রহিষ্ণুতা আসা কিসের উপর নির্ভর করে?

মা: প্রথম কথা, তা নির্ভর করবে তোমার আন্তরিকতা বা ঐকান্তিকতার উপর, অর্থাৎ সত্যিই তা তুমি চাও কিনা—অতঃপর, হাঁ, এই দুটি তার পক্ষে নিতান্ত ভাবেই দরকার, আন্তরিক ইচ্ছা এবং দীনভাব। আত্মগরিমা থাকলে তার মতো অন্তরায় ওর পক্ষে আর কিছুই নেই। যদি তোমার আত্মপ্রসাদ নিয়ে থাকো তাহলে কিছুতেই জানতে পারবে না যে কোন-খানে তোমার অভাব রয়েছে, কোনখানে তোমার ভ্রান্তি, কোথায় অপূর্ণতা...প্রকৃতির মধ্যে থাকে এমন জিনিস যা অনবনীয় হয়ে একভাবে কেবল বেড়ে যেতে থাকে, নিজের দোষত্রুটি কিছুতে স্বীকার করেনা, সে স্থলে কোনো গ্রহিষ্ণুতা আসতেই পারবে না। এটা তোমরা পরীক্ষা করেও দেখতে পারো। যদি তোমার আন্তরিকতার ভিতরের একটা অংশ নম্র হয়ে স্বীকার করে—"হাঁ, আমার ভুলই হচ্ছিল, এমন ভাব নিয়ে চলা ঠিক নয়, আমি দোষের কাজই করছিলাম," এই ভাবে স্বীকার যদি করো তাহলে প্রথমে ভিতরটা খুব চন্‌চন্‌ করবে, যেমন আগে বলেছি, কিন্তু তবুও দৃঢ়তার সঙ্গে সেই মনোভাব যদি বজায় রাখো, তাহলে পরে আশ্চর্য হয়ে তুমি দেখবে যে হঠাৎ ভিতরের দরজা খুলে গেছে, সেখানে আলো ঢুকছে, আর তখন খুব খুশি হয়ে এই কথা বলবে, "এতকাল পর্যন্ত কি মূঢ়তা নিয়েই কাটিয়েছি!"

প্রশ্ন কিন্তু ভিতরে আত্মপ্রসাদ থাকলেও কি তা নিয়ে আস্পৃহা করা যাবেনা?

মা মানুষ তো সমস্তটা এক জিনিসেই তৈরি নয়, সে কথা নিশ্চয় জানো। সত্তার ভিতরকার অন্য অংশ তথাপি তাই আস্পৃহাও করতে পারে। ভিতরে এমন অংশ রয়েছে যা কোনো বেঠিক দেখলে বলে যে ওটা ঠিক হচ্ছে না, অপূর্ণ কাজ হচ্ছে, হয়েতো অস্পষ্ট ধারণা মাত্র ঘটলেও বোধ করতে থাকে যে এর চেয়ে ভালো কিছু করা যায়—আর সেই বিশেষ অংশই পারে তথাপি আস্পৃহা করতে।

প্রশ্ন না, পুরুষ আর প্রকৃতি ভেদে তাদের কি কাজ?

মা আ! আবার বলি যে আমি তা জানিনা। (নলিনীর দিকে ফিরে) নলিনী, তুমি এটা বোঝাও (হাস্য)। আমার নিজের পক্ষ থেকে এই বলতে পারি যে আমার অনু-ভূতির মধ্যে ওজিনিস নেই, তাই আমি ওটা নিয়ে কিছু বলতে পারব না।

প্রশ্ন: না-ই যদি বলেন যে আ জানেননা, তাহলে আমরা তো অজ্ঞান। (হাস্য)

মা: ভারতীয় তত্ত্বের থিওরি হিসাবে কথাটা জানি, বই পড়লেই তা জানা যায়। কিন্তু তাকে আমি "জানা" বলব না। নিজের অনুভূতিতে যা জেনেছি তাই শুধু বলি

তোমাদের কাছে। ঐ জিনিসটা আমার অভিজ্ঞতাতে আসেনি। ভিতরের সাক্ষীস্বরূপ সত্তাকে যথেষ্টই অনুভব করেছি, যে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার ও অটল হয়ে সব কিছুকেই দেখে, জানে এবং নিরপেক্ষ সম্মতি দেয়, আর...অনুভব করেছি ইচ্ছা সত্তাকে, যে সংকল্প করছে। অবশ্য এর ক্রিয়াশক্তির কথা সকলেই জানে, এটি প্রকৃতির শক্তি, যদিও অন্ধ শক্তি। কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে একজন আছে পুরুষালি ধরনের পুরুষ, আর একজন আছে মেয়েলি ধরনের প্রকৃতি। এটা আমি মানতে চাইনা। তাই ও সম্বন্ধে কিছু বলতেও চাইনা।

সম্ভবত ওটি এশিয়ার এবং বিশেষ ক'রে ভারতের তত্ত্ব, হয়তো ও জিনিস এসেছে চ্যালদির পুরুষ ভগবানের ধারণা থেকে, যেমন ক্রিশ্চান ধর্মের পুরুষ ভগবান। এটা কেবল পুরুষ মনোভাবের সৃষ্টি (আমাকে মাপ করতে হবে), আমি অন্তত সেই রকমই মনে করি। তোমরা জিজ্ঞাসা না করলে আমি এ কথা বলতাম না।

প্রশ্ন : মা, আপনি তো নিজেই বললেন অটল সাক্ষীকে অনুভব করেন, সেই তো পুরুষ।

মা : ও, তা আমি জানিনা (হাস্য)। তাকে বলতে পারো পুরুষ। কিন্তু তার যে পুরুষত্ব আছে এমন আমি বোধ করিনি ; ওতেই আবার আপত্তি, ঐরূপ ভাবে পুরুষ আর নারী ভেদে আলাদা ক'রে দেখা। এ কথা আমি বরাবরই বলবো যে ওটা সেই হিসেবে ঠিক সত্য নয়, এটা হলো পুরুষ আর ওটা হলো নারী (মা দুদিকে হাত নেড়ে দেখালেন)। অমন ভাবেই বা প্রভেদ আনতে চাইবে কেন? নারী পুরুষ ভেদ করাটা হলো প্রকৃতির চাতুরী, প্রকৃতিই তার আপন প্রয়োজনে এ কাজ করেছে। কিন্তু আমি এই কথাই তোমাদের বলব যখন তুমি উপর থেকে এখানে নেমে এসেছিলে তখন তো আদৌ স্ত্রী পুরুষ বলে কোনোই তফাৎ ছিল না, এখানে থাকার পরে তখন জানলে যে ঐ জিনিসটা কি, তখন বলতে পারলে "এটা প্রকৃতিগত বিভেদ"। কিন্তু আমি বলি যে এই বিভেদ মনুষ্য জীবনের নিচেকার স্তরের জিনিস, মানুষদের মাথা ঐরকম ভাবা ছাড়া অন্য কোনরকম ভাবতে পারে না, কারণ তারা এখনও পর্যন্ত রয়েছে পশুত্বের স্তরে। আমি বরাবরই এটা বোধ করি। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমি এমন কথাই বলবো, তোমরা যদি তা শুনতে না চাও তাহলে কেউ ঐ নিয়ে আমাকে কোনো প্রশ্নও জিজ্ঞাসা কোরোনা।

শুভ রাত্রি।*

—শ্রীমা

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

(বিঃ দ্রঃ—আলোচ্য কাহিনীর লেখক গত বৎসর ১৯৭৪ ১০ই জুলাই অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে আমরা লেখাটির শেষাংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতেছি। বলাবাহুল্য, লেখকের অকস্মাৎ তিরোধানে আলোচ্য কাহিনীটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। —বর্ত্তিকা-সম্পাদক)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিভাবে, আমরা ছয়জন উইং কম্যাণ্ডার বেহের সিংএর প্ররোচনায় "বিদ্রোহী" হিসাবে ধরা পড়িলাম এবং আমাদের "কোর্ট মার্শাল" করা হইবে বলিয়া স্থির হইল। সকলেরই তিন হইতে দশ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হয়—সেই বিচার-প্রহসনের কথা পরে বলিতেছি।

পাঠক হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা ধরা পড়েন ও শাস্তি পান (একজনকে অবশ্য পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়) তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন বাঙ্গালী। তদানিন্তন ফৌজী কানুন মানিয়া যদি বেহের সিং বিচারের ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে বেহের সিংকে বঙ্গদেশ হইতে একজন বিচারক আনিয়া আমাদের বিচারকের বোর্ডে বসাইতেই হইত। কিন্তু উনি তাহা ইচ্ছা করিয়াই করেন নাই। বেহের সিংএর এই সব পূর্ব্বপরিকল্পিত নীচ ষড়যন্ত্রের কথা ঘটনাক্রমে বলিব।

আমরা তখন এক তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া গিয়া বুঝিলাম যে, উইং কম্যাণ্ডার বেহের সিংএর মত ইংরাজের তোষানুদে প্রভুভক্ত কুকুর যতদিন ভারতবর্ষে ইংরাজ-সরকারের কোনও উচ্চ-সরকারী পদে বহাল থাকিবে ততদিন ইংরাজও নিশ্চিন্তে এই দেশের উপর শাসনের নামে অত্যাচার করিয়া তাহার "প্রভুত্ব" বজায় রাখিবে। ইতিহাস পড়িলেও জানা যায় যে, পাঠান-মোগল যত বিজাতীয়রা এ দেশ দখল করিয়াছে, তাহারাও এই দেশীয় "প্রভুভক্তদের" সাহায্যে ভারতবর্ষে রাজত্ব (প্রভুত্ব বলিলেই সমীচীন হয়) করিয়া গিয়াছে। ইংরাজের বেলায়ও ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ইতিহাস হইতে ইহাও জানা যায় যে, যে-প্রদেশের বা অঞ্চলের লোকেরা একবার এই ঘৃণ্য প্রভুভক্তি দেখাইতে পারিয়াছে তাহারাই তাহাদের প্রভু অর্থাৎ রাজা-বাদশার নিকট হইতে 'বীরজাতি' (Martial Race) বলিয়া সম্মানজনক খেতাব পাইয়াছে—আর যাহারা এই 'প্রভুভক্তি দেখাইতে অসমর্থ (যেমন, বঙ্গ দেশের লোকরা) তাহারা "নন্-মার্শাল রেস্ (Non-martial Race) অর্থাৎ "সৈন্য-বাহিনীর জন্য অযোগ্য" বলিয়া তদানিন্তন "প্রভুর" দ্বারা পরিগণিত হইল। ইহা যে কতদূর নিখ্যা তাহা অতীতেও ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে—বর্ত্তমানেও করিতেছে ("জয়বাংলার' ইতিহাস লক্ষণীয়) এবং ভবিষ্যতেও করিবে।

যাই হোক, দুঃখ-অপমানের প্যাচাল না পাড়িয়া আসল গল্পে আসা যাক।

আমরা ধরা পড়ার পর একবার এয়ার মার্শাল মুখার্জি আমরা যাহাতে ছাড়া পাই সেজন্য

আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া একটু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী একজন খুব জবরদস্ত "সিংহ" ছিলেন বলিয়া—অন্য একজন "সিংহের" কথাই কার্যকরী হইল—বিমান বাহিনীর কর্তার চেষ্টা সফল হইল না। প্রসঙ্গতঃ এখানে আর একটি ঘটনা বলিলে, বেহের সিংএর "সিংহ-স্বরূপ" বোঝা যাইবে। এয়ার মার্শাল মুখার্জি সেই সময়ে একবার কোহাটেও আসেন। তিনি বেহের সিংকে জিজ্ঞাসা করেন, যে, ভারতীয় বিমানবহরের এখন শৈশবকাল—এই সময় কি ছয়জন উচ্চপদস্থ পুরাতন বৈমানিককে কোর্ট-মার্শাল করা সমীচীন হইবে? বেহের সিং-এর জবাব "সিংহের" মতই হইয়াছিল বটে। তিনি উত্তর দিলেন—নিঃ মুখার্জি এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন, কারণ দোষীদের মধ্যে বেশীর ভাগই বাঙ্গালী। ইহার পর এয়ার মার্শাল মুখার্জি আর কিছুই বলেন নাই। অতএব আমাদের বেলা আর কিছুই করা গেল না।

বিচারের রায় বাহির হইতে একদিন বা দুইদিন সময় লাগিয়াছিল। অর্থাৎ 'রায়' পূর্ব্ব হইতেই সাজাইয়া রাখিয়া বিচারের এক প্রহসন করবার জন্য আদালত ডাকা হইয়াছিল। কাজেকাজেই সমস্ত বিচারটি খুব সহজ ও সরলভাবে শেষ হইল।

আমাদের বিচারের জন্য বেহের সিং কিরূপ চালাকী করিয়া বিচারকদের বোর্ড (Board) তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার জন্য একটু পূর্ব্বকথায় ফিরিয়া যাইতেছি।

তদানিন্তন বিলাতী ফৌজী কানুন অনুসারে এই নিয়ম ছিল যে, যে-যে প্রদেশের ফৌজীকে কোর্ট-মার্শালে 'দোষী' সাব্যস্ত করা হইবে সেই-সেই প্রদেশ হইতে উকীল বা ব্যারিষ্টার আনিয়া তিন, পাঁচ বা সাতজন সদস্য লইয়া একটি 'বিচার বোর্ড' সংগঠিত হইবে এবং এই সংগঠিত কমিটি বিচারের সমস্ত দায়িত্ব লইয়া নিরপেক্ষভাবে সমস্ত বিষয়টি বিচার করিবেন। এই কমিটির কাজ ফরিয়াদীর বিপক্ষে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হইয়াছে ও সেই অভিযোগগুলির স্বপক্ষে যতগুলি প্রমাণ আছে—সেইগুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া ফরিয়াদীকে সাজা দেওয়া বা খালাস করার জন্য প্রধান সেনাপতির নিকট সুপারিশ করা। এখানে ফরিয়াদীকে একটা সুবিধা দেওয়া হইত। ফরিয়াদী তাহার পছন্দমত কোন উচ্চতর অফিসারকে বা অন্য কাহাকেও তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া ওকালতি করার জন্য আবেদন করিতে পারিত এবং তৎকালীন ফৌজী নিয়ম অনুসারে ফৌজী খরচায় সেই অফিসারকে তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য নিয়োগ করিতে পারিত। কিন্তু এখানে ষ্টেশন কম্যাণ্ডার বেহের সিং সমস্তই নিজের ইচ্ছামত করিলেন—ইংরাজের নিকট তাঁহার সুনাম যাহাতে বজায় থাকে। ইহার পরিণামে যদি তাঁহার স্বদেশবাসীগণ অন্যায় অবিচারে শাস্তি-ভোগও করেন তাহাতে কিছু যায় আসে না।

আমাদের আজিমত, আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য যে সমস্ত ব্যক্তিদের কাছে আমাদের দরখাস্ত দিলাম (উকীল বা ব্যারিষ্টারের জন্য) বেহেরসিং তাহাদের সকলের নাম নাকচ করিয়া বোম্বাই হইতে একটি লোককে টাকার লোভ দেখাইয়া আনয়ন করিলেন। ভদ্রলোকের বোম্বাইতে কোনও পসার ছিল না। অর্থের লোভে আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আসিলেন। প্রথম আলাপেই আমাদের পরামর্শ দিলেন যে, বেহের সিং যেমন করিয়া আমাদের 'বিদ্রোহ' করার সাংঘাতিক দোষ স্বীকার করিতে বলেন আমরা যদি ঠিক সেইরূপ-

ভাবে দোষ স্বীকার করি তাহলেই আমরা বাঁচিব নচেৎ আমাদের সকলকেই রাইফেলের গুলি খাইয়া মরিতে হইবে। তাঁহার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর আমরা বুঝিতে পারিলাম, তিনি ইংরাজ সরকারের একজন গুপ্তচরও বটে! আমাদের নিকট হইতে জানিতে আসিয়াছেন কোহাটের মত এই ক্ষুদ্র ঘাঁটির 'বিদ্রোহ' সারা ভারতবর্ষে ভগীদের 'সশস্ত্র-বিদ্রোহের' সূচনা কিনা? সুতরাং আমরাও না-জানার ভাণ করিয়া তাঁহাকেই উল্টা প্রশ্ন করিতে লাগিলাম—কি বিদ্রোহ? কোথায় বিদ্রোহ? কেন বিদ্রোহ? যাই হোক, তখন দিল্লীর ভারতীয় পার্লামেন্টে একজন মুসলমান ভদ্রলোক ছিলেন (আসলে, তিনি ছিলেন পাঞ্জাবী—নিজেকে পাঠান বলিয়া পরিচয় দিতেন)। তাঁর নাম ছিল সর্দার আব্দুল কইয়ুম খান্। পার্লামেন্টে কংগ্রেসের দলের তিনি ডেপুটি লীডার ছিলেন এবং বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া আসেন। তিনি কিরূপে ফ্লাইট সার্জন ভাদুড়ীর কথা জানিতে পারেন। কাহাকেও কিছু না জানাইয়া তিনি সোজা কোহাটে চলিয়া আসেন এবং আমাদের পক্ষ সমর্থন করেন।

আমাদের বিচারে—বিচারকদের বোর্ডে মেহের সিং পাঁচজন ইংরাজ ও মাত্র একজন ভারতীয়কে লইলেন, কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যেমন করিয়াই হউক এই কয়জন বৈমানিককে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি দিতেই হইবে।

বিচারের যে 'রায়' বাহির হইল তাহার কয়েকটি 'দফা' ছিল। প্রথম দফায়, আমাদের সকলকে বিমান-বাহিনী হইতে 'ডিস্‌মিস্' করা হইল অর্থাৎ নিজ-নিজ চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইল।

দ্বিতীয় দফায়, এই বৈমানকরা যত রকমভাবে গভর্ণমেন্টের কাছে তাঁহাদের অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন সমস্ত বাজেয়াপ্ত করা হইল।

তৃতীয় দফায়, বৈমানিকদের প্রত্যেককে তিন হইতে দশ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল।

আমরা আটক থাকাকালীন স্কোয়াড্রনের কোন কোনও অফিসাররা মাঝে মাঝে, মেহের সিংএর অনুমতি লইয়া, বৈকালে বা সন্ধ্যায় আমাদের সাথে গোপ-গল্প করিতে আসিতেন। আমাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত তাঁহারা আমাদের কাছে নানাপ্রকার উপাদেয় সংবাদ পরিবেশন করিতেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পরই বোঝা যাইত এই মনোরঞ্জনকারীরা মেহের সিংএর শিখানো বুলি আমাদের শুনাইতেছেন। তাঁহাদের বক্তব্যগুলি বেশীর ভাগই মেহের সিংকে প্রশংসা করিয়া। যেমন, বিচারকগণ আমাদের চরমদণ্ড দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন কিন্তু পরমদয়াল মেহের সিং কত চেষ্টা করিয়া সেই চরমদণ্ড বাতিল করিয়া আমাদের জন্য এই উপাদেয় সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইত্যাদি।

আমরা ধরা পড়ার কিছুদিন পূর্বে সাত নম্বর স্কোয়াড্রনে একজন অল্পবয়স্ক শিখ পাইলট আসিয়াছিলেন। বিমানচালনায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াই তিনি আমাদের সাত নম্বর স্কোয়াড্রনে বদলী হইয়া আসেন। বিমানচালক অফিসারদের সাধারণতঃ যেমন দম্ভ থাকে তাঁহার সেই দম্ভ তখনও সম্পূর্ণরূপে পাকাপোক্ত হয় নাই। সেজন্য তিনি যখন আমাদের কাছে আসিতেন তখন এমন সব কথা অকপটে বলিতেন যাহার প্রকাশ হইলে তাঁহার চাকুরী পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতে পারিত। তিনি অবশ্য কথা বলার পর

আমাদের বারেবারে সাবধান করিয়া দিতেন যাহাতে আমরা এসব কথা কাহারও কাছে প্রকাশ না করি বিশেষ করিয়া মেহের সিংএর কানে যেন ঐ সব কথা না পৌঁছায়। আমরা তাঁহার 'মেহের সিং ভীতি' দেখিয়া হাসাহাসি করিলেও বুঝিতে পারিতাম মেহের সিং কিরূপে আতঙ্ক ও ভীতি সঞ্চার করিয়া বৃটিশরাজত্বে এক উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরীতে বহাল ছিলেন।

গল্পে ফিরিয়া যাই। সেই সময় সাত নম্বর স্কোয়াড্রনের অ্যাড্‌জুটান্ট অর্থাৎ স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডারের সহকারী ছিলেন পাইলট অফিসার মিঃ শ্রীনিবাসন। মিঃ শ্রীনিবাসনের কথা পরে বলিতেছি।

আমাদের ছয়জনের তো তিন বৎসর ও ততোধিক করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইল। যেহেতু তখনকার বৃটিশ শাসনতন্ত্র অনুসারে দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের কোনও ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানো যাইত না, সেজন্য প্রথমে আমাদের বিমানবাহিনী হইতে 'বহিষ্কৃত' অর্থাৎ 'ডিস্‌মিস্' করা হইল। একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

পুনরুক্তি করা যায় যে, সেই সময় কয়েকজন নূতন বিমানচালক আমাদের স্কোয়াড্রনে (সাতনম্বর) বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শিখ পাঞ্জাবী—নাম মিঃ রান্‌ধাওয়া। তিনিও আমাদের সহিত গল্পগুজব করিতে আসিতেন। আসিবার সময় আবার 'শুধুহাতে' আসিতেন না—এক চাঙ্গারী মিষ্টি লইয়াও আসিতেন। কিন্তু তিনি বেশী দিন আসাযাওয়া করিতে পারেন নাই, কারণ আমরা তাঁহার মতলব বুঝিয়া ফেলিয়াছিলাম। প্রায় ১০।১২ বৎসর পরে নেপালে আবার তাঁহার সাথে দেখা হয়। তখন আমরা দুইজনেই নেপালের মহারাজার নিজস্ব বিমান চালক হিসাবে নিযুক্ত। সেই সময় একবার সরাসরি তাঁহাকে পূর্বেকার ঐ 'গোয়েন্দাগিরি'র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি খুব লজ্জিত হইয়া বলেন যে, মেহের সিংএর ভয়ে তিনি ঐরূপ একটি গর্হিত কার্য্য করেন। লজ্জায় তিনি তখন মার্জনাভিক্ষাও করিতে পারেন নাই—'ভুল' হইয়াছে বলিয়া শুধু দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জেলে থাকাকালীন মিঃ রান্‌ধাওয়া সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে অমূলক ছিল না তাহা তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।

ষ্টেশন কম্যাণ্ডার মেহের সিং কেন এইরূপ অসৎ ও হীন পন্থা অবলম্বন করিয়া আমাদের নিকট হইতে খবরাখবর লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন জানিনা, তবে পরে মনে হইয়াছিল যে, হয়ত ইংরাজের কাছে নিজের "সুনাম" বজায় রাখার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শুধু দুর্নামই অর্জন করিয়াছিলেন। কারণ ইংরাজ তাঁহাকে পাঞ্জাবের লাট্‌সাহেব তো করিলই না, উল্টা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে এমন সব বিকৃত রেকর্ড রাখিয়া গেল যে এয়ার মার্শাল মুখার্জীর পর ভারত গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে এয়ার মার্শাল পর্যন্ত করিলেন না।

সাত নম্বর স্কোয়াড্রনে, পাইলট অফিসার মিঃ রান্‌ধাওয়ার সঙ্গে ঐ স্কোয়াড্রনের অ্যাড্‌জুটান্ট হইয়া আসেন মিঃ শ্রীনিবাসন্। একথা আগেই বলা হইয়াছে। মিঃ শ্রীনিবাসন্ ছিলেন তামিল ব্রাহ্মণ ও স্বভাবে খুবই নরম প্রকৃতির লোক। সামান্য একটু আঘাত বা সহানুভূতিতে তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িত।

তাঁহার কাজ ছিল স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডারকে সব বিষয়ে সাহায্য করা। আমাদের জেলে লইয়া যাওয়ার দায়িত্ব তখন তাঁহার উপর পড়িল।

প্রথমে, জেল কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দেওয়া হইল যে, এয়ারফোর্স ষ্টেশন কোহাট হইতে ছয়জন বৈমানিককে বিমান কর্তৃপক্ষ তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁহাদের ১৩ই মে, সকালবেলা বিমানবাহিনী, জেলে পৌঁছাইয়া দিবে। জেল কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের জন্য যেন সব ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। তখন কোহাট জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন ডাক্তার গদি। তিনি জাতিতে হিন্দু পাঠান ছিলেন। বিলাত হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া প্রথমে তিনি কোহাট সহরে সিভিল্‌সার্জনের কাজ করেন। জেলে আরও তিনজন অফিসার ছিলেন—জেলর, সহকারী জেলর ও সাব্‌-অ্যাসিস্টান্ট জেলর। জেলে একজন ডাক্তারও ছিলেন। এঁদের মধ্যে সাব-অ্যাসিস্টান্ট জেলর কেবল হিন্দু ছিলেন। বাকী সবাই পাঞ্জাবী-মুসলমান। তখন আশ্চর্য হইতাম এই ভাবিয়া যে, কোহাট শহর পাঠান-অধ্যুষিত জায়গা অথচ সেখানে শহরের অধিকাংশ অফিসার মুসলমান। পরে বুঝিয়াছিলাম যে, ইংরাজরা তখন হইতেই "পাকিস্তান" তৈরী করিয়া রাখিয়াছিল। অথচ তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিধান সভায় সীমান্ত-কংগ্রেসীদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশী এবং ডাক্তার খান্‌-সাহেব তখন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন।

এবার 'জেল-পর্বে' আসা যাক্‌। জেলে যাওয়ার দিন সকাল সাড়ে আটটায় সময় আমাদের 'প্যারেড' করাইয়া দাঁড় করান হইল। তারপর অ্যাডজুটান্ট মিঃ শ্রীনিবাসনকে দিয়া আমাদের কোটের বাঁদিকের বুক পকেটের উপর হইতে ও কোটের কাঁধের উপর হইতে মেডেল ও ডেকোরেশন্‌গুলি ছিঁড়িয়া ফেলা হইল (ইহার মধ্যে কালো ফিতায় পদচিহ্নের ব্যাজও ছিল)। কিন্তু মজা সুরু হইল যখন প্রথম দুইজনের পর তৃতীয়জনের নিকট মিঃ শ্রীনিবাসন আসিলেন। তখন তাঁহার সংবেদনশীল হৃদয় আর সংযমের বাঁধ রাখিতে পারিল না। তিনি এত অস্থির হইয়া ক্রন্দনরত হইলেন যে আমাদের এই ছয়জন দোষীদের মধ্য হইতে একজনকে গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে হইল। শেষে চারিনম্বর স্কোয়াড্রন হইতে মেহের সিংএর এক চর আসিয়া পড়ায় (তখন ৪নং ও ৭নং স্কোয়াড্রন দুইটিই কোহাটে ছিল এবং অফিসিয়াল বার্তা অনুসারে স্কোয়াড্রন দুইটি লড়াইতে খুব পরিশ্রান্ত বলিয়া কোহাটে বিশ্রাম করিতেছে) শ্রীনিবাসন নিজেকে একটু সামলাইয়া লইলেন। কিন্তু ফ্লাইট সার্জেন্ট ভাদুড়ীর কোটের কাঁধ হইতে পদব্যঞ্জক এপলেট্‌ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলার সময় আর থাকিতে পারিলেন না। একেবারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ইহাতে ফ্লাইট সার্জন ভাদুড়ীও খুব বিব্রত হইয়া পড়িলেন—তাঁহারও চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে চোখের জল তাঁহার নিজের দুঃখের জন্য নয়—তাহা শ্রীনিবাসনের প্রতি সহানুভূতির জন্য। সারা মাঠে তখন শুধু কাঁচ্‌ কাঁচ্‌ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল—সে এক মহা-বিশ্রী কাণ্ড! প্রতিরক্ষা বিভাগের লোকেদের প্যারেডের মাঠে চোখের জল ফেলা এক সাংঘাতিক গর্হিত কাজ ও লজ্জার কথা। যে হয়ত আগামী কাল দেশের ও দশের জন্য শত্রুর গুলিতে প্রাণ দিবে আজ সে প্যারেডের মাঠে যদি চোখের জল ফেলে তাহার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে? শ্রীনিবাসন চোখের জল ফেলিয়াছিলেন একটি অন্যায় কার্যের প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া।

আমরা কয়জন মিঃ শ্রীনিবাসনকে সান্ত্বনা দিয়া ষ্টেশন ওয়াগনে উঠিলাম—জেলে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিবার জন্য। মিঃ শ্রীনিবাসনকেও আমাদের সঙ্গে আসিতে হইল

জেল কর্তৃপক্ষের হাতে আমাদের তুলিয়া দিবার জন্য। জেলে পৌঁছিবার পর সেখানে আবার এক পশলা বৃষ্টিপাত হইল।

এখানে একটি দুঃখের কথা জানাইতেছি। বিমান বাহিনীতে থাকাকালীন প্রত্যেক দিনের ঘটনার একটি দিন-পঞ্জিকা রাখিতাম। জেলে যাবার সময় ব্যারাকে কিট-বক্সের ভিতর প্রতিদিনের কথা লেখা সেই দিন-পঞ্জিকাটি ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। সেজন্য এখন শুধু যাহা মনে পড়িতেছে তাহাই লিখিতেছি। কেবলমাত্র স্মরণ-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া লেখা বলিয়া মাঝে মাঝে হয়ত একটু রংএর প্রলেপও আসিয়া পড়িবে। পরে অবশ্য চিঠি লিখিয়া ঐ দিন-পঞ্জিকাটি উদ্ধারের নিষ্ফল চেষ্টা করিয়াছিলাম।

এবার জেল-বাস অভিজ্ঞতার কিছু বর্ণনা দিতেছি। যাঁহারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবাসী নন জেল কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের বেশীদিন কোহাট জেলে রাখা সমীচীন মনে করিলেন না। সে জন্য প্রথমে স্কোয়াড্রন লীডার হাসান ও ওয়ারান্ট অফিসার কস্তুরীলালকে কোহাট হইতে লাহোর জেলে স্থানান্তরিত করা হইল। পরে অবশ্য কস্তুরীলালকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় কোনও প্রকার শাস্তি না দিয়াই এবং পুনরায় তাঁহাকে বিমান-বাহিনীতে ফেরৎ লওয়া হয়।

বাকী চারজন বাঙ্গালীর মধ্যে তিনজনকে অর্থাৎ ওয়ারান্ট অফিসার শৈলেন দাসগুপ্ত, সার্জেন্ট রণজিৎ বাসু ও সার্জেন্ট লালমোহন সেনকে কলিকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হইল। কোহাটে শুধু রহিয়া গেলেন একজন বাঙ্গালী—ফ্লাইট সার্জেন্ট ভাদুড়ী।

একজন বলিয়া ফ্লাইট সার্জেন্ট ভাদুড়ীকে খুবই আদরে রাখা হইল।

সশ্রম কারাদণ্ড যখন তখন কাজ করিতেই হইবে। কি কাজ? প্রথমতঃ জেলের অফিস সংক্রান্ত চিঠিপত্র 'টাইপ' করা। যদিও টাইপ করার কাজ পূর্বে কখনও করা হয় নাই, কিন্তু তাহাতে কোনও অসুবিধা হইল না। সময়ের অভাব না থাকায় কোন্ অক্ষর কোথায় আছে দেখিয়া দেখিয়া টিপিয়া দিলেই 'টাইপ' করার কাজ হইয়া গেল। ভুল ধরারও উপায় ছিল না। যদিও জেলর ও ডেপুটি জেলর মহাশয়গণ নানা প্রকার ছল চাতুরীর দ্বারা অসুবিধায় ফেলার চেষ্টা সর্বদাই করিতেন কিন্তু জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ডাক্তার গদি হওয়ায় ও ফ্লাঃ সাঃ ভাদুড়ী বেশী করিয়া কাজ করিবেন বলিয়া অনুরোধ করায় তাঁহারা বেশী সুবিধা করিতে পারিলেন না। বরং অনেক সময় নিজেরাই নিজেদের বুদ্ধির দোষে অপ্রস্তুত হইতেন। এই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা বলিতেছি।

তখন জেলে থাকাকালীন তিনবার রক্ত দিয়াছি। তখন নিয়ম ছিল, কয়েদী যদি 'রক্তদান' করে তবে প্রতিবার রক্তদানের জন্য তাহার জেলবাসের মেয়াদ তিনমাস করিয়া হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ আমার তখন সবশুদ্ধ নয় মাস জেলবাসের মেয়াদ হ্রাস হইয়া গিয়াছে। রক্ত দেওয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ ও গভর্ণমেন্ট আমার উপর খুব সদয়। এদিকে ডাক্তার গদির এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল—তাহার ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা আগত। ডাঃ গদির অনুরোধে ও আগ্রহে ছেলেটিকে ইংরাজী ও অঙ্ক পড়াইবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে রোজ একটা সময় যাইতে আরম্ভ করিয়াছি।

একদিন ডেপুটি জেলর বিরক্ত হইয়া লক্ষ্য করিলেন যে তাঁহার দেওয়া একটা কাগজ

টাইপ করিতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি অফিসঘর হইতে বাহির হইয়া একজন ওয়ার্ডারের সাথে ডা: গদির বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম। ভদ্রলোক খুব বিরক্ত হইলেও তখন কিছু বলিলেন না। সকাল দশটা-এগারটার সময় ফিরিয়া আসিতেই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন, "মি: ভাদুড়ী। আমার এই জুতোজোড়া বড়ই ময়লা হইয়াছে। তুমি তো বিমানবাহিনীর লোক—জুতা নিশ্চয়ই ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে জানো। ঐখানে বুরুশ ও জুতার কালি আছে, জুতোজোড়া ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া আনো"। আমি তাঁহার মতলব বুঝিলাম, আর কোনও বাক্যব্যয় না করিয়া জুতা জোড়াটি তুলিয়া ও বুরুশ লইয়া একেবারে ডা: গদির খাস্‌কামরার সামনে যাইয়া খুব জোরে জোরে শব্দ করিয়া বুরুশ করিতে শুরু করিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডা: গদি বাহিরে আসিয়া কাহার জুতা বুরুশ করিতেছি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিও সোজাসুজি বলিয়া দিলাম যে বোধহয় ডেপুটি জেলর আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন সেইজন্য এইরূপ অপমানজনক কাজ দিয়াছেন। কিন্তু আমাকে শাস্তি দিবার কোনও প্রকার অজুহাত আমি তাঁহাকে দিতে রাজী নই। সেজন্য তাঁহার কথামত তাঁহার জুতা বুরুশ করিতেছি। ডা: গদি তৎক্ষণাৎ ডেপুটি জেলরের অফিস ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার কাছে এক লিখিত কৈফিয়ৎ চাহিলেন। এই ঘটনার পর তাঁহারা আর এই অধমকে বিব্রত করিবার সাহস পান নাই বরং একটু সমীহ করিয়াই চলিতেন।

জেলে থাকাকালীন রমজানের উপবাসের সময় আসিল। তখন নিয়ম ছিল রমজানের উপবাসের সময় প্রত্যেক মুসলমান কয়েদীকে বৈকালে এক ঢেলা গুড় দিবার। কিন্তু আমাকেও রমজানের মাসে প্রত্যহ দুই ঢেলা গুড় দিত। পাঠানদেশে এই গুড়কে বলা হয় "খাণ্ড"। আর পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে বলা হয় "খাণ্ডেশ্বরী।" অর্দ্ধেক আখের গুড় ও অর্দ্ধেক মাটি নির্ম্মিত ইহা এক অতি উপাদেয় অদ্ভুত বস্তু! মুসলমান কয়েদীগণ উপবাসের পর ইহাকে জলে গুলিয়া পান করিতেন। আমার সেরূপ করার প্রয়োজন হইত না। এক খণ্ড আমি রাখিয়া দিতাম রাত্রে জেলের রুটির (যাহা চামড়ার জুতার নামান্তর) সহিত খাইব বলিয়া, আর অপর খণ্ডটি অন্য কোনও পছন্দসই পাঠানকে উপহার দিতাম। এখানে রুটির সহিত জুতার তুলনা দিতে গিয়া চ্যার্লি চ্যাপলিনের "গোল্ডরাশ" চলচ্চিত্রের কথা মনে পড়িয়া গেল। পাঠকদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয় "গোল্ডরাশ" দেখিয়াছেন। এখানে সেই ছবির সামান্য একটু উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও রসভঙ্গ হইবেনা আশা করি।

ছবিতে দেখানো হইতেছে যে, চ্যাপলিন ও তাহার এক বন্ধু মেরুপ্রদেশে সোনা খুজিতে গিয়া এক ভীষণ বিপদে পড়িয়াছেন। বিপদটি হইল পর-পর কয়েকদিন খাওয়া একেবারেই জুটিল না। শেষে ক্ষুধার জ্বালায় আর থাকিতে না পারিয়া চ্যাপ্লিন নিজের বুট-জুতা জলে সিদ্ধ করিয়া জুতার শুকতলা ও ফিতা নিজে বেশ আরাম (?) করিয়া খাইলেন। বন্ধুকে দিলেন জুতা ও তাহার তলাটা—পেরেক সহিত। পাঠকের যদি সেই জুতা-ভোজনের অপূর্ব্ব ও অভাবনীয় দৃশ্য স্মরণে থাকে তবে কোহাট জেলের রাত্রের রুটি খাওয়ার বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তফাৎ শুধু পেরেকের বদলে রুটিতে রহিয়াছে পাথরের টুকরা—সে ক্ষুদ্র হইলেও পাথর তো! আর, পাঠানী-পাথর লোহার পেরেক

হইতেও শক্ত। দাঁতের কামড়ে সেই রুটি ছিঁড়িতে পারে এমন পালোয়ান বোধহয় এখনও পাঠানদের মধ্যে জন্মে নাই। অন্ততঃ তখনও পর্যন্ত তো দেখি নাই। জেলে অনেক দুর্ধর্ষ পাঠানের সাথে পরিচয় হইয়াছে কিন্তু সকলকেই সেই রুটির ভয়ে ভীত দেখিয়াছি।

কোহাট জেলে রাত্রের আহার সন্ধ্যার সময় মিলিত। আহারের জন্য পাত্র ছিল একটি অ্যালুমিনিয়ামের বাটি ও একটি লোহার পাত্রের উপর সাদা কলাইকরা বা অ্যালুমিনিয়ামের কাঁধা তোলা সরা। রাত্রে খাবারের জন্য প্রত্যহ মিলিত এক বাটি সবুজ রংয়ের গোলা জল—জিজ্ঞাসা করিলে পাঠান পাচক বলিত শাকু! আর দুইটা বা একটা ইঁটের টুকরা (অর্থাৎ রুটি)। ইঁটের টুকরাটি সরার উপর দিবার সময় 'ঠং' করিয়া শব্দ হইত। এই ইঁটের টুকরাটি খুবই উপযোগী ছিল। কারণ এক সন্ধ্যায় উহা খাইলে তিনদিনের জন্য নিশ্চিন্ত! শুধু ক্ষুধার কথাই বলিতেছি না, দাঁত ও মুখের কথাই বলিতেছি। দাঁত খুব শক্ত না হইলে, খাওয়ার সময় সব ভাঙিয়া অর্দ্ধেক হইয়া যাইবার ভয় থাকিত। আর যদি কোনও প্রকারে একবার গলার ভিতর দিয়া উদরে প্রবেশ করিত তাহলে আর কথাই নাই—তিনদিন আর কিছু না খাইলেও চলিত।

একবার রাত্রে আহারের সময় দুই পাঠান কয়েদীর মধ্যে লড়াই দেখিবার সুযোগ পাইয়া ছিলাম। দুইজনেই এই পাথরের রুটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিল। পরিণামে দুইজনেই এমন রক্তারক্তি করিয়া ফেলে যে, জেলের ডাক্তার মামুদকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি তাহাদের জেলের হাসপাতালে সপ্তাহকাল ধরিয়া রাখিয়া চিকিৎসা করাইতে হয়। দুই-জনেরই মাথা ও মুখ দিয়া প্রচুর রক্তপাত হইয়াছিল—পাঠানী রুটির এমনই মহিমা!

এইরূপ সাংঘাতিক হাতিয়ার তথা খাদ্যবস্তুর প্রস্তুত-প্রণালী জানিবার জন্য আমার খুব কৌতূহল হয়। জেলের প্রদত্ত আহারই যদি এইরূপ সাংঘাতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যব-হার করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে কাজে লাগিতে পারে ভাবিয়া পাঠান ব্রাহ্মণ পাচককে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে যাহা বলিয়াছিল, যেটুকু মনে পড়িতেছে লিখিতেছি।

প্রথমে একটি নাতি বৃহৎ পাথর চাই যাহার একদিক মসৃণ। পাথরটি ধুইয়া পরিষ্কার করিবার পর ঐ মসৃণ দিকে কাঠ-কুটে জাতীয় কিছু দাহ্য পদার্থ জমা করিয়া আগুন ধরাইয়া দিতে হইবে। যখন আগুন বেশ গন্‌গনা হইয়া উঠিল তখন তাড়াতাড়ি দাহ্য পদার্থগুলি সরাইয়া দিয়া সেই গরম পাথরের উপর বেশ গলাগলা করিয়া মাখা আটা ঢালিয়া দিতে হইবে। এরপর একখানা কাঠের হাতা দিয়া আটার ঢেলাটিকে গরম পাথরটির উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই জুতার সুকতলার মত একখানি রুটি তৈরী হইয়া যাইবে। এরপর চিমটা দিয়া তুলিয়া লইয়া খাওয়া যাইতে পারে। এই রুটি সাধারণ রুটির মত সুস্বাদু ও সহজপাচ্য নয়। তাহাতে অবশ্য পাঠানদের কিছু যায় আসে না। কারণ সেদেশে খাদ্যের অভাব বলিয়া ঐরূপ রুটির চলন, যাহা একবার খাইলে সারাদিন আর ক্ষুধা পাইবার হাঙ্গামা নাই। আমরা যেভাবে রুটি তৈয়ারী করি, সে রুটিকে পাঠানরা রুটিই বলে না।

বি-ক্লাস (B-Class) কয়েদী বলিয়া শ্রীতাদুড়ীর জন্য খাদ্যের পরিমাণ ও খাদ্য একটু উন্নত ধরণের ছিল। দৈনিক চাউল (বা গমের রুটি) ছয় আউন্স, আলু ছয় আউন্স, মৎস্য-মাংস বা ঐ জাতীয় কিছু ছয় আউন্স, দুগ্ধ ছয় আউন্স। ঘি-তৈল বা ঐ জাতীয় কিছু

দশ হইতে বার আউন্স। আর এই বিশেষ খাদ্য তালিকার খাদ্য শুদ্ধভাবে তৈরী করিতে সাধারণ পাঠান পাচক পারিবেনা বলিয়া একজন হিন্দু পাঠান কয়েদীকে আমার নোকর হিসাবে রাখা হইল। সেই পাচক ভদ্রলোকটি একজন কৃষক ছিলেন, তাঁহার বাবুর্চির কাজের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু ইহাতে কোনও অসুবিধা হইত না। অন্যান্য পাঠান সুইকারেরা তাঁহাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করিত। কেবল, যেদিন আমার বেশন বাবদ ভেড়ার মাংস আসিত সেদিন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বাবুর্চিরা মাংস খাইত আর আমার জন্য একবাটি সবুজ রংএর পদার্থ (যাহাকে ইংরাজীতে Decoction বলা যাইতে পারে) আসিত। এই পৃথিবীতে সব কাজের জন্য মাশুল দিতে হয়, এখানে ঐ Decoction পান করাই ছিল আমার মাশুল দেওয়া। জীবনে সেই প্রথম ভেড়ার মাংসের ঐরূপ শোচনীয় ও অভাবনীয় রূপান্তর দেখিয়াছিলাম। খাইবার সময় যোগীদের কথা মনে মনে ভাবিতে হয়—"লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়!" লজ্জা তো ছিলই না—ঘৃণা ও ভয় থাকিলে ঐ পদার্থ গলাধঃকরণ করা অসম্ভব। অনুসন্ধানের পর জানা গেল, পাঠান পাচকেরা মাংস নিজেদের জন্য রাখিয়া নানা প্রকার পাতা সংগ্রহ করিয়া লবণ সংযোগে জলে সিদ্ধ করিয়া দিতেছে। ঐ অদ্ভুত খাদ্যটি দিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার এই বলিয়া শাসাইতেছে যে জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ গদি যেন ইহা জানিতে না পারেন। যদি তিনি জানেন তবে পরিণামে আমার কি হইবে কিছুই বলা যাইতেছে না। তাহারা মুখে উল্লেখ না করিলেও তাহাদের হাব-ভাবে বুঝিয়াছিলাম যে রাত্রে হয়ত এই অধমের গলা দ্বিখণ্ড হইয়া যাইতে পারে। পরে আরও নজার কথা শুনিয়াছিলাম ঐ হিন্দু পাচকটির নিকট হইতে। আসলে সমস্ত মাংস পাচকেরা নেয় না, তাহা যায় জেলর ও ডেপুটি জেলরের বাড়ীতে। সেই জন্যই এসব বিষয় অনুসন্ধান করা যাইত না। একবার ইদের দিন জেলর সাহেব সাধারণ কয়েদীর রান্না খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আমিও নির্ভয়ে তাহা গ্রহণ করিলাম। ভাগ্যিস গ্রহণ করিয়াছিলাম! সেই অপূর্ব্ব দুম্বা রোষ্ট ও পোলাও নানা প্রকার শুকনো ফলের ও ভেড়ার মাংসের সংযোগে! কি উপাদেয়ই না ছিল। এখনও, এতদিন পরেও তাহার আস্বাদ যেন জিহ্বায় পাইতেছি।

এবার বলি, জেলে সারাদিন ও সারারাত্র কিভাবে কাটিত। এই দিনপঞ্জিকা মনে হয় রাত্রের শয়ন হইতে শুরু করিতে পারিলেই ভাল।

রাত্রে শয়নের জায়গাটি একটি লম্বা ব্যারাকের মত ঘর। ঘরের মধ্যখান দিয়া একটি সরু রাস্তা আর এই রাস্তার দুই ধারে এঁটেল মাটির ছোট ছোট খোপ্। এক একটি খোপের দুইপাশে প্রায় চারফুট উঁচু মাটির দেওয়াল। দেওয়ালের দুই পাশে মাটির তৈরী বিছানা ও বালিশ। যখন কেহ জেলে ঢোকবার সুবর্ণ-সুযোগ পায় তখন তাহাকে এইরূপ একটি বিশ্রামাগার ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। এই সঙ্গে প্রত্যেক কয়েদীকে একটি করিয়া কম্বলও দেওয়া হইত। এ যে-সে কম্বল নয়। ইহার গুণ-কীর্ত্তণ করিলেই তাহার বিশেষত্ব বোঝা যাইবে।

বোধহয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে দিন হইতে তাহাদের নিজেদের দেশের "জেল" প্রথা এদেশে চালু করিয়াছিল সেই সময় এই কম্বল তৈরী হয়। কত শত শত কয়েদী যে এক-একটি কম্বল ব্যবহার করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কম্বলগুলি এমনভাবে তৈরী

UNIVERSITY

হইয়াছিল যাহাতে জীবনের প্রথমদিন হইতে শেষের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই কম্বল ব্যবহার করা চলে। ইহার তিনটি বিশেষত্ব ছিল। প্রথম, খুব সম্ভব এগুলি উটের রোঁয়া বা শুকরের কুচি দিয়া তৈরী ছিল। কেননা ইহা একটুও নোলায়েম নয়, ঠিক পাঠান রুটির মতই কর্কশ ও চিরস্থায়ী। দ্বিতীয় গন্ধ! যতজন পাঠান এই এক একটি কম্বল ব্যবহার করিয়াছে প্রত্যেক কম্বলে প্রত্যেক পাঠানের শরীরের বিশেষ গন্ধ থাকিয়া গিয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব দুর্গন্ধ! আমার তো মনে হয়, এ পর্য্যন্ত কেহ জন্মায় নাই যে এই গন্ধ বর্ণনা করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক কম্বলে শত শত উকুনের বাসা। আর সে উকুন একেবারে পাঠান-উকুন। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও তাহাদের আক্রমণের ভীষণতায় প্রত্যেক উকুনই ভয়াবহ। আকারে তাদের প্রত্যেকটি মটরের দানার মত। আমাদের দেশে উকুন যেমন নখের চাপে মারা যায়, তেমনি এই পাঠানী উকুনকে মারা সম্ভব নয়। ইহাকে মারিতে হইলে দুইটি পাথর প্রয়োজন। একটি পাথরের উপর উকুনটিকে রাখিয়া অন্য পাথর দিয়া আঘাত করিতে হইবে—তখন "পটাশ" করিয়া শব্দ হইবে ও সেই উকুনের মৃত্যু হইবে।

রাত্রিতে এই উকুন সমেত কম্বলের নীচে সুখ-নিদ্রার কথা তো বলা হইল। ইহার পর সকাল পাঁচটায় জেলের ঘন্টা বাজামাত্র সকলকে নিজ-নিজ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িতে হইল। (ক্রমশঃ)

34-3720

With the best Compliments from:—

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street

Calcutta-12

শ্রীঅরবিন্দায়ণ

নীরদবরণ

(শ্রীঅরবিন্দের সচিত্র জীবন, কর্ম ও সাধনা)

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য চার টাকা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

1975

It is the darkest nights that prepare the greatest dawn
—Sri Aurobindo

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers

149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)

Gram : UNIBOX **Phone :** 556735

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

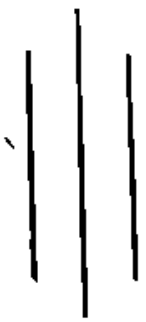

Howrah Iron and Steel Works (P.) Ltd.

90, BENARAS ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-2434

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field:
SREEPORE BAGHARGHOLE
P. O. BONHOOGHLY, 24 PARGANAS

Head Office:
34 I, Puddapukur Road
CALCUTTA 20

PHONE :

FOR
NEAT PRINTING
AND
QUICK SERVICE

Specialist in Colour Print

Please Contract :—

Mahamaya Press

2, Bhupendra Bose Ave., Cal-4

Phone : 55-9124

সাধক কবি নিশিকান্ত রচিত

কালজয়ী কাব্য

লীলাঞ্জন

ইন্দ্র দুগার অঙ্কিত আটখানি বহুবর্ণ চিত্র ও বিবিধ রেখাচিত্রে অলঙ্কৃত

পরিবেশনে :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশনী বিভাগ
পণ্ডিচেরী-২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

বিক্রয়কেন্দ্র :

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

একটি চিত্তাকর্ষক কাব্য গ্রন্থ
বাংলা সাহিত্যে একটি অভিনব সংযোজন—
মূল তামিল থেকে বাংলায় অনুবাদ—

আলবার পদাবলী

সমীরকান্ত গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনের পদাবলী, দক্ষিণাত্যে তামিলদেশে তেমনি আলবারদের 'প্রবন্ধম্' বা পদাবলীর সমার্থক শব্দমালা। যে-কয়জন আলবারের পদসংগ্রহ এই গ্রন্থে তাঁরা হলেন—

তিরুমঙ্গৈ আলবার　　পেরিয়ালবার
কুলশেখরণ আলবার　　অণ্ডাল　　নম্মালবার

বঙ্গানুবাদের ভাষা, তার লালিত্য, শব্দযোজনা, ধ্বনিঝঙ্কার, মন্ত্রধ্বনিমুখর কাব্যশৈলী পাঠকদের মুগ্ধ করবে।

মূল্য : দশ টাকা

—প্রকাশক—
শৃঙ্খল
৬৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বাণী বহ
একমাত্র আধ্যাত্মিক মাসিক পত্রিকা

শৃণ্বন্তু

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রতি সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ

★ শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের ধারাবাহিক অনুবাদ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

★ শ্রীঅরবিন্দের কাব্য সাহিত্য দর্শন সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তামূলক একাধিক গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ।

★ শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ জীবনালেখ্য
"ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ"—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

★ দৈনন্দিন সমস্যাপীড়িত জীবনের পথে দিশারী ও প্রেরণাস্বরূপ শ্রীমায়ের বাণী ও মায়ের আলাপ।

বার্ষিক চাঁদা (সডাক) দশ টাকা।
বৈশাখ সংখ্যা হইতে বর্ষ আরম্ভ।
বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

যোগাযোগের ঠিকানা

শৃণ্বন্তু
৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ
জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

(আগষ্ট ১৫, ১৯৭২)

সম্পূর্ণ রচনাবলী

ইংরাজীতে : ৩০ খণ্ডে সম্পূর্ণ
সুশোভন রাজ সংস্করণ—১০০৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)
সুলভ সংস্করণ—৭৫৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)

বাংলায় : শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলায় রচিত (গীতার ভূমিকা, ধর্ম ও জাতীয়তা, কারাকাহিনী, পত্রাবলী, বিবিধ রচনাদি) দুর্লভ খণ্ড সহ অন্যান্য রচনার নয় খণ্ডে অনুবাদ। ১৬৲ টাকা

আঞ্চলিক ভাষা
হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠি, ওড়িয়াতেও অনুবাদ

বুক সেলস্ ডিপার্টমেন্ট, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৯৭৫

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

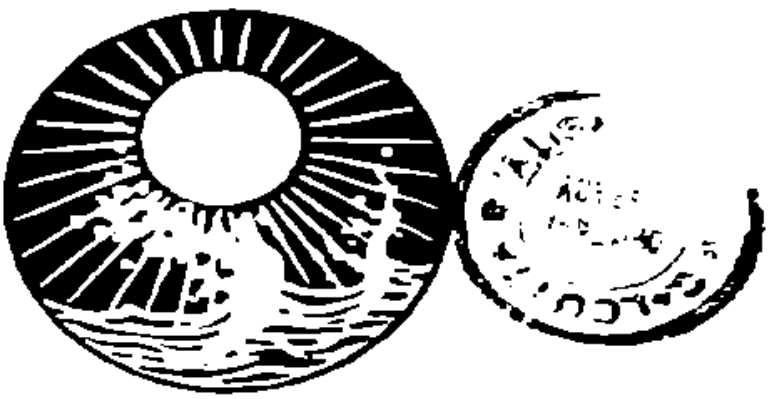

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাবিত্রী	...
মধুময়ী মা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
বেদমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী	...
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা
বসুধার ভাষণ	বীণা মিত্র
বেদের কাব্যভাবনা	রণজিৎ সরকার
খেলার মাঠে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের প্রতি	শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
মোহনা	সুমিত্রা রায়
চরণদাত্রী	দিলীপকুমার রায়
জননী	রমেন সেনগুপ্ত
ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি	শ্রীঅরবিন্দ
কঠিন ডানায় ওড়া	বীরবাহু

বন্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৪২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: **Nolini Kanta Gupta**
Published by: Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by: Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

Catch up the
work and have faith
We have all
come in together
with the next, and
you & Catherine & Agnes
on your faith and
confidence

Love and blessings
T.

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

২য় পর্ব—১১শ সর্গ

বৃহত্তর মনোময় লোক এবং তাদের দেবতাবৃন্দ

(২)

সুশৃঙ্খল চিন্তাবৃত্তির ত্রিধারাজ্য এল সর্বপ্রথমে,
বিপুল আরোহণের ক্ষুদ্র সূত্রপাত :
ঊর্ধ্বে রয়েছে মানসের উজ্জ্বল সূক্ষ্মতর আকাশ যত,
পুঞ্জীভূত অন্তহীন উঠে চলেছে, আকাশের পর আকাশ যেন চেপে রয়েছে—
পিছনে নির্ভর আলোয় প্রাচীর মহাশূন্যকে ঘিরে ;
ঊর্ধ্বতম চায় উঠে যেতে শাশ্বতের সান্নীপ্যে,
বৃহত্তম হয় প্রসারিত আনন্ত্যের মধ্যে।
অমর তারা, বিপুল, দেবধর্মী,
প্রখর রাজ্যসব তবু মানুষী মনের নিকট স্বজাতি ;
এখানকার দেবতারা আমাদের বৃহত্তর চিন্তাধারা গড়ে তোলে,
তাদের শক্তির অংশ তবু হতে পারে আমাদের সম্পদ :
এই সব প্রসার অতিপ্রসার নয় আমাদের অন্তরাত্মার পরিক্রমাতরে,
এই সব উচ্চশিখর অতি-উচ্চ নয় মানুষী আশার পক্ষে।
ত্রিধা সোপান নিয়ে চলে এই ত্রিধা জগতে।
সাধারণ সামর্থ্যের পক্ষে একান্ত ঋজু এই ঊর্ধ্বগামী পথ,
চেয়ে রয় তবু সে আমাদের এই পার্থিব স্থিতির পরে :
চালু পথ, নেমে যায়নি সোজা খাড়া খাদের মত
ফিরে আসা যায় যতই গভীরতর তলে যাত্রা হোক না
মর্ত্যের বিশ্বের সঙ্গে রেখে আদান-প্রদান।
আরোহণী সোপানশ্রেণীর মহাবলী সাধ্বীদল
সংযোগ রেখেছে বিশ্বস্রষ্টা বাক্‌শক্তির সঙ্গে,
অপেক্ষায় রয়েছে তারা স্বর্গমুখী তীর্থযাত্রী অন্তঃপুরুষের তরে ;
তাদেরই কাছে রয়েছে পরাৎপরের সন্ধানমন্ত্র যত,
ঊর্ধ্বায়নী মনের কাছে এনে ধরে তাদের দিব্যজ্ঞান,

জীবনকে ভরে দেয় চিন্তাধারার বৈপুল্য সব দিয়ে।
গুপ্তবিধির তারা হল উদ্‌গাতা পুরোহিত,
দিব্যসত্যের প্রজ্বলিত সিন্ধুসংঘ,
ভগবান আর মানুষী মনের মাঝে তারা হল দূত বাণীবহ,
অমর বহ্নিকে তারা নিয়ে আসে মর্ত্য-মানুষের কাছে।
প্রস্ফুরন্ত, অদৃশ্যকে দেয় তারা রূপ,
শাশ্বতের প্রোজ্জ্বল ক্রমধারায় রক্ষী তারা—
জ্যোতির্ময় বাহিনী তাদের রয়েছে দাঁড়ায়ে সূর্যের সম্মুখে।
দূর হতে মনে হয় তারা যেন প্রতীক ছবি এক;
ছায়াময় লিপির মূল দীপ্ত রেখা,
আমাদেরই দৃষ্টি এঁকেছে তাদের, ধরে দিয়েছে অন্তঃভাবময় কিরণরেখা;
অথবা তারা দেবনুতি আকার দিয়েছে গুপ্তসত্যকে,
তবে আরও নিকটে তারা হল দেববৃন্দ আর জাগ্রত বিভূতি সব।
মূর্তিমালার প্রবাহ অঙ্কিত রয়েছে নিম্নতর ধাপে;
অদ্ভুত ভঙ্গিতে অলঙ্কৃত ক্ষুদ্র পরিসর সমৃদ্ধিপূর্ণ,
ধারণ করেছে তবু তারা সারা এক জগতের অখণ্ড অর্থ,
পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতীক যত তার পূর্ণ পারিপাট্যের পুলক,
প্রকৃতির শক্তি যত জীবন্ত হয়েছে অভিনব পশুরূপে,
মানুষ জেগেছে, বিস্মিত নয়নে দেখে আপন কর্মধারা,
হয়ে উঠেছে সে ভগবানের নিষ্কলঙ্ক প্রতিমা
আর বস্তুরাজি যত নিখাদমুদ্রা সুন্দরের রাজত্বে;
বৃহৎ প্রসারিত ক্ষেত্র এসব যেখানে তারা সেবাব্রত নিয়ে।
এই যে উদ্ভাসনের উর্ধ্বারন সম্মুখে তার
রয়েছে কত বিশ্বকালের দিব্যভোগী যত, বিশ্ব-রভসের প্রিয়পাত্র,
স্থূল বাস্তবের অধিপতি, চলমান মুহূর্তের নিয়ামক,
তরুণ প্রকৃতির সাথী, শিশু ভগবান;
প্রকৃতির স্রষ্টা তারা মনোময় পুরুষের প্রচ্ছন্ন প্রবেগে,
তারই সূক্ষ্ম চিন্তারাজি ধারণ করে রয় অচেতন প্রাণসত্তা—
চালনা করে একান্ত জড় ঘটনাবলীর খেয়াল যত,
দাঁড়িয়ে তারা তীক্ষ্ণদৃষ্টি তরুণ দেবসঙ্ঘ এক,
রাজকুমার তারা জন্ম তাদের মহাজ্ঞানের আদিস্তরে—
তারই শিক্ষাধীনে শিখেছে তারা জগৎ-রচনার লোকাতীত লীলা।
মুখ্য রাজমিস্ত্রী যত সনাতন যাদুকর্তার

ঠেলে গড়ে মেপে চলে খণ্ডিত আকাশ,
গুপ্ত এবং ব্যক্ত যা কিছু তাদের পরিকল্পনায়
হবে অদৃশ্য রাজপুরুষের আপন আবাস-ভবন।
শুনেছে তারা শাশ্বতের গভীর অনুজ্ঞা
তাই গড়েছে সৃষ্টির এই জড় মুখোস
এই সুবিস্তৃত পার্থিব বাল-নিকেতন তরুণ জীবাত্মার তরে :
শিশু-চেতনা শিক্ষালাভ করে মনের ও ইন্দ্রিয়ের সহায়ে
পাঠ করে তারা বিশ্বলিপির বর্ণমালা,
করে পরিশীলন বিশ্ব-আত্মার এই দেহ,
করে অনুসন্ধান নিহিত অর্থ সকলের।
চিৎ-পুরুষ যা কিছু উদ্ভাবন করে তার তরে আধার এক
প্রকৃতির মধ্যে এনে দেয় বাহ্য হাবভাব,
অনন্তের সব রূপকে দেয় তার সান্ত আকার।
অব্যক্ত হতে সবেগে নেমে আসে শক্তি যত
ত্যাগ ক'রে চিরন্তনের বৃহৎ শান্তি
তারা অধিকার করে, ধরে থাকে তাদের অভ্রান্ত দৃষ্টিযোগে,
গড়ে তোলে নর্তকীনৃত্তি বিশ্ব-নর্তনে :
তার অবাধ খেয়াল বেঁধে রাখে তারা ছন্দের নিয়মে
জোর করে তার উপরে চাপিয়ে দেয়
সুশৃঙ্খল বিশ্বের যাদুরচনায় আপন অঙ্গভঙ্গি আর রেখাবলী।
সর্বগ্রাহী গৃহীত রূপের মধ্যে,
একত্ব বিচ্ছিন্ন হয়েছে গণনীয় খণ্ডে যত,
সীমাহারা হয়েছে বিশ্বব্যাপক যোগফল :
অশেষ আকাশ সঙ্কুচিত করা হয়েছে বৃত্তাংশে এক,
অবিভাজ্য কাল কেটে কেটে ক্ষুদ্র নিমেষে ভাগ করা হয়েছে,
অণুতমকে পুঞ্জীভূত করা হয়েছে অক্ষত যাতে রয়ে যায়
রূপধারী অরূপের মহারহস্য।
অব্যর্থ তাদের কারিগরি, উদ্ভাবন করেছে প্রয়োগের জন্য
সংখ্যা-পারম্পর্যের যাদু আর চিহ্নাবলীর কৃহক,
রেখাচিত্রের অলৌকিক সামর্থ্য ধরা হয়েছে
সৌন্দর্যে অর্থে ভরে দিয়ে,
তাদের অনিমেষ দৃষ্টির অবিচল নির্বন্ধে
রূপ আর গুণ সমান হয়ে

মিশে যায় অখণ্ডনীয় একত্বে।
প্রতি ঘটনার পরে এঁকে দেয় তারা বিধিলিপি তার
বহন করে যে বার্তা আর ঘটনাক্রমের ভার;
নয় সে আর মুক্ত দিব্য কর্ম এক
প্রতি মুহূর্ত স্বেচ্ছাকৃত, নয় অন্তঃপুরুষের অভিযান,
এখন সে অবিকল্প পরিকল্পনার পূর্বনির্দিষ্ট রেখাধারা
প্রলম্বিত করে চলেছে অদৃষ্টবদ্ধ অলৌকিক শৃঙ্খল এক,
আরো একটি পদক্ষেপ নিয়তির সুদীর্ঘ পথযাত্রার।
প্রত্যেক উদ্‌গ্রীব শক্তির একটা সীমা ধরে দেওয়া হয়েছিল
বিশ্বকে আপন কুক্ষিগত করবার আকাঙ্ক্ষা বেঁধে রাখবার জন্য;
প্রতি শক্তির প্রতিক্রিয়ার জন্য পাথরে খোদাই পথ যেন কেটে রাখা হয়েছিল
প্রতি মুহূর্তকে দেখান হয়েছিল তার নির্দিষ্ট স্থান
ভবিষ্যদ্রষ্টা ইচ্ছা এক স্থির করে রেখেছে হেথায়
এই যে সরীসৃপধারা বিপুল মহাকাল-বলয় পলায়নপর শাশ্বত হতে।
অপরিহার্য চিন্তাবৃত্তি তাদের শৃঙ্খলগ্রন্থি যেন নিয়তির
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে মানসের দ্রুতগতি আর বিদ্যুৎবেগের উপরে,
জীবনের চপল চঞ্চল প্রবাহের উপরে
আর অণু-পরমাণুরাজির সেই স্বাতন্ত্র্যের উপরে
যেখানে অচল কারণ আর অটুট কার্য।
মূলভাব পরিহার করেছে তার আনন্ত্যের নিত্য নব রূপায়ণ—
স্বভাবজ ধর্ম তার—এখন সে কেটে চলে
ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন সোপানক্রম একই ক্ষেত্রে শৃঙ্খলবদ্ধ যেন:
ছিল যে অমর এখন আবদ্ধ জন্মে আর অস্তিত্বে,
বিচ্ছিন্ন সে অভ্রান্ত দৃষ্টির সাক্ষাৎ প্রত্যয় হতে,
জ্ঞান তার নূতন করে গড়া হয়েছে অনুমানের কোষ থেকে
ঢেলে দেওয়া হয়েছে রূপের মধ্যে—স্থিরবদ্ধ দেহ এক হীনবল নশ্বর;
বদ্ধ এভাবে গড়ে ওঠে সে, চিরস্থায়ী হয় না, ভেঙে পড়ে অবশেষে
স্থান করে দেয় আর এক নব দেহ, চিন্তার তরে।
আনন্ত্যের বিপুলাক্ষী দেবলোকবাসী চিন্তাদের জন্য পিঞ্জর এক
বদ্ধ তার চারিদিকে বিশ্ববিধানের আঁকাবাঁকা লৌহজালে,
সীমিত দিক্‌-বলয়ের প্রাচীর তুলে দিয়ে
রুদ্ধ করে রেখেছে অনির্বচনীয়ের দর্শন বর্ণবৈভব।
কালাতীত চেতনা হয়েছে এখন নিবেষের ক্রীতদাস;

বন্ধনহীন এখন নিক্ষিপ্ত জন্মের কারাগৃহে
মনের পক্ষে সৃষ্টি সহজগ্রাহ্য এবং সহজে নিয়ন্ত্রিত হবে বলে।
এই যে পৃথিবী চেয়ে রয় সহস্র সূর্যের দিকে
এখানে সৃষ্টজীব হয়ে উঠবে প্রকৃতির ঈশ্বর,
জড়ের গহ্বর হবে উদ্ভাসিত অন্তরাত্মার আলোকে ;
ওই সব সত্তারা নির্দিষ্ট ক্ষণে আকারে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বেঁধে রেখেছে
অদ্বিতীয়ের অগণিত রহস্যপূর্ণ গতিধারাকে।

মধুময়ী মা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

( )

আজ আমাকে মায়ের সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে, তাই না? মায়ের জীবনের একটুখানি কিংবা তাঁর কাজকর্মের কিছু?

বেশ! মায়ের জীবনের প্রথম অংশটুকু, তোমরা ত জানই, মা কাটিয়েছেন ফরাসী-দেশে, তাঁর জন্ম হয়েছিল ফরাসীদেশে, প্যারিস সহরে। সেজন্য, স্বভাবতঃই তাঁকে মাঝে মাঝে কেউ কেউ মনে করিয়ে দিতেন যে তিনি ফরাসী, পাশ্চাত্যদেশবাসিনী। মা কিন্তু তাতে সর্ব্বদাই প্রতিবাদ করতেন, বলতেন "আমি ইউরোপীয় নই, আমি ফরাসী নই।" শুনতে অবাক লাগে যে তাঁর পরিবার সত্যিই এসেছিল মিশরদেশ থেকে। তাঁর বাবা-মা ফরাসীদেশে যান তাঁর জন্মের ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে—মাত্র এক বৎসর। আর মিশর-দেশেও আবার তাঁর পরিবার এসেছিল তথাকার এক অতি প্রাচীন বংশধারা থেকে—সম্ভবতঃ মিশরের এক রাজপরিবার থেকে, কারাও রাজবংশ। কাজেই, রক্তের দিক থেকে তিনি ইউরোপীয় বা ফরাসী নন, যদিও ফরাসী হিসাবেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা। ঠিকঠিক হিসাব করলে দেখা যায় তিনি এসেছেন মধ্যপ্রাচ্য থেকে অর্থাৎ যেখানে পূর্ব্ব ইউরোপ আর পশ্চিম এশিয়া মিলেছে। তার অর্থ ইউরোপ ও এশিয়ার মিলন—দুয়ের সঙ্গতি এবং এতেই প্রতিফলিত হয় মায়ের জীবনের প্রকৃতি ও ভবিতব্য।

যা বলছিলাম, তাঁর জীবনের প্রথম অংশটা মা ফরাসীদেশে কাটিয়েছেন। কিন্তু ফরাসীদেশে কেন? এ নির্ব্বাচনের অর্থ আছে। সে অর্থ আমরা এখন জানি, তাঁর জীবনের মূল অর্থ—তাঁর লক্ষ্যের, তাঁর কর্ম্মের অর্থ। তিনি এসেছিলেন একটি নূতন আলোক নামিয়ে আনতে এখানে। তিনি চেয়েছিলেন এক নূতন জগৎ, তার পুরাতন প্রকৃতি তার পুরাতন সংস্কৃতি সহ এই পুরাতন জগৎ নয়, একটা নূতন জগৎ, এক নূতন মানব-জাতি। তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সেই নূতন আলোক যার কর্ম্ম হল মানুষকে ও পৃথিবীকে নূতন করে সৃষ্টি করা, তাকে নূতন রূপ দেওয়া। সেই নূতন মানুষের সঙ্গে ফরাসী-দেশের কি সম্বন্ধ? নূতন আলোককে যদি নেমে আসতে হয়, আত্মপ্রকাশ করতে হয়, তবে, প্রথমে তাকে গ্রহণ করতে হবে তোমার মনে অর্থাৎ তোমাকে দেখতে ও স্বীকার করতে হবে যে এ নূতন আলো এবং তার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে হবে। মন হল মানুষের আধারে প্রথম বা সর্ব্বোচ্চ গ্রহণক্ষম অংশ। তোমাদের হয়ত মনে আছে ধর্ম্মপদের আরম্ভেই প্রথম ছত্রটি—তাতে বুদ্ধের শিক্ষার সারার্থ দেওয়া হয়েছে—"মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা" মন মানুষের সকল কর্ম্মের মধ্যে প্রথম। মন আর সবকিছুকে অতিক্রম করে যায়, মন সকলকে ধরে

ও ঘিরে রাখে। যা বলছিলাম, এই যে আলো তা যখন নেমে আসে এবং তোমার মধ্যে প্রবেশ করে, প্রথম তা স্পর্শ করে যে বস্তুটি তা হল তোমার মাথা অর্থাৎ তোমার মন : তুমি তাকে দেখ, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হও। বর্ত্তমানে ফরাসীদেশ হল মানবজাতির শ্রেষ্ঠ মানসের প্রতিভূ, তার সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশের সর্ব্বোত্তম প্রকাশ। মা সেখানে জন্ম নিয়েছিলেন যাতে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ মানস তাঁর মধ্য দিয়ে এই নূতন আলোক গ্রহণ করতে পারে। সেখানে তিনি বাস করেছেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে—বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, কবি, সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোত্তম রুচির ও স্তরের মানুষেরা সব। তিনি সেখানে ছিলেন যাতে তাঁর সংস্পর্শ ও সাহচর্য্যের মাধ্যমে তাদের মধ্যে নূতন আলোক নামিয়ে আনতে পারেন। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি একটি সমিতি, বরং একটা দল বলা যায়, গড়েছিলেন—তার নাম দেওয়া হয়েছিল "Le Cosmique"। Cosmique অর্থ সমগ্র বিশ্ব, অন্যকথায় বলা চলে তিনি যা করছিলেন, তিনি যা দিচ্ছিলেন তা সকল মানুষের জন্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জন্য, প্রত্যেকের জন্য। এ ছাড়াও এর অর্থ—বিশ্ব বা সার্ব্বভৌম চেতনা। মা সর্ব্বোচ্চ মানস পরিণতির সহায়ে একটা নূতন ধরনের মানস জগৎ সৃষ্টি করছিলেন আরও বৃহত্তর মনে পৌঁছানর জন্যে—ব্যক্তির অহংকেন্দ্রিক মনের অতীতে তা। আগেই বলেছি, মন বা মস্তিষ্ক মানুষের সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ, তাই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে সহজ নূতন আলোক সর্ব্বাগ্রে তার মস্তিষ্কে গ্রহণ করা। এই প্রসঙ্গে তোমাদের মনে পড়তে পারে শ্রীঅরবিন্দের সেই কবিতাটি "The Golden Light" : কেমন করে ঊর্দ্ধ হতে তা নেমে আসে এবং প্রথমে প্রবেশ করে মাথায় অর্থাৎ মস্তিষ্কে। তা আলোকিত করে তোলে তোমার চিন্তা, তোমার বোঝবার সামর্থ্যকে পরিণত করে ধরে, তাকে প্রসারিত গভীরতর ও শাণিত করে ধরে। কিন্তু বোঝবার ক্ষমতাই যথেষ্ট নয়, তাকে ভালবাসতে হবে, তখনই কেবল তাকে তুমি অধিগত করতে পারবে। সুতরাং সোনার আলো প্রবেশ করে তোমার হৃদয়ে। তারপর তা অগ্রসর হয়ে আরও নিম্নে নেমে চলে আরও স্থূল ও সক্রিয় প্রকাশের জন্য, তা প্রবেশ করে তোমার প্রাণের স্তরে—আমাদের নামকরণ অনুযায়ী। শেষে, সোনার আলো প্রবেশ করে তোমার চরণে অর্থাৎ তোমার শারীর অঙ্গ সব অধিকার করে, তা হয়ে ওঠে স্থূল ও জড়দেহী, যেন নিয়েট হয়ে প্রমূর্ত্ত হয় তোমার দেহাধারেই—তা গড়ে তোলে "সুন্দর তনু" তোমার।

মা এমনি করেই সোনালী আলো নামিয়ে আনেন মানবজাতির মাথায়, তার চেতনার সর্ব্বোচ্চ শিখরে এবং এই হল সেই দীক্ষা, মানুষের দীক্ষা ভাগবত জীবনে—এই কাজই তিনি শুরু করেছিলেন ফরাসীদেশে। ফরাসীদেশ থেকে মা যান জাপানে—তাঁর কর্ম্মের পরের পর্য্যায়টির জন্য। জাপানে এলেন মা, সুদূর প্রাচ্যে। পাঁচ বৎসর কাটালেন তিনি সেখানে। সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর। জাপান জেন্‌পন্থী ধ্যানের দেশ; এই পন্থা আন্তরচেতনায় প্রবেশ করবার এক বিশেষ পন্থা—আন্তর চেতনা অর্থ যুক্তিসিদ্ধ মানস চেতনা নয়, এ হল আরও স্পর্শানু সূক্ষ্ম এক গুহ্যলোকে দৃষ্টিনিবেশ করা। জাতি হিসাবে জাপানীরা

সত্যই এক অতি স্পর্শালু ও এক শিল্পরুচিময় প্রাণশক্তির প্রতীক—যে প্রাণশক্তি চায় শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য জীবনে, জীবনযাত্রার ধরনে। সোনার আলো যাতে জড়জগতে আত্মপ্রকাশ করতে, লীলায়িত হতে পারে, যাতে তার দেহাধার অধিকার করতে পারে, তার জন্য, তাকে গ্রহণ ও ধারণ করার জন্য এমনি প্রাণশক্তিরই প্রয়োজন। জাপানী কুস্তিগীরেরা তাদের প্রাণিক সামর্থ্যের জন্য সুপরিচিত। সংহত সামর্থ্য তাদের প্রায় সকলেরই আছে—তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে, ছবিতেও অন্ততঃ, একটি সুপুষ্ট ভুঁড়ি এবং তাদের ধারণা যে এটি তাদের প্রাণশক্তির ভাণ্ডার। তার অর্থ নয়, আমি তোমাদের ভুঁড়ি বাগাতে বলছি, বরং ঠিক তার উল্টো। তবে, শারীর ক্রিয়াকর্মেও নিছক দৈহিক সামর্থ্যের চেয়ে প্রাণ-সামর্থ্য বেশি প্রয়োজন। হাঁ, জাপানীদের আছে এই প্রাণশক্তি যা সবল, সংহত, সুশৃঙ্খল স্পর্শালু। মায়ের দুটি একটি প্রার্থনা মনে আছে হয়ত তোমাদের—তাঁর "ধ্যান ও প্রার্থনায়"। মা বলছেন চেরীফুলের গুচ্ছের কথা ; তা একটা প্রতীক—জাপানী সৌন্দর্য্য-বোধের, তাদের সৌন্দর্য্য-প্রীতির, একটা পরিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়বোধের : অমার্জিত স্থূল উদ্দাম (নিম্ন) প্রাণ নয়, সুমার্জিত সুখময় অন্তরঙ্গ অনুভব, সঙ্গতিপূর্ণ সুখবোধ—চেরীফুলের গুচ্ছ অর্থ তাই। মা তাঁর আর একটি সূক্ষ্মদর্শনেও বর্ণনা করেছেন—সুন্দর চিত্র একখানি যেন—এক জাপানী মা ও তার শিশুটি। এ হল সেই নতুন শিশু যে মানবজাতির মধ্যে জন্ম নিয়েছে। সকল পৃথিবীর জন্য, এই চেরীগুচ্ছের দেশে একটি নূতন জগতের অনুপ্রবেশ ঘটান হল এমনি করে।

মা হলেন সৃষ্টিময়ী চেতনা, যেখানেই থাকুন তিনি, যেখানেই ডাক পড়ুক তাঁর, তাঁর উপস্থিতি অর্থই সৃষ্টির বেগ, তা সৃষ্টি করে চলে নূতন জগৎ, সত্তায় ও চেতনার নূতন দিক, স্থান কাল পাত্র অনুসারে। এবং একটা সমগ্র জগৎই তিনি সৃষ্টি করেন এবং তা রয়ে যায়, কারণ এ হল মানুষীসত্তার বিবর্ত্তনে নূতন কৃতি কিছু।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, এক পরিচ্ছন্ন সবল সুশৃঙ্খল প্রাণজগৎ, যার কথা আমরা বলছিলাম, তার নিজের প্রয়োজন একটি উপযুক্ত সক্ষম দেহ যা তাকে ধারণ ও রূপায়িত করতে পারবে। সোনার আলোকে অবশ্যই চরণেও নামতে হবে। এবং সেই কাজটিই মা এখানে করছিলেন, তার জন্যই মা এই আশ্রম সৃষ্টি করেছেন। তোমরা সবাই জান, শারীর শিক্ষার উপর মা বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, এর উদ্দেশ্য দেহ ও ইন্দ্রিয়দের প্রস্তুত করে তোলা যাতে তারা সোনার আলো গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। তিনি সর্ব্বদাই বলতেন শারীর শিক্ষা নূতন চেতনার নূতন আলোকের ভিত গড়ে দেয়—আমাদের পেতেই হবে সবল দেহ, সুন্দর তনু—যে দেহ সহনক্ষম : কারণ নূতন আলো শক্তিময়, তা নিছক জ্যোতিই নয়, তা আবার শক্তিও, তাকে সহ্য করবার সামর্থ্য চাই এবং চাই সামর্থ্য তার নির্দ্দেশ পালন করে চলবার।

বাস্তবিকই, তিনি এখানে এসেছিলেন এই ভাগবত জ্যোতিকে আকার দিতে, একটা স্থূল শারীর রূপ দিতে, দিতে একটা পার্থিব দেহ। এই সুন্দর দেহই কিন্তু শেষ কথা বা

নিছক তাতেই শেষ সার্থকতা নয়; এ সুন্দর দেহ পেতে হলে পেতে হবে সুন্দর প্রাণ। শুধু তাই নয়, দেহে ও প্রাণে পরিপূর্ণ সিদ্ধির জন্য আমার চাই সুন্দর মন। মা এখানে শারীর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন আমাদের জন্য সুন্দর দেহ গড়ে তুলতে। আর এই বিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন মনের অনুশীলনের জন্য। কিন্তু মনের অনুশীলন মানে নয় বিবিধ বিষয়ে যত সংবাদ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করা—বই পড়া শুধু: মনের অনুশীলন অর্থ মনকে, মানস উপাদানটিকেই পরিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ করে তোলা, চেতনার একটা ঊর্দ্ধায়ন যাতে নূতন আলোকের আস্পৃহা জাগে এবং তাকে সে চিনতে পারে। আমি বলেছি নূতন আলো প্রথমে তোমায় গ্রহণ করতে হবে তোমার মস্তিকে কিন্তু তোমার হৃদয়েও তাকে গ্রহণ করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে সক্রিয় কর্ম্মে তোমার প্রাণশক্তি দিয়ে। শুধু তাকে দেখলে বা চিনলেই যথেষ্ট নয়, তাকে ভালবাস, তার প্রতি অনুগত হও, অনুরক্ত হও। এবং এইখানেই মায়ের মূল কর্ম্ম, আমাদের জন্য তাঁর বিশেষ করুণার উপহার। তুমি যখন কোন কিছু ভালবাস, তুমি তা বাস, আমরা যেমন বলি, হৃদয় দিয়ে, কিন্তু ভালবাসার ওপারেও ভালবাসা আছে, যেমন আছে হৃদয়ের গভীরে হৃদয় এক। প্রকৃত ভালবাসা, যে ভালবাসা দিব্য তা থাকে এই আন্তর হৃদয়ে, তোমার অন্তরাত্মায়, তোমার মধ্যে সত্য সত্তা বা ব্যক্তি, তার মধ্যে—আর এই আত্মার বাইরে আসা, সামনে আসা—আমাদের ভাষায়—সে হল মায়ের বিশেষ করুণা, তার ভালবাসার দান তোমাদের সকলের জন্যে, এখানে যারা রয়েছ তাদের প্রত্যেকের জন্য। মা তোমাদের প্রত্যেককে দিয়েছেন তার অন্তরাত্মা। আমি প্রায়ই বলে থাকি যে আমাদের প্রত্যেকের জন্য এ এক বিশেষ সৌভাগ্য, কারণ তোমরা প্রত্যেকে বহন করছ এই সত্তাটিকে, এই আন্তর সত্তাকে, এই অন্তরঙ্গ ব্যক্তিস্বরূপকে, এই দিব্যশিশুটিকে—যে রয়েছে তোমাদেরই অন্তরে। এই বস্তুই তোমার দিব্য ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে, পরিশেষে এ-ই তোমাকে দেবে সুন্দর মন, সুন্দর প্রাণ, সুন্দর দেহ—দেবে যা কিছু প্রয়োজন তোমার, এই পৃথিবীতে তোমার জীবনে যা কিছু নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তোমাদের অনেকেরই মনে আছে হয়ত—মায়ের নিজের কণ্ঠে শোনা "সাবিত্রী"র সেই বিখ্যাত লাইনটি

Built is the golden tower, the Flame-child born.

নূতন জীবনের এই নূতন মিনার মা গড়ে দিয়েছেন, দিব্য শিশুও রয়েছে সেখানে—সোনার শিশু। এই সোনার শিশু রয়েছে তোমাদের প্রত্যেকের অন্তরে। তাকে আবিষ্কার করতে হবে, চিনে নিতে হবে—তাই হল তোমার জীবনের লক্ষ্য, তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম, পৃথিবীর বুকে যা কিছু তুমি করতে ও হতে চাও, সে সবেরই সার্থকতা। তোমরা কেউ কেউ নিশ্চয়ই নিজের মধ্যে এই দিব্যশিশুর উপস্থিতি অনুভব করে থাকবে। অনেকে তাকে দেখে থাকবে এমনকি তোমার অন্তরের ভাগবত শিশু হিসেবে। এসব জিনিষ—আবির্ভাব বলা হয় তাদের—সাধারণতঃ আসে স্বপ্নের মধ্যে। অন্ততঃ আমি কয়েকজনকে জানি যারা তা দেখেছে, তারা আমার কাছে এসে বলেছে তাদের অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা। এ সম্ভাবনা খোলা আছে সকলেরই জন্য এবং যদি তাকে দেখতে পাও, তাকে চিনতে হবে

তোমায়, ধরে রাখতে হবে, অধিকার করতে হবে তোমার ভালবাসা ও প্রীতি দিয়ে। মা আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান এখনও, এখনও কাজ করে চলেছেন তেমনি, তাঁর সান্নীপ্য তেমনিই রয়েছে—সম্পূর্ণ স্পর্শগ্রাহ্যরূপেই, কারণ তোমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরে রয়েছে সেই দিব্য শিশু।

আমি শেষ করি একটি প্রার্থনা দিয়ে—আমাদের খেলার মাঠের ছোট্ট শিশুদের হয়ে এ প্রার্থনা আমি মায়ের কাছে করেছিলাম :

"মধুময়ী মা, তোমার খেলার মাঠের শিশুরা সব দেবদূত। তারা দেবতা বা দেব-ভাবের হয়ে ওঠেনি, তাহলেও তারা সব দেবদূত, এই পৃথিবীর দেবদূত। তুমি সর্ব্বদা তাদের তোমার দৃষ্টির মধ্যে রাখ, তোমার মধুর চেতনার মধ্যে তুমি তাদের দোল দাও।"

এই প্রার্থনাই তোমাদের হয়ে আমি মায়ের কাছে করেছিলাম এবং আমি সুনিশ্চিত তিনি উত্তর দিয়েছেন—"তাই হবে"।

পুনর্দর্শনায়

৪-৪-৭৫এ কথিত
৭-৫-৭৫এ লিখিত
১১-৫-৭৫এ পঠিত

বেদমন্ত্র

ঋষি অত্রির অগ্নিমন্ত্র

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৫ম মণ্ডল—২২শ সূক্ত

প্র বিশ্বসামন্নত্রিবদর্চা পাবকশোচিষে।
যো অধ্বরেষ্বীড্যো হোতা মন্দ্রতমো বিশি ॥১॥

প্র—অভিমুখে
বিশ্বসামন্—হে বিশ্বশান্তিময়
অত্রি-বৎ—অত্রির মত, ভোক্তারূপে
অর্চ—দীপ্তময় গাও
পাবকশোচিষে—শুদ্ধিকর জ্যোতির্ময়ের উদ্দেশ্যে
যঃ—যিনি
অধ্বরেষু—যজ্ঞযাত্রায়
ঈড্যঃ—পূজার্হ, সম্পূজ্য
হোতা—দেবতাদের আহ্বাতা
মন্দ্রতমঃ—পরম উল্লাসময়
বিশি—মানুষের মধ্যে

বিশ্বশান্তি তোমার মধ্যে, ভোক্তারূপে গাও তুমি দীপ্তময়, শুদ্ধিদাতা অনন্ত দেবের উদ্দেশ্যে যিনি আমাদের সকল যজ্ঞযাত্রায় সম্পূজিত, দেবতাদের আহ্বায়ক, যিনি মানুষের অন্তরে পরম হ্লাদরূপে স্থিত ॥১॥

ন্যগ্নিং জাতবেদসং দধাতা দেবমৃত্বিজম্।
প্র যজ্ঞ এত্বানুষগদ্যা দেবব্যচস্তমঃ ॥২॥

নি—অন্তরে
অগ্নিম্—অগ্নিকে
জাতবেদসম্—জন্মজন্মান্তরের জ্ঞাতা
দধাত—স্থাপন কর
দেবম্—দেবতাকে
ঋত্বিজম্—যথাঋতু যজ্ঞ করেন যিনি তাঁকে
বচঃ—বাক্য

প্র—সম্মুখে
যজ্ঞঃ—যজ্ঞ
এতু—চলে যেন
আনুষক—নিরন্তর
অদ্য—আজ
দেবব্যচঃ-তনঃ—দেবতাদের পরম প্রকাশ যেখানে

অগ্নিকে অন্তরে ধারণ কর, সকল জন্মের জ্ঞাতা তিনি, দেবতা তিনি, ঋতু অনুসারে যজ্ঞ করে চলেন, এই যজ্ঞ আজ নিরন্তর অগ্রসর হয়ে চলে যেন, দেবতাদের পূর্ণ আবির্ভাব যেখানে ।।২।।

চিকিদ্বিন্মনসং ত্বা দেবং মর্তাস উতয়ে।
বরেণ্যস্য তেঽবস ইয়ানাসো অমন্মহি ।।৩।।

চিকিদ্বিৎ মনসম্—চেতনাময়, জ্ঞানময় মন যার
ত্বা—তোমাকে
দেবম্—দেবতাকে
মর্তাসঃ—মর্ত্যেরা
উতয়ে—রক্ষণের জন্য
বরেণ্যস্য—বরণীয়
তে—তোমার
অবসঃ—রক্ষকের জন্য
ইয়ানাসঃ—গতিমান, যাত্রী আমরা
অমন্মহি—মনের মধ্যে স্থাপন করি, ধ্যান করি

জ্ঞানময় মন তোমার, দেবতা তুমি, আমরা মর্ত্যজীব, মনের মধ্যে আমরা ধারণ করি তোমাকে আমাদের সংরক্ষণের জন্য, আমরা চলেছি যজ্ঞযাত্রায় তোমার বরেণ্য রক্ষণ-শক্তি আশ্রয় করে ।।৩।।

অগ্নে চিকিদ্ধাস্য ন ইদং বচঃ সহস্য।
তং ত্বা সুশিপ্র দম্পতে স্তোমৈর্বর্ধন্ত্যত্রয়ো গীর্ভিঃ শুম্ভন্ত্যত্রয়ঃ ।। ৪ ।।

অগ্নে—হে অগ্নি
চিকিদ্ধি—জাগ্রত হও, সচেতন হও
অস্য—এই
নঃ—আমাদের
ইদম্—এই

সহস্য—বলদেবতা
তম্—তাকে সেই
ত্বা—তোমাকে
স্থবিপ্র—হে শোভন-হনু (দৃঢ়গ্রীব)
দম্পতে—হে গৃহপতি
স্তোমৈঃ—প্রতিষ্ঠামন্ত্রের সহায়ে
বর্ধন্তি—বৃদ্ধি সাধন করে
অত্রয়ঃ—অত্রিরা
গীর্ভিঃ—প্রকাশমন্ত্রের দ্বারা
তুস্তুবি—শ্রীময় করে তোলে
অত্রয়ঃ—অত্রিরা

হে অগ্নি, আমাদের এ জিনিষটি যেন তোমার চেতনায় ধরা দেয়, এই হল আমাদের মন্ত্রবাক্য, তুমি বলাধিপতি, দৃঢ়গ্রীব তুমি, গৃহপতি তুমি, সেই তোমাকে অত্রিকুল তাদের প্রতিষ্ঠামন্ত্র দিয়ে বর্দ্ধিত করে, তাদের প্রকাশমন্ত্র দিয়ে শ্রীময় করে তোলে অত্রিরা ॥৪॥

২৩শ সূক্ত

অগ্নে সহন্তমা ভর দ্যুম্নস্য প্রাসহা রয়িম্।
বিশ্বা যশ্চর্ষনীরভ্যাসা বাজেষু সাসহৎ ॥ ১ ॥

অগ্নে—হে অগ্নি
সহন্তম্—বলবন্ত, পরাক্রমী
আ—এখানে
ভর—নিয়ে এস
দ্যুম্নস্য—জ্যোতির
প্রাসহা—বলের সহায়ে, পরাক্রমে
রয়িম্—আনন্দধনকে
বিশ্বাঃ—বিশ্ব, যাবতীয়, সকল
যঃ—যে
চর্ষণীঃ—(কর্ম্মব্যস্ত মানুষকে), কর্ম্মক্ষেত্রে, কর্ম্মপরতায়
অভি-সাসহৎ—জয়লাভ করেছে, অভিভূত করেছে
আসা—মুখের সহায়ে
বাজেষু—সকল পূর্ণতার মধ্যে

হে অগ্নি, জ্যোতির পরাক্রমে তুমি নিয়ে এস এখানে এমন পরাক্রমী আনন্দসম্পদ যা তার দীপ্তমুখের কল্যাণে সকল কর্ম্মধারায় বিজয়ী হয়ে ওঠে পরমপূর্ণতার মধ্যে ॥১॥

তমগ্নে পৃতনাষহং রয়িং সহস্ব আ ভর।
ত্বং হি সত্যো অদ্ভুতো দাতা বাজস্য গোমতঃ ॥ ২ ॥

তম্—সেই
অগ্নে—হে অগ্নি
পৃতনাসহম্—সেনাজয়ী
রয়িম্—আনন্দসম্পদ
সহস্বঃ—হে পরাক্রমী
আ ভর—নিয়ে এস
ত্বম্—তুমি
হি—নিশ্চয়
সত্যঃ—সত্য
অদ্ভুতঃ—অদ্ভুত, অপরূপ
দাতা—দাতা
বাজস্য—পরিপূর্ণতার
গোমতঃ—জ্যোতির্ময়, দীপ্তিময়

হে অগ্নি, পরাক্রমী তুমি, নিয়ে এস এখানে সেই শত্রুবাহিনী-ধ্বংসকারী আনন্দ-সম্পদকে, তুমিই সত্যসত্তা, অপরূপ তুমি, তুমিই জ্যোতির্ময় পরিপূর্ণতার প্রদাতা ॥২॥

বিশ্বে হি ত্বা সজোষসো জনাসো বৃক্তবর্হিষঃ।
হোতারং সদ্মসু প্রিয়ং ব্যন্তি বার্যা পুরু ॥৩॥

বিশ্বে—যাবতীয়
হি—নিশ্চয়
ত্বা—তোমাকে
সজোষসঃ—সমচিত্ত
জনাসঃ—জনগণ
বৃক্তবর্হিষঃ—যজ্ঞাসন স্থাপন করেছে যারা
হোতারম্—যাজ্ঞায়ক, আহ্বাতা তোমাকে
সদ্মসু—গৃহে গৃহে
প্রিয়ম্—প্রেয় তুমি
ব্যন্তি—প্রেরণ করে
বার্যা—বরণীয় বস্তু, কাম্যবস্তু
পুরু—বহুল

সমচিত্তে বিশ্বজন যজ্ঞাসন প্রসারিত করেছে তোমার জন্য গৃহে গৃহে, প্রিয় হোতা তুমি, সেখানে পৌঁছে দিয়েছে বহুল বরণীয় ধন ॥৩॥

স হি অ বিশ্বচর্ষণিরভিমাতি সহো দধে।
অগ্নে এষু ক্ষয়েষ্বা রেবদ্যঃ শুক্র দীদিহি দ্যুমৎ পাবক দীদিহি ॥৪॥

সঃ—সেই
হি—নিশ্চয়
স্ব—হয়েছে
বিশ্বচর্ষণিঃ—বিশ্বকর্মী
অভিমাতি—অবরোধকারী
সহঃ—পরাক্রমকে
দধে—ধারণ করে যেন
অগ্নে—হে অগ্নি
এষু—এই সব
ক্ষয়েষু—আবাসে
আ—চারিদিক হতে, নিকটে
রেবৎ—আনন্দময়
নঃ—আমাদের কাছে
শুক্র—হে শুভ্র দেব
দীদিহি—প্রদীপ্ত হও
দ্যুমৎ—দ্যুমান, দ্যুতিমান
পাবক—শুদ্ধিকর
দীদিহি—প্রদীপ্ত হও

এই সেই বিশ্বকর্মী, সে ধারণ করে যেন সর্ব্বজয়ী পরাক্রম, হে অগ্নি, আমাদের এই সব আবাসস্থানে আনন্দময় শুভ্ররূপে প্রদীপ্ত হও, প্রদীপ্ত হও জ্যোতির্ময় শুদ্ধিকৃৎ রূপে ॥৪॥

২৪শ সূক্ত

অগ্নে ত্বং নো অন্তম উত ত্রাতা শিবো ভবা বরূথ্যঃ ॥১॥
বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি দ্যুমত্তমং রয়িং দাঃ ॥২॥

অগ্নে—হে অগ্নি
ত্বম্—তুমি
নঃ—আমাদের
অন্তমঃ—অন্তরতম
উত—আর
ত্রাতা—ত্রাতা, পরিত্রাতা, উদ্ধারক
শিবঃ—মঙ্গলময়
ভব—হও

বরূথ্যঃ—বর্ম
বসুঃ—সম্বন্ত
অগ্নিঃ—অগ্নি
বসুশ্রবাঃ—সম্বন্তর সত্যজ্ঞানী
অচ্ছ—আমাদের দিকে
নক্ষি—আগমন কর
দ্যুমৎতমম্—পরমদীপ্তিময়
রয়িম্—আনন্দধনকে
দাঃ—প্রদান কর

হে অগ্নি, তুমি আমাদের অন্তরতম হয়ে ওঠ, হও আমাদের পরিত্রাতা, আমাদের পরম মঙ্গল, হও আমাদের রক্ষাবর্ম। অগ্নি হল সম্বন্ত, অগ্নিরই রয়েছে সেই সম্বন্তর দিব্য-জ্ঞান, এস তুমি আমাদের অভিমুখে, আমাদের দান কর পরম দ্যুতিময় আনন্দধন ॥১ ॥২॥

স নো বোধি শ্রুধি হবমুরুষ্যা ণো অঘায়তঃ সমস্মাৎ ॥৩॥
তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ ॥৪॥

সঃ—সেই (তুমি)
নঃ—আমাদের
বোধি—জেগে ওঠ
শ্রুধি—শোন
হবম্—আহ্বান
উরুষ্য—দূরে রাখ
নঃ—আমাদের
অঘায়তঃ—পাপমুখীদের হ'তে
সমস্মাৎ—সকলের থেকে
তম্—সেই
ত্বা—তোমাকে
শোচিষ্ঠ—হে পরম প্রভাময়, হে পরম তেজস্বান
দীদিবঃ—প্রদীপ্ত
সুম্নায়—শান্তিসুখের জন্য
নূনম্—এখনই, অবিলম্বে
ঈমহে—আমরা কামনা করি, আকাঙ্ক্ষা করি
সখিভ্যঃ—সখাদের জন্য

সেই তুমি জেগে ওঠ, শোন আমাদের আহ্বান, যা কিছু চলেছে পাপের দিকে তাদের সকলের থেকে আমাদের সরিয়ে রাখ ; হে পরম তেজোময়, দীপ্তিময়, সেই তোমাকেই কামনা করি অনতিবিলম্বে আমাদের সখাদের সুখশান্তির জন্য ॥৩॥ ॥৪॥

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

(মাঝে মাঝে মায়ের ব্যাখ্যা সহ)

৪৩৯—আমার যিনি প্রণয়ীস্বরূপ, তাঁর যাবতীয় সকল কিছুই তো আমার। যে অলংকার তিনি দিয়েছেন আমাকে, তা দেখালে তোমরা গালি দাও কেন?

৪৪০—আমার সেই প্রণয়ী তাঁর মাথার তাজ ও গলার রাজকীয় মণিহার নিজে খুলে আমার মাথায় ও গলাতে পরিয়ে দিলেন। কিন্তু সাধু ও মহাজনদের সব ভক্ত শিষ্যেরা তাই শুনে নিন্দা করে বলে, "এ লোকটা সিদ্ধির মতলবে এমন বলছে।"

৪৪১—আমার প্রণয়ী করেছেন আমাকে তাঁর কারাবন্দী, তাঁরই ইচ্ছা ও ইঙ্গিত মেনে আমি এই জগতে চলি; কিন্তু ওরা সব তাতে চেঁচিয়ে উঠে কেবল বলে, "কে তুমি হে, এমনি করে দেশের যুবকদের মাথা খাচ্ছ আর নীতি নষ্ট করছ?"

৪৪২—ওগো সাধু মহাত্মাগণ, আমি যদি তোমাদের কাছে প্রশংসা চাইতাম, ওহে জ্ঞানী গুণী মহাজনেরা তোমাদের কাছ যদি নামযশ পেতে চাইতাম, তাহলে আমার ঐ প্রণয়ী কখনই আমাকে তাঁর বুকে স্থান দিতেন না, তাঁর গোপন কক্ষের দরজা আমার জন্যে অবাধে মুক্ত করে দিতেন না।

৪৪৩—সেই আমার প্রণয়ীর প্রেমের আনন্দে মাতাল হয়ে জগতেরই রাজপথে আমার সব পার্থিব পোষাকগুলো দূর করে ফেলে দিলাম। জগতের লোকে যদি আমায় বিদ্রূপ করে, আচারবাদীরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে সব আমি গ্রাহ্য করব কেন।

৪৪৪—হে প্রভু, তোমাকে যে ভালোবেসেছে তার কাছে জগতের লোকের ধিক্কার-গুলো লাগে যেন বনের মধুবর্ষণের মতো, আর হাটের লোকে যদি ঢিল ছোঁড়ে তা যেন হয় নিদাঘের বৃষ্টিধারার মতো; কারণ সে ঠিকই জানে যে তুমি কখনো তাকে ধিক্কার দেবে না আর ঢিল ছুঁড়েও মারবে না।

মা: এ সব কথাতে কিছু বলবার নেই। এই সকল পূর্ণ অনুভূতির খাঁটি সত্যের কাছে কেবল মাথা নুইয়ে মেনে নিতে হয়। ৩-৪-১৯৭০

৪৪৫—ভগবানের দুটি জিনিস লোকে মন্দ বলে—তাঁর যে কাজটি তারা মোটে বুঝতে না পারে, আর যেটিকে তারা ভুল বুঝে নিজেরাই তাকে ভুলভাবে প্রয়োগ করে, কেবল যেটিকে তারা নিজেদের আধা-অহংকারে অস্পষ্টরূপে বুঝে নেয় তাকেই বলে উৎকৃষ্ট ও নিষ্কলঙ্ক। আমার কাছে কিন্তু তাঁর সকল রকম কাজই নিখুঁত ও পরম প্রীতিকর।

৪৪৬—হে ভগবান, আমি তোমার মধ্যে মন্দ কিছু দেখতে পাইনা, তাই ওরা বলে যে আমি নাকি বদ্ধ পাগল ; কিন্তু তোমার প্রেমে তাই যদি হয়ে থাকি তবু আমি তথাকথিত সংবিৎ ফিরে পেতে চাইনা।

৪৪৭—"ভুল হয়েছে, মিথ্যা কাজ হয়েছে, পদস্খলন হয়েছে" বলে লোকেরা প্রায়ই চিৎকার করে। কিন্তু হে প্রভু, তোমার ভুলই যে কত রমণীয়, তোমার মিথ্যার ভিতর দিয়েই যে তুমি সত্যকে বাঁচাও, আর পদস্খলনের ভিতর দিয়েই জগতের দোষত্রুটি সারিয়ে সংশোধন করে দাও।

৪৪৮—প্রাণের অনুরাগের দিক থেকে চিৎকার উঠছে—"জীবন, জীবন, জীবন," আর আত্মার দিক থেকে জবাব আসছে—"ভগবান, ভগবান, ভগবান।" এই জীবনকে যদি ভগবান জেনেই ভালবাসতে না পার, তাহলে ঐ জীবনের আনন্দ খুবই সংকীর্ণ হবে।

৪৪৯—"অমুক ঐ মেয়েকে ভালোবাসে"—এ হলো ইন্দ্রিয়চেতনার কথা। কিন্তু আত্মা বলবে—"ভগবান, ভগবান, ভগবানকেই"। অস্তিত্বমাত্রের আসল এবং সারকথাই হলো তাই।

না শ্রীঅরবিন্দ সকল অস্তিত্বকে ঐভাবেই সত্য বলে দেখেছেন ও ব্যক্ত করেছেন। আমাদের দরকার কেবল তা বুঝে নিয়ে তদনুসারে চলা। ৪-৪-১৯৭০

৪৫০—যদি তুমি ক্রূরতম কীটকে ও হীনতম দুর্বৃত্তকেও ভালোবাসতে না পারলে তাহলে কেমন করে জানবে যে সকল আত্মার ভিতরকার ভগবানকে তুমি সর্বতোভাবে জেনেছ এবং নেনেছ ?

৪৫১—জগৎকে বাদ দিয়ে কেবল ভগবানকে ভালোবাসা, তা যদি খুব তীব্রতমও হয় তবুও সে ভক্তি অপূর্ণই হলো।

৪৫২—ভালোবাসার অর্থ কি এই যে সে হবে ঈর্ষার পালিতা পুত্রী ? কৃষ্ণ যদি চন্দ্রাবলীকেও ভালোবেসে থাকেন, আমি কেন তবে তাকেও ভালোবাসবো না ?

৪৫৩—যখন তুমি কেবল ভগবানকেই ভালোবাসো তখন হয়তো এমন চাইতে পারো যে তিনিও সকলকে বাদ দিয়ে কেবল তোমাকেই যেন ভালোবাসুন ; কিন্তু তেমন চাওয়া ঠিক নয়, কারণ তা সত্যের ও স্বাভাবিকের বিরোধী। কারণ তিনি হলেন এক ও অদ্বিতীয়, আর তুমি হলে জগতের কোটির মধ্যে একটি। বরং তুমি যদি তোমার হৃদয়ে মনে ও আত্মাতে সকল সত্তার সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে পারো, তাহলে তখন দেখবে যে সর্বত্র তুমিই রয়েছ তাঁর ভালোবাসার একমাত্র পাত্র, তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই।

৪৫৪—আমার প্রণয়ীকে যারা ভালোবাসে না, তাদের সঙ্গেই আমার ঝগড়া, কিন্তু যারা আমার সঙ্গে তাঁর ভালোবাসার অংশীদার আছে তাদের সঙ্গে নয়।

৪৫৫—ভগবান যাদের ভালোবেসেছেন তাদের দেখে খুশী হও ; আর যারা তাঁর ভালোবাসা পায়নি তাদের উপর করুণা রাখো।

মা : এখানে শ্রীঅরবিন্দ ঈর্ষা সম্বন্ধে খুব সমুচিত মন্তব্য করেছেন, আর সেই সংকীর্ণ অহংকারবুদ্ধির সীমা পেরোবার যা শ্রেষ্ঠ উপায় তাই বলে দিয়েছেন, অর্থাৎ চিরন্তন বিশ্ব-প্রেমের মধ্যে নিজেকে এক করে মিলিয়ে দেওয়া। ৬-৮-১৯৭০

৪৫৬—ভগবানকে ভালোবাসেনা বলে কি নাস্তিককে তুমি ঘৃণা করো ? তাহলে তুমিও নিশ্চাই, কারণ তোমার ভালোবাসা পুরোপুরি নয়।

৪৫৭—বিশেষ করে এক জায়গাতে সকল ধর্ম ও সকল সম্প্রদায় শয়তানের কবলে চলে যায়, যখন পুরোহিত অভিশাপবয় (Anathema Maranatha) আবৃত্তি করতে থাকে। তখন আমি দেখি যে স্বয়ং শয়তানই সেটা আবৃত্তি করছে।

৪৫৮—পুরোহিতে যখন অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ করে তখন অবশ্য সে ভগবানের সামনেই তা করে। কিন্তু সেই ভগবান হলো ক্রোধের ও তমসার ভগবান, যাঁর কাছে সে তার শত্রুর সঙ্গে নিজেকেও উৎসর্গ করছে ; সে ভগবানকে যেমন যেমন ভাবের দ্বারা সে ডাকছে সেই ভাবেই তাঁকে পাচ্ছে।

৪৫৯—আমি শয়তানের দ্বারা যথেষ্ট উত্যক্ত হতে হতে হঠাৎ দেখি যে স্বয়ং ভগবানই ঐভাবে আমাকে ঠকাচ্ছেন ; তাই তার পর থেকে যত কিছু যন্ত্রণা, সবস্তই আমার মধ্য থেকে চিরদিনের জন্য ঘুচে গেল।

৪৬০—শয়তানকে ঘৃণা ক'রে তার প্রলোভনে ও পীড়নে নমিয়া হলেও বলতে পারি নি যে তবু তার বিদায়বাণী কেন মধুর লাগে ; তাই আবার সে ফিরে এলে তাকে তাড়াতে আমার দুঃখ হতো। শেষে দেখি যে তা নয়, স্বয়ং কৃষ্ণই আমার সঙ্গে ঐরূপ ছলনার খেলা খেলছেন, তাই আমার সে ঘৃণা তখন হাসিতে রূপান্তরিত হলো।

৪৬১—ওরা আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে জগতের মধ্যে যা কিছু মন্দ দেখি সে সমস্তই হলো ভগবানের বিরুদ্ধে শয়তানের কাজ ; কিন্তু আমার সেই একান্ত পরম প্রিয়ের সম্বন্ধে আমার মনে গর্বের শেষ নেই, আমার এই দৃঢ়বিশ্বাস যে স্বর্গে কিংবা নরকে, জলে কিংবা স্থলে, কোথাও এমন কিছু ঘটতে পারেনা যা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

মা অর্থাৎ সেই পরাৎপরের মধ্যে সকল বিপরীতই একত্রে মিলে গিয়ে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে যায়। কেবল অভিব্যক্তির ব্যাপারেই তাদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে পরস্পর বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। তোমার চেতনা যখন ভগবৎচেতনার সঙ্গে মিলে অভিন্ন হয়ে যাবে তখন ঐ সব বৈপরীত্যও তোমার কাছে ঘুচে যাবে।* ৭-৪-১৯৭০

* অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচার্য

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

৫ মে, ১৯৫৪

প্রশ্ন অতিমানস সত্যের উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত যোগের পথে কেমনতরো সুনিশ্চিত মনোভাবকে আঁকড়ে ধরতে হবে?

উত্তর : Elements of Yoga থেকে—এই তো এখানে তা বলা হয়েছে—চৈত্য চেতনাতে থাকার অবস্থা, একাগ্র ঐকান্তিকতা, ও মায়ের প্রতি অটুট ভক্তি।

প্রশ্ন চৈত্য চেতনার অবস্থা কেমন হবে?

উত্তর চৈত্যের অবস্থা? আপন চৈত্যের সঙ্গে নিত্য সংযোগ রেখে কেবল তারই নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকা।

প্রশ্ন : না, শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও আস্থার মধ্যে কি তফাৎ তা আমি ঠিক বুঝি না।

উত্তর : কেন, শ্রীঅরবিন্দ এখানে তা স্পষ্ট বুঝিয়েছেন। যদি তা না বোঝো...

প্রশ্ন ওতে লিখেছেন—"শ্রদ্ধা হলো সমগ্র সত্তার মধ্যেই তার অনুভূতি"।

উত্তর : হাঁ, তিনি বলেছেন, শ্রদ্ধা (Faith) মানে এই যে সমগ্র সত্তাতে সম্পূর্ণ-ভাবেই তা অনুভব করবে। আর বিশ্বাস (Belief) হলো মাথার ভিতরকার জিনিস, অর্থাৎ কেবল মনের মধ্যেই তার স্থান। আর আস্থা (Confidence) হলো ওর চেয়ে অন্যরূপ জিনিস, ভগবানের উপর একটা আস্থা রাখা, জীবনের উপর আস্থা, আপন নিয়তি সম্পর্কে আস্থা, অন্যদের উপরেও আস্থা, অর্থাৎ সব কিছুই তোমার পক্ষে সহায়ক, তুমি যেমন চাও তা হবেই এই আস্থা। কিন্তু শ্রদ্ধা এমন স্বতঃস্ফূর্ত জিনিস যা প্রমাণের ধার ধারেনা।

প্রশ্ন না, এই শ্রদ্ধা আসা কিসের উপরে নির্ভর করে?

উত্তর : বোধকরি তা ভগবৎ কৃপারই উপরে। যাদের তা আসে তা আপনা হতেই আসে। অপরপক্ষে অন্যদের তার জন্য অনেক চেষ্টা করতে হয়।

প্রশ্ন শ্রদ্ধাকে কেমন ক'রে বাড়ানো যায়?

উত্তর : সম্ভবত আস্পৃহার সাহায্যে। কারো কারো বেলাতে আপনা হতেই সেটা আসে।...তুমি দেখবে যে শ্রদ্ধা ছাড়া প্রার্থনা করা খুব কঠিন, কিন্তু যদি তুমি শ্রদ্ধাকে বাড়াবার জন্যই প্রার্থনা করো কিংবা তারই জন্য আস্পৃহা করো...তবু তার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা থাকা দরকার। যে জিনিস তোমার মধ্যে নেই তাই যখন পেতে চাইছ—তখন সে ক্ষেত্রেই যথেষ্ট চেষ্টা ও আস্পৃহা নিয়ে লেগে থাকতে হবে, প্রতি মুহূর্তেই ইচ্ছার জোর এবং

ঐকান্তিকতা নিয়ে ; তাহলে নিশ্চয় জেনো যে কোনো একদিন সেটা আসবেই—হয়তো এক মুহূর্তেই এসে যাবে। অনেকের মধ্যে তা এমনিতেই থাকে, আবার তার বিরুদ্ধ জিনিসও এসে তাদের আক্রমণ করে। সে স্থলে তাদের মনের ইচ্ছা ও আন্তরিকতার শক্তিতে আপন শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রেখে সে আক্রমণকে তারা প্রতিরোধ করে। আবার অনেকে আছে যারা সংশয়কেই পুষে রাখে, কতকটা ব্যসনের মতো—কিন্তু তার চেয়ে মারাত্মক জিনিস আর কিছু নেই। যেন ফলের মধ্যে কীটকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে, সেই কীট ফলটিকে কুরে কুরে খতম ক'রে দেবে। এমন জিনিস হলে প্রথমে সেটা হয় মনেরই মধ্যে, আর তৎক্ষণাৎ সাবধান হয়ে তাকে দূর ক'রে দেওয়া চাই। ভিতরে কিরূপ ক্রিয়া হচ্ছে তা কেবল দেখতে থাকা নয়, তেমন কৌতূহল থাকাও বিপদ্‌জনক।

হয়তো যাদের সহজ মন ও সরল অন্তঃকরণ, অন্তরের মধ্যে কোনো বুদ্ধির প্যাঁচ নেই, তাদের চেয়ে যারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাখে তাদের পক্ষে তেমন খাঁটি শ্রদ্ধা আনতে পারা কঠিন হয়। তবে আমার মনে হয় যে সেইরূপ বুদ্ধিপ্রধান ব্যক্তির মনে যদি একবার শ্রদ্ধা জাগে তাহলে তা খুব প্রবল হয় ও অঘটন পর্যন্ত ঘটতে পারে।

প্রশ্ন : মা, দৃঢ়সংকল্প হতে পারা কিসের থেকে জন্মায় ?

উত্তর : যাদের মধ্যে ইচ্ছার জোর থাকে আর সেই ইচ্ছাকে কাজে লাগাতে সম্পূর্ণ সক্ষম তাদের মধ্যেই সাধারণত তেমনি দৃঢ়সংকল্পের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন : যদি ভগবানে আমার শ্রদ্ধাও থাকে বিশ্বাসও থাকে, সেখানে কি পার্থক্য হয় ?

উত্তর : শ্রদ্ধা (faith) আরো পুরোপুরি রকমের জিনিস এবং তা বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো (এখানে শ্রীঅরবিন্দ তাই লিখেছেন)। দেখ, তোমার ভগবানের প্রতি বিশ্বাস (trust) আছে, তার মানে তোমার বিশ্বাস এই যে তুমি তাঁর কাছে যা পেয়েছ সে তোমার ভালোর জন্যই হয়েছে—তোমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাই তিনি করুন, যে অনুভূতিই দিন, বা যে অবস্থাতেই তোমাকে রাখুন, সমস্তই তোমার পক্ষে যা সর্বোৎকৃষ্ট তাই হয়েছে এবং হবে। এরই নাম বিশ্বাস। কিন্তু শ্রদ্ধা—তাতে ভগবানের বাস্তব উপস্থিতি সম্বন্ধে তোমার যে দৃঢ়প্রত্যয় তা অনড় ও অটল—তোমার সর্বসত্তা জুড়ে থাকবে সেই সুনিশ্চিত অস্তিত্বের চেতনা, কেবল মন প্রাণ ও চৈত্যের মধ্যেই নয়। সমগ্র সত্তাই সেই চেতনাতে অভিষিক্ত। আর সেইরূপ শ্রদ্ধা হতেই আসে দিব্য অনুভূতি।

প্রশ্ন : বিশ্বাস কি তেমন সর্বব্যাপী ও সম্পূর্ণ হতে পারেনা ?

উত্তর : তা না হতেও পারে। তবে তার মধ্যে কিছু কমবেশির পার্থক্য থাকে, ঠিক বলা যায়না, তবে সব সময়ে তা একই জিনিস হয়না।

তুমি ভগবানের কাজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছ, তোমার এটা ধ্রুববিশ্বাস আছে যে তাই হলো সর্বোত্তম কাজ, তুমি তাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবেই নিযুক্ত করেছ, তার ফল কি হবে সে কথা না ভেবে ; তাহলে তার থেকে এমন একটা আস্থা এসে যাবে যে নিশ্চয়

তুমি সে কাজে সফল হবেই, কারণ তুমি তাতে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রয়োগ ক'রে তাতেই একান্তভাবে লেগে আছো, সুতরাং তার সার্থকতা হবেই হবে।

এর মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকেনা, ফলাফল নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা থাকে না, শুধুই তার মধ্যে তুমি নিমগ্ন হয়ে যাও। এই হলো আসল জিনিস। আবার অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসটি জুড়ে দেওয়া হয়—"হাঁ, এই কাজ আমি করবো এবং তাতে যা চাইছি তাই হবে, তাই সেটা সুনিশ্চিত জেনে এই কাজ আমি বেছে নিলাম"। এর মধ্যে তফাৎ এই যে প্রথম জনের বেলাতে রয়েছে ভগবানের উপস্থিতির উপরে অনন্ত বিশ্বাস এই ভাবে যে তিনি সর্বত্রই আছেন, সমস্ত শ্রদ্ধা তাঁরই উপরে একান্তভাবে নিবেদিত হচ্ছে, তাঁরই হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দেওয়া হয়েছে। ঐ সঙ্গে এমন বিশ্বাস যুক্ত হয়েছে যে ভগবানের সঙ্গে তোমার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তাতে তোমার জীবনে যাই কেন হোক সবই হচ্ছে তাঁরই ইচ্ছাতে, এবং তাই তোমার পক্ষে সব চেয়ে ভালো, তার চেয়ে বেশি ভালো আর কিছু হতে পারেনা, যেহেতু সে তাঁর নিজেরই হাতের দান। এমন বিশ্বাস যে ঠিক শ্রদ্ধারই অংশ তা নয়, কারণ শ্রদ্ধার মধ্যে যে আত্মদান থাকে তাতে ব্যক্তিগত অবস্থান্তরের কোনো প্রশ্নই থাকেনা, থাকে শুধুই নিজেকে একান্তভাবে দিয়ে ফেলা ; কিন্তু ঐ বিশ্বাস থাকলে তা বলবে যে এর ফল এইরকম হলো এবং হবে। কিন্তু যেখানে কেবল অকুণ্ঠ আত্মদান, বিনা বিচারে, ফলাফলের দিকে না চেয়ে, সেখানে বলবে যে আমি সবটাই নিজেকে দিয়ে দিলাম, তারপর যা হবার তাই হোক "তাতে আমার কিছু যায় আসে না"। এই রকমের বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা ভাব যখন আসবে তখন তা অনায়াসে আপনা হতেই আসবে—সব সময়ে, সকল অবস্থাতে, এবং তাতে যা হবার তা বস্তুত ভালোই হবে (অবশ্য তুমি যাকে ভালো মনে করো তেমন তো নয়ই, কারণ তুমি সে সম্বন্ধে কিছুই জানো না)। কিন্তু তবু সত্তার একটা অংশে তা জানা থাকে ও বিশ্বাস থাকে, আর সেই বিশ্বাস ঐ শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে আরো প্রবল ক'রে তোলে, এবং সেই জিনিস পুরোপুরি মেনে নিয়ে (নতুবা কি বলা যায় ?) তার শেষফল যা ঘটে তা সার্থকতার মধ্যেই ঘটে।

এমন এক অবস্থা আসে যখন তুমি নিজেই উপলব্ধি করতে পারো যে তোমার জীবনে যা কিছু ঘটছে এবং তার দ্বারা চেতনার মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া হচ্ছে, সে সব কিছুই নিতান্ত নির্ভর করছে তোমার নিজের ব্যক্তিগত মনোভাবের উপর। একটা বিশেষ সময় আসে যখন তুমি চেতন হয়ে উঠে জানতে পারো যে আসলে কোনো কিছু ভালোও নয় আর মন্দও নয়। তুমি তাকে যেমনভাবে নেবে তেমনি হবে। সেই একই জিনিসকে যদি আমরা ভগবানের দান ও কৃপা বলে নিলাম সমর্পিত ভাবে, তাতে নিজেরাই হবো আরো বেশি সবল ও সচেতন, আরো বেশি সত্যময়। আবার সেই একই অবস্থাকে যদি মন্দভাগ্যের আঘাত ও অশুভ শক্তির আক্রোশ বলে মনে করি তখন তা আমাকে সংকীর্ণ সংকুচিত ও উদ্‌ভ্রান্ত করে দেবে, তার ফলে আমাদের যা কিছু শক্তি ও চেতনা ও সম্পত্তিকে বিনষ্ট করে দেবে। অথচ ঘটনাধারা সেই একই ; এই সত্যটি তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করা চাই, তাহলে নিজেদের উপর একটা অটল দখল আসবে। কেবল নিজের বেলাতেই নয়, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে সকল ঘটনা সকল অবস্থারই সম্পর্কে। সবই নির্ভর করে তোমার নিজস্ব মনোভাবের উপরে, এবং তা কেবল মস্তিষ্ক চেতনাতেই নয় (যদিও সেখান থেকেই শুরু), কিন্তু সর্ববেহের

দিক দিয়ে। এই উপলব্ধি এমন জীবন্ত হওয়া চাই যে তুমি পুরোপুরি তোমার কাজে লেগে থাকবে, আর একাগ্র ভাবে আত্মপ্রভুত্বের সঙ্গে জড়ের মধ্যেও চেতনাকে সক্রিয় করতে পারবে, এবং তার ফলে বাইরের সকল ধাক্কা তুমি আগের চেয়ে অন্যরূপ ভাবে গ্রহণ করবে। এমন অবস্থা যদি পুরোপুরি আনতে পারো তাহলে সব কিছু দুর্ঘটনাতেই তুমি জয়ী হতে পারবে। এমন রকম ক্ষমতার অবস্থায় পৌঁছান নিশ্চয় সম্ভব, এবং আমি আশা করি যে তোমাদেরও তা হবে। শুধু সম্ভবমাত্র নয়, কিন্তু নিশ্চয়ই তা হতে পারবে। কেবল একটি ধাপ মাত্র এগিয়ে যাওয়া, কারণ সে শক্তি তোমাদের নিজের মধ্যেই বর্তমান—যার জোরে ঘটনামাত্রের উপরে মনের প্রতিক্রিয়াকে আমূল বদ্‌লে দিতে পারো, এবং সেই শক্তিকে নিজেদের জড় উপাদান ও কোষগুলির উপরেও প্রয়োগ করতে পারো, এবং তা তোমার পারিপার্শ্বিকের উপরেও সার্থকভাবে কাজ করতে পারে।

এ কেবল শ্রদ্ধার কথা নয়, অভিজ্ঞতাসঞ্জিত সুনিশ্চয়তা। সেই অভিজ্ঞতা সামগ্রিক না হলেও তা খাঁটি অভিজ্ঞতাই।

এর দ্বারা তোমার সম্মুখে নতুন দিগন্ত প্রসারিত হবে, নতুন এক রাস্তা খুলে যাবে, রূপান্তরের দিকে তুমি এক পা এগিয়ে যাবে।

অতএব যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াচ্ছে যে বস্তুত অসম্ভব জিনিস বলে কোনো কিছুই নেই। কেবল আমরাই সব কিছু কে সংকীর্ণ সীমায়িত ক'রে রেখেছি। আমরা বলি, এটা সম্ভব কিন্তু ওটা অসম্ভব, হাঁ, এটা করা চলে কিন্তু ওটা চলেনা,—হাঁ এটা সাধ্য সাধ্য ও সত্য কিন্তু ওটা অসাধ্য। এমনি করে আমরাই নিজেদেরকে সংকীর্ণ সীমার বেড়ার মধ্যে বন্দী করি, অন্ধ ধারণাকে আঁকড়ে থাকি যা জীবনের নিয়মাদি সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। তুমি যেমন রকম ভাবো, বুদ্ধিমানেরা যেমনতরো ভেবে থাকে, ভগবানের প্রকৃত নিয়ম কিন্তু সেরকম নয়, তা সম্পূর্ণই আলাদা রকম। কেবল এক পা এগিয়ে যেতে পারলে, বিশেষত প্রথম পদক্ষেপের পরেই তা টের পাওয়া শুরু হয়।

প্রশ্ন মা, এখানে রয়েছে এক প্রশ্ন,—"নিজের দোষ ও দুর্বলতা ভগবানের কাছে এবং অন্যান্য সকলেরই কাছে স্বীকার ক'রে নেওয়া কি আন্তরিকতার নিদর্শন?"

উত্তর : তা অন্য সকলের কাছে কেন, ভগবানের কাছেই স্বীকার করা চাই।

প্রশ্ন : কিন্তু যদি কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতি অন্যায় আচরণ করে থাকি তাহলে তার কাছেও তা কবুল হতে হবে নাকি? শুধু ভগবানকে জানানই কি যথেষ্ট?

উত্তর : হাঁ, অন্যের কাছে দোষ করলে অবশ্যই তাকে তা বলতে হবে। তাতে কিছু ক্ষতি হবেনা, তুমি তাকে বলতে পেরে যদি নিশ্চিন্ত হও তাহলে অবশ্যই বলবে। আসলে তাতে যদি বাধা কাটিয়ে নজের পথে স্বচ্ছন্দে এগোতে পারো তাহলে নিশ্চয় তা করবে।

প্রশ্ন : মা, এমনটা কি হয় যে আমি ঐকান্তিক নই, কিন্তু আমি তা নিজে জানিনা?

উত্তর : তেমন হলে আমার মনে হয় যে সেই ব্যক্তি অকপট নয়, সে নিশ্চয় কিছু প্যাঁচালো; কারণ নিজেকে ভিতরে কপট জেনেও সেই রকমের মনোভাব বজায় রেখে

চলতে থাকা কি নষ্টামি হলোনা ? অর্থাৎ তার কিছু হয়তো কুমতলব আছে, নইলে অমন হয়না।

প্রশ্ন কিন্তু আমি বলছিলাম, সে বিষয়ে যদি সে নিজেই অচেতন থাকে ?

উত্তর : সেটা কেমন ক'রে হয়, একসঙ্গেই জানা এবং না-জানা ? তা সম্ভব নয়। কপটতা করছে বলে নিজেই যখন জানছে, তখন সে তো অজ্ঞান নয়। দুই রকমের ভাব একযোগে থাকা অসম্ভব।

প্রশ্ন কিন্তু কপটতা থাকলেও যদি সে না জানে যে কোন অংশে সেই দোষ রয়েছে ?

উত্তর ও ! সে যদি সেটা সঠিক ভাবে না জানে ?...কিন্তু তারও কারণ তাই যে সে যথার্থ ঐকান্তিক নয়, আর নিজের ভিতরদিকে সে ভালো ক'রে চেয়ে দেখেনা। এটা একটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে তুমি যখন সেটা টের পাও তখন কোনখানে তোমার দোষ রয়েছে তাও তুমি নিশ্চয় জানতে পারো। যেমন, কোনো একটা ঘটনাস্থলে তুমি বুঝলে যে সেই অবস্থাতে কেমন আচরণ তোমার করা উচিত ; কিন্তু তোমার মনের মধ্যে ইচ্ছা হলনা যে বাস্তবিক তেমন কিছু আমি করি, এমনি তো হয় ? অর্থাৎ তখন তুমি একটা অজুহাত নিয়ে নিজেকে ঠকিয়ে সমুচিত কাজটি এড়িয়ে গেলে, নিজেকে ফাঁকি দিলে, এটা প্রায়ই হয়ে থাকে (হাস্য)। আর অমনি সেই মুহূর্তটিতে, যখন তুমি মনের মধ্যে ঠাওরাচ্ছ যে সমুচিত ক্রিয়া এড়িয়ে যাওয়া নিয়ে কি কৈফিয়ৎ খাড়া করা যায়, এবং যখন নিজের মধ্যে টের পাও যে কোনখানে তোমার কপটতা হচ্ছে কিন্তু তথাপিও তুমি সেই ভাবেই চলো, তার মানে তোমার মনের মধ্যেই প্যাঁচ রয়েছে—আর একেই আমি বলি মন্দ আচরণ, একেই বলি নষ্টামি। সেই কপটতা সম্বন্ধে যখন তুমি রীতিমত সচেতন, তখন কেমন ক'রে বলতে পারো যে তুমি কিছু জানোনা ?...শতকরা নব্বুই জায়গাতেই এমনিতরো তথাকথিত না জানা কাজ করা হয়। এটা দুঃখের কথা যে আত্মপ্রতারণা করবার জন্য কত কিছু অজুহাত এনে ফেলা হয় যাতে তা এড়িয়ে যায়, এবং সেটা তার বিপরীত কাজ করার জন্যও। যেটা করা অনুচিত, তাই যখন তুমি ইচ্ছা করেই করো তাহলে সে একই কথা হলো। অনেক প্রকার সঙ্গত যুক্তি দিয়ে বেশির ভাগ লোকই তাই ক'রে থাকে, কি দোষ করছে সেটা না বুঝে। আবার এই ভাবতে থাকে যে তারা যথেষ্টই ঐকান্তিক, নিরীহভাবে অম্লান বদনে বলে—"না, যথার্থ অন্তর থেকেই জেনেছি যে আমি যা করছি তা নির্দোষ।" অবশ্য তারা প্রকৃতপক্ষে আন্তরিক নয়, অথচ একেবারে যে অচেতন তাও নয়। কিন্তু ভিতরে কি হচ্ছে তার দিকে যদি সচেতন হয়ে চেয়ে দেখো তাহলে আপন চালাকিটুকু অনায়াসেই ধরতে পারবে সেই বিপরীত ক্রিয়া সম্বন্ধে নিজের কৈফিয়ৎ সমেত। এমনি ভাবেই একটা খেলা শুরু হয় দুই রকমের জিনিস নিয়ে, কপটতা আর অজ্ঞানতা। কিন্তু যদি এটা স্বীকার করো যে "আমি জানি কোনখানে আমি কপট হচ্ছি", তখন তোমাকে এইরূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে—আমি কি এমনি আঁধারের মধ্যেই থাকতে চাই, কিংবা এর থেকে আরো এগিয়ে যেতে চাই ? বস্তুত আপন কপটতা সম্বন্ধে সচেতন হলে তখন কেবল একটি কাজই করা দরকার—ঐ অবস্থার উপরে গনগনে তপ্ত লোহার ছেঁকা দিয়ে

নিজেকে খাঁটি ঐকান্তিক করা। এইরূপই সেখানে করা চাই, আগুনের ছোঁকা লেগে তা পুড়ে ছাই হবে...এই একমাত্র পন্থা।

ওতে প্রথমে তো ব্যথা লাগবেই, কিন্তু পরে সব ঠাণ্ডা।

প্রশ্ন : না, আপনি লিখেছেন, "ঐকান্তিকতাই হলো ভগবানের বন্ধদুয়ারের অর্গল খুলতে পারার চাবিকাঠি", এ কথার মানে কি?

উত্তর : ওটা একটা উপমা দিয়ে বলা হয়েছে গো ছেলে, সাহিত্যে যেমন অলংকার দিয়ে বলা হয়,—যে ঐকান্তিকতা থাকলে সব কিছুই মিলবে, এমন কি ভগবানকেও। বন্ধদুয়ার খুলতে চাইলে তো তার চাবিকাঠিটা চাই, তাই নয় কি? ভগবান এবং তোমার মাঝখানে যে দরজার ব্যবধান রয়েছে, তোমার ঐকান্তিকতাই সেখানে চাবির কাজ করবে, ভিতরে ঢুকতে পারবে। এই হলো কথা।

শুভ রাত্রি জানাই।

১২ মে, ১৯৫৪

প্রশ্ন : Elements of Yoga থেকে পড়ে—শ্রীঅরবিন্দকে প্রশ্ন করা হয় যে, "ভিতরকার পুরুষ যদি মায়ের কৃপার কাজকে সমর্থন না করে, তাহলে মন প্রাণ দেহ ও চৈত্য প্রভৃতি সত্তাগুলি কি সেই কৃপার দ্বারা রূপান্তরের ক্রিয়াকে গ্রহণ করতে অপারগ হবে?" শ্রীঅরবিন্দ তার জবাবে বলেছেন, "না, পুরুষ নিজেকে পিছনে রেখে অন্য সত্তা-গুলিকে তা গ্রহণ করতে পারার সুযোগ দেবে।"

মা এখানে পুরুষ বলতে কাকে বোঝাচ্ছে?...সে কি অহং?

নলিনী : তা নয়, সে হলো চেতনাসত্তা। এক সত্তা, আর এক সম্ভূতি। সেই চেতনাসত্তাই হলো পুরুষ, আর তার সম্ভূতি হলো প্রকৃতি।

প্রশ্ন : তাহলে প্রত্যেকটি সত্তার স্বতন্ত্র পুরুষ থাকবে, না কি সকল সত্তার একই পুরুষ?

নলিনী প্রত্যেক সত্তারই পুরুষ আছে, মনের প্রাণের দেহের নিজস্ব স্বতন্ত্র পুরুষ।

প্রশ্ন : তাকেই কি বলা হয় তার চেতনা?

নলিনী : হাঁ, সেই তার চেতনাসত্তা।

প্রশ্ন : সেই সব চেতনাসত্তা কি পরস্পর সংযুক্ত?

নলিনী : হাঁ।

প্রশ্ন : তাহলে সেই চেতনাসত্তার অনুমোদন ছাড়া কেমন ক'রে সাধনার কাজ করা যাবে, কারণ চেতনাই তো প্রথমে তার জন্য সংকল্প করবে?

নলিনী : হাঁ, তাই হয়ে থাকে।

মা (শ্রোতাদের প্রতি) এখানে আমিই প্রশ্নটা করেছিলাম।

প্রশ্ন : (একজন শিশু শ্রোতা) মা, এখানে আরো রয়েছে একটা বিশেষ প্রশ্ন—"সাধকের জীবনে ভগবানে সমর্পিত হবার স্থিরসংকল্প যে কার্যকরী হচ্ছে তার অভ্রান্ত লক্ষণ কী ?" এ প্রশ্নের জবাবে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"তার লক্ষণ এই যে সেই ব্যক্তি বিনা দ্বিধায় বিনা দাবীতে বিনা বিদ্রোহে ও বিনা শর্তে নির্বিচারে পুরোপুরি বাধ্যতার সঙ্গে ভগবৎ প্রেরণাতেই চালিত হতে থাকবে, আর যা কিছু ভগবৎ-সম্মত নয় তাকে প্রত্যাখ্যান করবে।"

•

মা, তাহলে কি সেখানে তা নিতান্ত অসাড় রকমের সমর্পণ হলোনা ?

উত্তর : অসাড় রকমের ? অর্থাৎ হালছাড়া হয়ে ?

প্রশ্ন : অর্থাৎ নিতান্ত নিষ্ক্রিয় ভাবে।

উত্তর : তোমার কথাটা বুঝলাম না। এখানে প্রশ্ন হলো পূর্ণ সমর্পণের কি লক্ষণ। সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়ের কথা নয়। স্থির সংকল্পের ফলে তার কতকগুলি লক্ষণ ঘটবে। প্রথমত হবে অকুণ্ঠ বাধ্যতা, দ্বিতীয়ত যা কিছু ভগবৎ-মুখী নয় তাকে প্রত্যাখ্যান। এগুলি সাধারণ জিনিস নয়, যে কেউ তাতে সফল হয়েছে সে অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

কোন প্রেরণা ভগবানের দিক থেকে, আর কোনটি বা অন্যরূপ দিক থেকে, তার প্রভেদ তুমি কি বুঝতে পারো ? তোমার মধ্যে যখন একটা প্রেরণার ঝোঁক আসে তখন তা ভগবৎ নির্দিষ্ট কিংবা অন্যরকম কিছু তা কি বাছাই করতে পারো ?

প্রশ্ন : কিছু কিছু পারি।

উত্তর : কিছু কিছু ? বেশ, এবার বলো তো কেন তেমন হয় আর কেমন ভাবে তা হতে পারে ?...নিশ্চয় তা শোনবার মতো।

প্রশ্ন সকালে কিংবা বিকেলে যখন ঘুম থেকে জেগে উঠি সেই সময়ে কখনো কখনো মনে হয় কেউ যেন বলছে—সময় বয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি চলো।...

উত্তর আচ্ছা, তার পরে ?...কে সে কথা বলে ?...নিশ্চয় তুমি বোধ করো যে একজন কেউ তা বললে—সময়ে বয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি তোমার কাজে লাগো ?

প্রশ্ন সে কোনো মানুষ নয়।

উত্তর : তবে কি শুধুই একটা অন্তরী তলব ?

প্রশ্ন হাঁ।

উত্তর কিন্তু কোথা হতে এলো তা তো বুঝবে ? জানতে পারো সেটা ?

প্রশ্ন : শুনে আনন্দ পাই, সুতরাং মনে হয় নিশ্চয় তা ভগবানেরই দিক থেকে।

উত্তর : ও! তাহলে সেই রকমই তোমার মনে সাব্যস্ত করে নাও বুঝি? যেমন, তুমি যদি আপন মনে মনে এটা স্থিরসিদ্ধান্ত করে রাখলে যে অতঃপর একটুও অলস না হয়ে তোমার কাজ করা দরকার—বৃথা ঘুমিয়ে বসে সময় নষ্ট না ক'রে ঠিক ঠিক সময়ে ঠিক ঠিক কাজগুলো করতেই হবে—তাহলে ঘুম থেকে উঠেই তোমার মনের মধ্যে সেই সিদ্ধান্তেরই প্রেরণাটি জেগে উঠবে (কারণ তা তোমার জাগ্রত মনেরই অংশস্বরূপ), আর সেই পূর্ব সিদ্ধান্তই তোমাকে বলবে, "তাড়াতাড়ি চলো, শীঘ্র কাজে লেগে যাও, কুঁড়েমি কোরোনা।" সেখানে তার মানে তোমার নিজের ভিতরকার একটা অংশ অন্যান্য অংশগুলিকে ঐভাবে তাগিদ দিচ্ছে। কিংবা হয়তো যখন তোমাকে অন্য কারো সঙ্গে ক্লাসে যোগ দিতে কিংবা অন্য কিছু কাজে যোগ দিতে হবে, এবং সেই ব্যক্তিরই মনের চিন্তা সক্রিয় হয়ে বলবে, "তুমি কি ঘুমে আলস্যে লেট করতে চাও?"—সে ক্ষেত্রেও ঐরকম কাজ হয়। অবশ্য ওর ও একটা ভালো দিক আছে, আর তোমাকে সাবলীল ও তৎপর ক'রে রাখার পক্ষে তা যথেষ্টই উপকারী, কিন্তু তাই বলে যে সেটি ভগবানেরই দিক থেকে আসা তা নয়। ভালো ভাব হলেও যে তা ভগবানের নির্দেশে এসেছে এমন কথা ভাবলে ভুল কাজ হবে।

ঐরকম ভাবে কোনো কিছু ধারণা করা উচিত নয়। চেতনার মধ্যে তেমনতরো অনুভব এনে ফেলা ঠিক নয়। যখন তুমি নিখুঁত ভাবে অনুভূতি গ্রহণে দক্ষ হতে পারবে আর প্রতিটি স্পন্দন-ক্রিয়ার সঠিক মূল্য যাচাই করতে পারবে, তখনই তাকে চেনা সম্ভব হতে পারে। বাইরের স্পন্দন থেকে মন প্রাণ দেহের মধ্যে ও এমন কি চৈত্যের মধ্যেও যা আসে তার তদনুযায়ী বিশেষ রকমের লক্ষণ থাকে, কিন্তু ভগবানের প্রভাব নিয়ে যা আসে তা হয় সম্পূর্ণ আলাদা রকমের জিনিস ও তার তেমনি সম্পূর্ণ আলাদা রকমের লক্ষণ থাকে। তার পার্থক্য চিনে নিতে হলে প্রথমত দুই রকমেরই জিনিসকে অনুভব করতে জানা দরকার; আর তা জানা থাকলেও খুবই শান্ত সুস্থির ও ঐকান্তিক ভাবে নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করতে হয়, যাতে কিছুমাত্র ভুলচুক না হয়। তার মধ্যে তোমার নিজের দিকের চিন্তাধারা সক্রিয় হলেই সব কিছু ভেস্তে গেল, তখন আর কোনোটিকে পৃথক ক'রে চিনে নিতে পারবে না। তখন কেবল নিজেরই দিক দিয়ে ভালোমন্দ ঠাউরে দেখতে চাইবে যে কোনটা খাঁটি ভগবানের জিনিস আর কোনটা তা নয়। তোমার নিজের পক্ষে তা সঠিক জানা অসম্ভব এবং বৃথা চেষ্টা।

যদি কেউ এমন হয় যার দুই রকমেরই অভিজ্ঞতা আছে, তথাপি তার বেলাতেও সর্বদা হুঁশিয়ার হয়ে থাকা দরকার যাতে কোনোরকম ভুল ধারণা এসে ঢুকে পড়তে না পারে। কেবল যখন তোমার চৈত্যসত্তার বন্ধ দরজা খুলে গিয়ে চেতনভাবে তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে, আর ভগবৎ সান্নিধ্য সুস্পষ্ট অনুভব করতে থাকবে, যখন তুমি এমন বোধ করবে যে জীবনে এক নতুন সত্তা হয়ে তুমি নবজন্ম লাভ করেছ, পূর্বেকার দৃষ্টি নিয়ে কিছু আর দেখছ না, পূর্বেকার রীতিতে আর কিছু অনুভব করোনা—কেবল তখনই সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গ হয়ে আপন গভীরে জানবে যে আসল দিব্যজীবন কাকে বলে এবং তার পরেও, সেই দরজা দৈবাৎ আবার যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবুও তার স্মৃতিটি তখন অটুট থাকবে। এই ভাবে যদি তুমি দেখতে পারো তাহলে সে ক্ষেত্রে কোনো ভুলভ্রান্তি আসতে পারা অসম্ভব। এ এমন

একটা অবস্থান্তর যার সঙ্গে অন্য কোনো কিছু তুলনাই হতে পারে না। তা অনন্যসাধারণ ও অনবদ্য। সেইজন্যই আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, "তুমি কি ঠিক চিনে নিতে পেরেছ?" কারণ তোমাদের মধ্যে কারো যদি তেমন অভিজ্ঞতা ঘটে থাকে তাহলে সে নির্ভুল রকমেই জানবে যে কোন জিনিসটি ভগবানের দিক থেকে এসেছে, আর তাও জানবে যে কোনটা তেমন জিনিস নয়। আমি প্রশ্নটা ঐ ভাবেই করেছিলাম। যদি তোমাদের ভিতর-কার কেউ প্রকৃত আন্তরিকভাবেই বলতো, "আমি ঠিকই জানি, কারণ আমার সেই অভিজ্ঞতা নিলেছে", তাহলে আমি অত্যন্ত খুশি হতাম। বাস্তবিক তেমন অভিজ্ঞতা ঘটলেই তবে জানা যায় সে জিনিস কেমন, তার আগে নয়।

এ পথে প্রকৃতই কেউ যদি অগ্রসর হতে চায়, তাহলে প্রতি পদে পদে তাকে জানতে চেষ্টা করতে হবে যে কোন দিক থেকে কোনটা ইঙ্গিত আসছে—কে আমাকে এই প্রেরণা দিচ্ছে? তা কি আমার নিজেরই কোনো অংশ বলছে, কিংবা তা বাইরের কোনো দিক থেকে এসেছে? অথবা তা খাঁটি ভগবানেরই দিক থেকে এলো?

কিন্তু সেরূপ খাঁটি অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি না আসা পর্যন্ত তোমার নিজের মনের ভাবনা দিয়ে তার নির্ণয় করতে পারবে না। অবশ্য তোমার সমর্পণ যদি যথার্থই ঐকান্তিক হয়ে থাকে, তোমার সত্তার অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন যদি সর্বদার জন্যই জাগরূক থাকে—"প্রভু তোমারই যা ইচ্ছা তাই হোক" এই ভাবে—তখন তুমি নিজের মনের থেকে কিছু না জেনে না বুঝে আপন সহজাত বোধ থেকেই সঠিক ভাবে বেছে নিতে পারবে যে কোন কাজটি তোমাকে করতে হবে আর কোন জিনিসকে বর্জন করতে হবে, সে নির্ধারণ তোমার মধ্যে আপনা হতেই হতে পারবে। কিন্তু তা হবে কেবল তখনই যখন তোমার সমর্পণ হবে সব দিক পূর্ণ ও নিখুঁত, আর ওটাই তার বিশেষ প্রমাণ যে সঠিক রকমের কাজগুলি তোমার দ্বারা আপনা হতেই তখন হচ্ছে, তুমি বুঝে দেখার বা জানতে পারার আগেই।

শ্রীঅরবিন্দ এখানে সেই কথাই বিশেষ ক'রে বলছেন যে তোমার মধ্যে থাকা চাই অকুণ্ঠ দ্বিধাশূন্য পুরোপুরি বাধ্যতা, তুমি বিনা বিচারে বিনা কৈফিয়তে ভগবৎ নির্দেশ নিত্য পালন ক'রে চলবে। মনের চিন্তাতে বা প্রাণের তরফ থেকে কোনো বিদ্রোহ কিংবা বিপরীত মনোভাব কিংবা বিরুদ্ধ প্রশ্ন ও যুক্তিতর্ক (এমন কি ভগবানের আনুকূল্যেও) তোমার মধ্যে স্থান পাবেনা, তুমি ঠিক কাজ করছ কিনা সে প্রশ্ন আসবেই না। তেমন কোনো প্রবৃত্তি তোমার মধ্যে আর থাকবেই না।

মোট কথা, যে পন্থাই তুমি গ্রহণ করো, সমর্পণের, ভক্তির অথবা জ্ঞানের, সবতেই তার পূর্ণতায় আনা সমান ভাবেই কঠিন এবং তার জন্য একটিমাত্র উপায় আছে—সম্পূর্ণরূপে অকপট বিশুদ্ধ আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা, নিখুঁত নির্ভেজাল খাঁটি একাগ্রতা।

পুরো নির্ভেজাল ঐকান্তিকতা কাকে বলে তা জানো তো?...

নিজেকে কখনই তুমি ঠকাবে না, সত্তার ভিতরকার কোনো অংশই অন্যান্য অংশকে ফুস্‌লে ভুল বোঝাতে চেষ্টা করবে না, তোমার কাজকে কোনো অংশই যেন যুক্তি দ্বারা বিচার করতে না চায়, কোনো অন্যায় করা হয়ে থাকলে সেদিকে যেন চোখ বুজে না থাকতে চায়, ওটা এমন বিশেষ কিছু নয় বলে অতি সামান্য ত্রুটিও যেন এড়িয়ে যেতে না চায়।

হাঁ, এমন হতে পারা অবশ্য খুবই কঠিন। কেবল এক ঘন্টা মাত্রেরই জন্য যদি

চেষ্টা ক'রে দেখ তাহলে নিজেই তা বুঝবে। কেবল একটি ঘন্টা তুমি পুরো ঐকান্তিক হয়ে থাকার চেষ্টা করো, কোনো কিছু ত্রুটি যেন এড়িয়ে না যেতে পারে। অর্থাৎ তুমি যাই কেন করো, যে কথাই ভাবো, যা কিছুই চাও, যা কিছু অনুভব করো, সমস্তই যেন হয় কেবল একমাত্র ভগবান ঘিরে ও ভগবান সম্পর্কে।

একবার তাই চেষ্টা করো, প্রচেষ্টা নিয়ে থাকো অন্ততপক্ষে আর ঘন্টারও জন্যেও, তাহলেই দেখবে, এ কাজ কতখানি কঠিন।

আর সেই সঙ্গে সতর্ক থাকবে যেন ঐ সময়টুকুর মধ্যে তোমার দেহ-প্রাণ-মনের সামান্য-মাত্র অংশও যেন পিছনদিকে এমনভাবে লুকিয়ে থাকতে না পারে যাতে সেটা তোমার নজরকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হয় (বা নিজের হাত দুটি পিছনের দিকে লুকিয়ে দেখালেন), আর কোনোখানের কোনো অংশ যে তোমার কাজকে সমর্থন দিচ্ছেনা সেটা যেন তোমার দৃষ্টি এড়াতে না পারে—আর তুমি সেটা তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলতে না পেরে দিব্য নিশ্চিত হয়ে থাকো।...

সেই সব প্রতিকূল অংশ যদিও স্পষ্টভাবে কিছু বলেনা বা জানায় না, তথাপি তা অপরিবর্তনের ভাব নিয়ে পিছনের দিকে চুপ ক'রে আড়াল হয়ে থাকে। এমন লুকোন অংশ যে কতই তোমার মধ্যে রয়েছে!

তুমি সেগুলিকে পকেটের মধ্যে ভরে ফেল, যাতে সেগুলো তোমার পিছনে পিঠের মাঝখানে ঘুরে গিয়ে এমন অদৃশ্যভাবে না লুকোয় যাতে তুমি তাদের দেখতেই না পাও।

যখন তোমার সন্ধানের টর্চবাতি নিয়ে—তোমার ঐকান্তিকতার স্বচ্ছ টর্চের আলো জেলে—সমস্ত কোণে কোণে আলো ফেলে অনুসন্ধান ক'রে দেখ যে কোন জিনিসটা সাড়া না দিয়ে চুপ ক'রে আছে, কিংবা অটল থেকে বলছে, "আমি কিন্তু একটুও নড়ছিনা, নিজের জায়গাটিতে গাঁট হয়ে বসে রইলাম, কেউ আমাকে একটুও নড়াতে পারবে না!" তখন তুমি তোমার সেই টর্চটির তীব্র রশ্মি সেগুলোর উপরে নিক্ষেপ করতে থাকবে এবং তখন সুস্পষ্ট রূপেই তোমার নজরে আসবে যে ঐভাবে পিছনের দিকে কোণে কোণে কত কিছুই গোপনে শিকড় গেড়েছে।

তাই বলছি, কেবল একটি ঘন্টার জন্যে চেষ্টা ক'রে দেখো।

তোমাদের আর কিছু প্রশ্ন আছে কি?

কারো কিছু বক্তব্য নেই?

তাহলে আমার ছেলেমেয়েরা, Au revoir—আবার দেখা হবে।*

—শ্রীমা

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

বসুধার ভাষণ

[১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ তারিখে শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রে 'Knowledge'-এর ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট প্রদত্ত ভাষণ]

অনুবাদ : রীণা মিত্র

(এক)

বসুধা—তোমরা আমাকে শ্রীমা'র সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য আহ্বান করেছো, কিন্তু আমার মনে হয়, তেমন কিছু কি আমি বলতে পারবো যা তোমাদের যথেষ্ট তৃপ্তি দিতে পারবে? একদিক থেকে বলতে গেলে আমার তরফ থেকে কিছুই বলবার নেই—তবে তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসার থাকে আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী তার উত্তর দিতে চেষ্টা করবো। তার আগে যারা আমাকে চেন না তাদের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে নিই—আগামী কাল ১৯শে ফেব্রুয়ারী, আমার এখানে ঠিক সাত চল্লিশ বছর পূর্ণ হবে। আমি পণ্ডিচেরী এসেছিলাম ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ সাল।

যাক্ আমি এবার খুবই উৎসুক তোমাদের প্রশ্নের জন্যে। কোনো প্রশ্ন আছে কি?

প্রশ্ন—সারা দিনে শ্রীমা'র কি কি কাজ ছিল?

বসুধা—তোমরা শ্রীমা'র সমস্ত দিনের কাজের তালিকা জানতে চাইছো, তাই তো? বেশ, তাই দিয়েই শুরু করি :

যখন আমি এখানে এলাম, তখন সব কিছু ঠিক এখনকার মত ছিল না। তোমরা তো জান, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই পরিবর্তন হয়। যতদূর আমার স্মরণ হয়, যে বছর আমি আশ্রমে আসি সেটা সাতচল্লিশ বছর পূর্বের কথা। তখন দিনে তিনবার ধ্যান হত—সকালে, বিকালে ও রাত্রে। সে-সময় কোনো বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, কোনো কর্ম-বিভাগ এমন কি ছাপাখানা পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু তখন শ্রীমা প্রত্যহ কিছু সংখ্যক ভক্তকে দেখতেন—এই সব ভক্তদের সংখ্যা থাকত সীমিত। সকাল থেকেই তা সুরু হত। সন্ধ্যার দিকে শ্রীমা বাইরে বের হতেন এবং প্রায় সাতটা কি আটটার সময় তিনি সাধকদের 'সুপ' বিতরণ করতেন। আমি যখন এলাম তখন এই ছিল একমাত্র কাজ, যেখানে সকলেই অংশ গ্রহণ করতে পারতো।

প্রশ্ন—আপনি কি করে এখানে এলেন?

বসুধা—কি করে আমি এখানে এলাম, সেই গল্পটা কি তবে তোমাদের বলবো? গল্পটা বেশ লম্বা। ১৯২৮ সালে আমি যখন এখানে এলাম তখন আমার বয়স চোদ্দ বছর। আমার বড়দাদা ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। তিনি ১৯২৭ সালে স্থায়ীভাবে আশ্রমে আসতে

চাইলেন। এর পূর্ব্বে বার দুই তিনি আশ্রমে এসে কিছুদিন ক'রে থেকে গিয়েছেন। তাঁর আশ্রমে স্থায়ীভাবে থাকবার ইচ্ছা, কিন্তু শ্রীমাকে জানালে শ্রীমা তাঁকে বললেন—"যখন আমার প্রয়োজন হবে তখন তোমাকে ডাকবো।"

এ-সব কথা আমি কিছুই জানতাম না, ছোট ছিলাম বলে বাড়ীর কেউ আমাকে কিছু বলেনি। ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে দাদাই একদিন আমাকে বললেন—"মাকে চিঠি লেখ এই বলে যে, তুমি আশ্রমে থাকতে চাও।" কেমন করে ইংরেজীতে চিঠি লিখতে হয় তখন তা আমি জানতাম না, সুতরাং দাদাকে বললাম, "কি লিখতে হবে আমি জানি না, যদি তুমি আমাকে বলে দাও তাহলে আমি লিখতে পারি।"

দাদা সংক্ষেপে এইটুকু কথা আমাকে বলে দিলেন—

"শ্রীচরণকমলেষু,

ভগবতী-জননী, আমি আশ্রমে থাকতে চাই।...

বসুধা।"

এই কথা ক'টি আমি লিখলাম, এবং দাদা তাঁর চিঠির সঙ্গে আমার এই লেখাটুকুও শ্রীমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমার মনে হয় শ্রীমায়ের সঙ্গে আমাদের চিঠি-পত্রের যোগাযোগ হত চম্পকলালের মাধ্যমে। তোমরা নিশ্চয়ই চম্পকলালকে জান? চম্পকলাল আমাদের একই সহরের মানুষ। আমরা ছোট বেলা থেকেই চম্পকলালকে চিনি। সুতরাং দাদা চম্পকলালকেই লিখলেন এবং উত্তরও এলো—শ্রীমা সম্ভবতঃ তাঁকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করে থাকবেন। আমার বয়স তখন তের বছর। কাজেই উত্তর এলো—"ছোটরা এখানে থাকতে পারবে না।"

তোমরা মনে রেখো যে, তখনকার সময় বর্ত্তমানের মত ছিল না। আশ্রম ছিল শুধু যোগের জন্য—সাধনার জন্য। অল্প বয়স্কদের বা খুব বৃদ্ধদের এখানে থাকবার অনুমতি ছিল না। যোগের জন্য যারা প্রস্তুত শুধু তেমন আশ্পৃহা-পরায়ণ, শক্ত-সমর্থ ব্যক্তিদেরই শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ থাকবার অনুমতি দিতেন। এ নিয়ম শুধু যারা আশ্রমে থাকবে তাদের জন্যই নয়, যারা দর্শনে আসবে তাদের জন্যও। শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের নিকট যাঁরা নির্বাচিত হতেন তাঁরাই কেবল পেতেন দর্শনের অনুমতি। তাই ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীমার নিকট থেকে এই রকমই উত্তর পেলাম।

ফেব্রুয়ারী ১৯২৮। দাদা স্থায়ীভাবে পণ্ডিচেরী আসবার জন্য তৈরী হতে লাগলেন। পূর্বেই বলেছি, দাদা ছিলেন আমাদের বাড়ীর কর্তা। কারণ, যখন আমার ছয় বছর বয়স তখন আমার বাবা দেহত্যাগ করেছেন এবং চম্পলালই হয়েছেন আমাদের অভিভাবক। পরিবারে তখন আমরা এই কয়েকজন লোক—আমি মা ও বৌদি, আর আমার এক ভাই তখন পুণাতে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নরত। স্থায়ীভাবে আশ্রমে আসার পূর্ব পর্যন্ত দাদাকে আমাদের জীবিকার সব রকম ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হতো। যেহেতু আমি ছিলাম ছোট, দাদার খুবই ইচ্ছা ছিল যে, আমিও আশ্রমে এসে থাকি। অথচ শ্রীমায়ের কাছ থেকে কি উত্তর এলো তা তো তোমাদের পূর্বেই বলেছি। কাজেই দাদা যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফেব্রুয়ারী মাসেই আশ্রমে আসবেন তখন আর বিলম্ব না করে ১৭ই বম্বে থেকে রওনা দিয়ে ১৯শে পৌঁছাবেন ঠিক করলেন। কারণ ২১শে ছিল দর্শনের দিন। ইতিমধ্যে ১৪ই

কিংবা ১৫ই দাদা পণ্ডিচেরী থেকে আমাদের একজন পরিচিত—কমলাবেনের পিতা কাশীভাই-এর একটি পত্র পেলেন। দাদা তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন—"আমি ১৭ই ফেব্রুয়ারী পণ্ডিচেরী রওনা হচ্ছি।"

কাশীভাই উত্তরে জানালেন—"কেন বলছো 'আমি আসছি'? তবে কি তুমি একা আসছো? কিন্তু যখন বসুধা অনুমতি পেয়েছে—তখন কেন বলছো না 'আমরা আসছি'? তুমি কি তবে ওকে সঙ্গে আনছো না?"

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে অনুমতি না পাওয়ার পর শ্রীমাকে আর কোনো চিঠি দিইনি। তখনই তো জেনেছিলাম "ছোটদের জন্য এ জায়গা নয়"—এ কথা পরিষ্কার লেখা রয়েছে। সুতরাং তারপর তিনমাস কাটতে না কাটতেই আবার অনুমতি চাইবার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু দাদা ভাবলেন কাশীভাই-এর কথা অনুযায়ী যদি সত্যিই আমি দর্শনের বা থাকবার অনুমতি পেয়ে থাকি, তাহলে এ সুযোগ অবহেলা করা উচিত হবে না; কিংবা, এমতাবস্থায় যদি তিনি আমাকে সঙ্গে না নিয়ে আসেন তাহলে এটা তাঁর দিক থেকে ভারি অন্যায় হবে।

তাছাড়া আরও একটা দিক ভাববার ছিল—যদি প্রকৃতপক্ষে আমি অনুমতি না-ই পেয়ে থাকি এবং খবরটি যদি সত্য না হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে নিয়ে যাওয়া মানে শুধু শুধু দাদার কতকগুলো টাকা খরচ—না পাবো আমি দর্শন করতে, না পাবো সেখানে থাকবার অনুমতি।

এতসব চিন্তা করে দাদা পড়লেন উভয় সঙ্কটে—না পারছেন সুযোগ ছাড়তে, আবার শুধু শুধু নিয়ে যেতেও চাইছেন না। তবে এখন কি করা যায়? চিঠি লিখে উত্তর পাওয়ার মত সময়ও হাতে নেই। নানা দিক ভেবে দাদা কাশীভাইকে এই মর্মে একটা টেলিগ্রাম করলেন—"আপনি বলছেন বসুধা অনুমতি পেয়েছে, সত্যি কি? আসবার জন্য আপনার উত্তরের অপেক্ষায় আছি।"

তিনি টেলিগ্রামেই খবর পাঠালেন—"হ্যাঁ"।

সুতরাং ১৭ই রাতে রওনা দিয়ে আমরা ১৯শে প্রায় তিনটায় পণ্ডিচেরী পৌঁছলাম। চম্পকলাল সাইকেলে করে ষ্টেশনে এলেন আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে। (হাস্য)

পণ্ডিচেরী এসে জীবনে এই প্রথম রিক্সা দেখলাম—একজন মানুষ সেই রিক্সা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দাদা তাঁর সঙ্গে সেই রিক্সায় আমাকে বসতে বললেন। আমার কিন্তু বুক ফেটে যেতে লাগল এই ভেবে যে, একটি মানুষ অন্য মানুষদের কেমন করে টেনে নিয়ে চলেছে। মুখে অবশ্য কিছুই বলতে পারলাম না।

কি ভাবে আমার আশ্রমে আসবার অনুমতি হলো জানবার জন্য দাদা খুবই উৎসুক হয়ে ছিলেন। যে-আমি তিনমাস আগে পর্যন্ত অনুমতি পাইনি এখন কি করে তা সম্ভব হলো? তিনি চম্পকলালকে এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে অনুরোধ করলেন। তখন চম্পকলাল সকল ঘটনা খুলে বললেন—

ঘটনাটা ঘটেছিল এইরকম:

দাদা স্থায়ীভাবে আশ্রমে চলে আসছেন শুনে আমার বৌদি (দাদার স্ত্রী) শ্রীমাকে চিঠি লেখেন আশ্রমে আসবার জন্য অনুমতি চেয়ে। চিঠিটা গুজরাতিতে লেখা,

তাই চম্পকলাল শ্রীমাকে চিঠিটা পড়ে শোনান। চিঠির শেষে লেখা ছিল—'স্নেহভাজন'। সম্পূর্ণ চিঠিটা পড়ার পর চম্পকলাল চন্দুলালের বৌ-এর পরিবর্তে বোন এই চিঠি লিখেছে শ্রীমাকে বলেন। (হাস্য)

শ্রীমা উত্তর দিলেন—"সে আসতে পারে।"

আমি এ কথা শুনে খুবই মর্মাহত হলাম। নিজেকে নিজে বলাম—"আমি এক্ষুনি ফিরে যেতে চাই। ভুল করে এখানে এসে পড়েছি।"

কিন্তু দাদাকে আমি সবসময় বাবার মত ভয় ও সমীহ করে চলতাম। তাঁর কাছে সহজে কোনো কথা বলতে পারতাম না, তাই এবারও চুপ করে রইলাম—তাঁকে কিছু বললাম না। মনে মনে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলাম কিন্তু তবুও তাঁদের কথায় কান না দিয়েও থাকতে পারছিলাম না। চম্পকলাল সাইকেলে চড়ে দাদার পাশে পাশে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন। চম্পকলাল বলতে লাগলেন—"তখন হঠাৎ আমার মনে পড়তেই শ্রীমাকে বললাম—"মা, মাগো, আমার ভীষণ ভুল হয়ে গিয়েছে। অনুমতি চেয়ে যে চিঠি লিখেছে সে চন্দুলালের বোন নয়, তার স্ত্রী। আমি খুব ভুল করে ফেলেছি।"

শ্রীমা বললেন—"খুব ভাল কথা। তুমি ভুল করেছ, আমি তো করিনি। (হাস্য) আমি তার বোনকে অনুমতি দিয়েছি, তার স্ত্রীকে নয়।" এই কথা শুনে আমি তখন আশ্বস্ত হলাম।

এই হলো আমার এখানে আসার ঘটনা।

এই প্রসঙ্গে আরও একটু তোমাদের কাছে বলতে চাই—তখন আমি বম্বে-স্কুলে পড়ছি। তাই পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে দর্শনে এসেছিলাম। স্বভাবতঃই আমি ছিলাম খুবই অল্পভাষী। যেমন আমার দাদার কাছে তেমনি বাড়ীতেও খুবই কম কথা বলতাম। কাজেই আশ্রম সম্বন্ধে অনেক কৌতূহল থাকলেও কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারতাম না। ট্রেনে বসে বসে নিজের মনেই আশ্রম সম্পর্কে ভাবতে লাগলাম—"পনেরো দিন আমার পক্ষে খুবই বেশী। যোগ সম্বন্ধে পুরাতন প্রথা অনুযায়ী আমার ধারণা ছিল—লোকেরা আশ্রমে গুরুগম্ভীর মুখে চোখ বন্ধ করে সর্বদা ধ্যানে নিবিষ্ট থাকবে। কেউ কখনও হাসবে না বা কথা বলবে না। সুতরাং এমন পরিবেশে পনেরোটা দিন আমি কি করে কাটাব? মনে মনে ভাবতে লাগলাম—আমরা ১৯শে পৌঁছবো, ২০শে ওখানে থাকতে হবে, কেন না ২১শে দর্শন; কিন্তু ২২শে আর নয়।" অতি উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু আমি বুঝতেই পারিনি কি করে কোথা দিয়ে কেটে গেল আমার সেই পনেরো দিন। পরে পনেরো বছরই শুধু নয়, আরও অনেক অনেক বছর কেটে গিয়েছে, এবং এখনও আমি এখানেই...

প্রশ্ন—যেদিন আপনি আশ্রমে পৌঁছলেন সেই দিনই কি শ্রীমায়ের দর্শন পেয়েছিলেন?

বসুধা—হ্যাঁ, সেই দিই শ্রীমায়ের দর্শন পেলাম—আমি ও দাদা। দরতোয়ারের পেছনের দিকে যেখানে এখন তারা অহর থাকে সেইখানে অতিথিশালায় আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হলো। আশ্রমে উপরে যেখানে প্রসূপারিটি ঘর রয়েছে সেইখানে রাত সাতটা

কি আটটার সময় আমাদের শ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করা হলো। আমার মনে হয়, চম্পকলাল আগে থেকেই গোলাপের মালা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। চম্পকলালের ঘর পার হয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে প্রসূপারিটি ঘরে ঢুকলাম। বেশ মনে আছে প্রথম শ্রীমাকে দেখেছিলাম—শ্রীমা দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রসূপারিটির হল ঘরের মধ্যে। শ্রীমার কাছে গিয়ে কি করতে হবে না হবে আমি কিছুই জানতাম না। কাজেই দাদা যা করছিলেন আমি তাই অনুকরণ করতে লাগলাম। দাদা শ্রীমাকে ফুলের মালা দিয়ে প্রণাম করলেন। আমিও একটি ফুলের মালা শ্রীমাকে দিয়ে প্রণাম করলাম। মালাটি যে থালায় রাখা ছিল তাতে মালা থেকে কয়েকটি পাপিড় ঝরে পড়েছিল, আমি সেগুলো একটি একটি করে তুলে নিয়ে শ্রীমায়ের হাতে দিয়ে পুনরায় তাঁকে প্রণাম করলাম। শ্রীমা আমার দিকে তাকিয়ে মধুর হাসি হাসলেন। শ্রীমার সেই হাসি দেখে আমি সকল বেদনা তৎক্ষণাৎ ভুলে গেলাম।

আমার দুর্ভাগ্য যে, স্কুলে যথেষ্ট পরিমানে শিক্ষা আমি নিতে পারিনি। ইংরেজী ভাষা জানিনে। তখন সবে মাত্র ইংরেজী শিখতে সুরু করেছি। তবে মাতৃভাষার উপর আমার বেশ দখল ছিল। ইংরেজী লেখা-পড়া এখানে এসে আবার সুরু করলাম বিশেষ করে কথা বলা ও শোনা। কাজেই আমার ভাষা জনসভায় বক্তৃতা দেবার মত নয়।

প্রশ্ন—শ্রীমায়ের মানবীয় দিক আপনি কি দেখতে পেয়েছেন?

বসুধা—কিন্তু তার আগে তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, শ্রীমায়ের মানবীয় দিক বলতে তোমরা কী অর্থ করছো? সাধারণ মানুষের মত তাঁর আচার-ব্যবহার? তাহলে শোন—গর্ভধারিণী মায়ের মত তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আদর করেছেন, কখনও পিঠ চাপড়ে উৎসাহিত করেছেন, আবার কখনও বা মৃদু ভর্ৎসনাও করেছেন। এক দিক দিয়ে দেখলে, সাধারণ মানবী কিংবা ভগবতী মায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। আমাদের সঙ্গে তাঁর সকল রকম মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে কিছু না কিছু ঈশ্বরীয় ভাব ছিলই। তবে সেটা কেমন জিনিস তা মুখে বলা খুবই শক্ত। শ্রীঅরবিন্দও তো শ্রীমায়ের দেবত্ব সম্পর্কে অনেক কিছুই বলেছেন, নয় কি? সাধারণ মানবীয় দিক তো আমরা সকলেই জানি...

প্রশ্ন—কিন্তু আপনি কি দেখেছেন?

বসুধা—ভগবতী বলতে যে কি বুঝায় তা আমি বোঝাতে পারবো না। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তিনি ভগবতী জননী। আমিও শ্রীমাকে ঠিক সেই ভাবেই গ্রহণ করেছি। তিনি আমাকে যখন যেমন ভাবে আদেশ করেছেন আমিও তাই যতখানি সম্ভব সর্বান্তকরণে পালন করেছি। এইটুকুই আমি বলতে পারি। তাঁর মানবীয় দিক সকলেই জানেন। কারণ, অনেকেই সকলেই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, অনেকেই তাঁকে দেখেছেন, বা অনেকেই তাঁর সঙ্গে বহুদিন বাস করেছেন। যা-কিছু অনুভব করেছি, তা আমার কাছে চরমসত্য; আমি আমার হৃদয় দিয়ে মন প্রাণ দিয়ে আমার সকল অনুভূতি দিয়ে অনুভব করেছি।

প্রশ্ন—আমরা শুনেছি যে শ্রীমায়ের নাকি খুব সূক্ষ্ম রসবোধ ছিল?

বসুধা—শ্রীমায়ের রসবোধ? কি জানি, আমরা তো শুনেছি শ্রীঅরবিন্দেরই সূক্ষ্ম রসবোধের কথা; শ্রীমা'র রসবোধের কথা তো শুনিনি। যতদূর জানি, শ্রীমা বরং ছিলেন অপেক্ষাকৃত গম্ভীর প্রকৃতির।

প্রশ্ন—সেই সময় আর কি কি কাজ ছিল?

বসুধা—স্বভাবতঃই জিনিষপত্রের এবং আশ্রমবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজ-কর্মেরও পরিবর্তন হতে লাগল। অনেক আগে কি হত বলতে পারবো না, তবে পরে ছাপাখানা খোলা হলো। শ্রীমা প্রায়ই সেখানে যেতেন। আমাদের আর একটি সম্পত্তি ছিল—লেক। সেখানেও বিকেলের দিকে শ্রীমা মাঝে মাঝে যেতেন। খেলার মাঠ যখন হলো তিনি সেখানে যেতে আরম্ভ করলেন। হলো খেলাধূলার নানা রকম ব্যবস্থা। শ্রীমা প্রায়ই সেখানে গিয়ে তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। তারপর স্কুল হলে সেখানকার অনুষ্ঠানে যোগদান করলেন। তিনি নিজেও টেনিস খেলতে সুরু করেন—সে তো তোমরা জান। এইভাবে আশ্রমের কাজ-কর্মের বৃদ্ধি হতে লাগল। শ্রীমায়ের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় নানা রকম কাজকর্ম এবং কর্ম-বিভাগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

প্রশ্ন—আপনি কি ভাবে শ্রীমা'র সেবার কাজে নিযুক্ত হলেন?

বসুধা—এ কাহিনীটাও মস্ত বড়। হঠাৎ একদিন মায়ের সেবার কাজে নিযুক্ত হইনি। এটা ঘটেছিল ক্রমে ক্রমে; খুবই ধীরে ধীরে। তোমাদের কি প্রথম থেকেই শুনবার ধৈর্য্য হবে? না কি শেষের দিকের ঘটনা কিছু বলবো? ওহো! তোমরা প্রথম থেকেই শুনতে চাইছো? বেশ, তাই বলবো? কি করে প্রথম আমার কাজ আরম্ভ হলো সেটা থেকেই সুরু করি:

২১শে ফেব্রুয়ারী দর্শন করতেই আমি এখানে এসেছিলাম। শ্রীঅরবিন্দকে প্রথম দর্শন করি। তারপর একদিন কি দুদিন পরে আমার দাদা শ্রীমা'র সঙ্গে দেখা করেন। তখন শ্রীমা দাদাকে বলেন—"তোমার ছোট বোনটি ভারি সুন্দর। শ্রীঅরবিন্দও খুব প্রশংসা করেছেন।" আরও খানিকটা যোগ করে বললেন,—"যদি সে এখানে থাকতে চায়, আমি তাকে রাখতে পারি।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন—"তবে যদি সে বিয়ে করতে না চায়।"

সে সময়ে আশ্রমে এসে বিয়ে করা বা বিবাহিত জীবন যাপন করার কোনো প্রশ্নই ছিল না। শ্রীমা'র কাছ থেকে ফিরে এসে দাদা আমাকে শ্রীমা যা বলেছেন সব জানালেন। বিয়ের সম্বন্ধে আমি তখনও পর্যন্ত কোনো রকম চিন্তাই করিনি, কাজেই দাদার মুখে অমন কথা শুনে খুবই লজ্জিত হয়েছিলাম। বিয়ে করবো কি করবো না কোনো কথাই কখনও দাদাকে বলিনি। তবু যা হোক, সেদিন দাদাকে বললাম—"হাঁ, আমি এখানে থাকতে চাই এবং বিয়ে করতে চাই না।" মায়ের মুখের হাসি দেখলেই আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। এখানকার এই কঠিন পরিবেশ বা বাড়ীর সকল কথা—সবই মায়ের সেই হাসি আমায় ভুলিয়ে দিতো।

পূর্বেই তোমাদের বলেছি, সন্ধ্যা সাতটা কি আটটার সময় শ্রীমা সুপ বিতরণ করতেন। এই সময় তিনি ছাতের দিকে মুখ করে প্রসূপারিটি ঘরের বারান্দায় বসতেন। আমরা প্রত্যেকে কাপ হাতে নিয়ে লাইন দিয়ে শ্রীমা'র কাছে যেতাম, শ্রীমা তাতে সুপ ভর্তি করে প্রসাদ করে সকলকে ফিরিয়ে দিতেন। তোমরা জান হয়তো, শ্রীমা তখন শাড়ী পরতেন। পরে তিনি গাউন, সালোয়ার-কামিজ ইত্যাদি পরতে সুরু করেন। সাধারণতঃ তিনি শাড়ী দিয়ে মাথা ঢেকে দিয়ে একটা ব্যাণ্ড দিয়ে কপালটায় বেঁধে রাখতেন যাতে শাড়ীটা ঠিক ঠিক থাকে। কখনো কখনো ব্যাণ্ড থাকতো সাধাসিধা আবার কখনো-বা তাতে সেলাই করা নানা রকম বুটি বা ফুল থাকতো। আমি এখানে আসার কিছুদিন পরে শ্রীমা'র কপালে ভেল্‌ভেটের জরির কাজ করা ব্যাণ্ড বাধা দেখলাম। উত্তর ভারতে যেমন দেখা যায় সোনালী ও রূপালী কাজ করা জরির টুপী—এও ঠিক সেই রকম। আশ্রমবাসীরা একেই বলতেন 'মুকুট'। দেশের স্কুলে আমি এই রকম জরির কাজ শিখেছিলাম, কাজেই যখন সুপের জন্য শ্রীমা'র কাছে গেলাম, শ্রীমাকে আমার ভাষায় বললাম—"না, এই ধরনের কাজ আমি করতে জানি।" (হাস্য)

আমি যে কি বললাম, শ্রীমা তা কিছুই বুঝতে পারলেন না। চম্পকলাল পাশের ঘরেই ছিলেন, তিনি তাঁকে ডাকতে লাগলেন,—"চম্পকলাল, চম্পকলাল..."

চম্পকলাল ছুটতে ছুটতে এলেন। শ্রীমা চম্পকলালকে তখন বললেন—"এ কি বলছে শোনো তো?" (হাস্য)

আমি চম্পকলালকে আমার বক্তব্য বললাম। তিনি আবার আমার কথা শ্রীমাকে ইংরেজীতে বলে দিলেন। সব কথা শুনে শ্রীমা হাসলেন, কিছু বললেন না।

পরের দিন দত্তা আমাকে ডেকে পাঠালেন। দত্তা কে, তোমরা কি জান?—তিনি একজন ইংরেজ মহিলা—শ্রীমা'র সঙ্গে জাপান থেকে এসেছিলেন। তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাকে কি দিয়েছিলেন জান? কি যে তা আমিও জানতাম না। সেটা হলো একটা পুরাতন শীতল পাটির টুকরো। দত্তা সেটি আমাকে দিয়ে বললেন,—"ফুলদানীর তলায় রাখবার জন্যে নানারকম নমুনার কিছু আসন শ্রীমা চেয়েছেন।" এমন ধরনের কাজ আমি আগে কখনও করিনি; তবুও হাতে নিয়ে বললাম, "ঠিক আছে।" কোনো কাজে কখনও "না" বলা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। ফুলদানীর আসনগুলোয় ধার বোড়বার জন্য কিছু কাপড় ও মসৃণ সুতোর দরকার। অথচ সে বিষয়ে দত্তা আমাকে কিছুই বললেন না। আমিও ইংরেজী জানি না বলে তাঁকে এই বিষয়ে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। শীতল পাটির টুকরো নিয়ে ঘরে চলে এলাম। আমার কাছে একটি কাঁচি ছিল। সেই কাঁচি দিয়ে পাটিটাকে গোল, চৌকোণা, তিনকোণা, ষড়ভুজ ও অষ্টভুজের মত জ্যামিতিক আকারে কাটতে আরম্ভ করলাম। কাটার পর চার দিক থেকে কাঠিগুলো বেরিয়ে আসতে লাগল। ধারগুলো সেলাই করার মত সুতো বা কাপড়েরই হলো অভাব। দাদা আশ্রমের গৃহ নির্মাণ বিভাগের দেখাশোনা করতেন। তিনি কাজ থেকে ফিরলে তাঁকে বললাম, "এই কাজ পেয়েছি, এখন আমার কিছু কাপড় ও সিল্কের সুতো চাই।"

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তখনকার সময়ে আশ্রমে খুবই কড়াকড়ি ছিল। আশ্রমবাসীরা

কেউই নিজেদের কাছে টাকাকড়ি রাখতে পারতো না। যার যা থাকতো সবই শ্রীমা'র নিকট সমর্পণ করে দিত। শ্রীমাও যার যেমন প্রয়োজন তা সবই মিটাতেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমার কাছে কোনো টাকাকড়ি ছিল না, দাদারও যা-কিছু ছিল সবই শ্রীমাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। যার যেমন প্রয়োজন সেই অনুযায়ী প্রত্যেক মাসে শ্রীমা সাধকদের কিছু হাত খরচা দিতেন—চার-পাঁচ টাকা, কি কিছু বেশী। বর্তমানের বাজারে এ খুবই সামান্য হলেও তখনকার দিনে তা-ই ছিল যথেষ্ট। পন্ডিচেরীতে তখন জিনিষপত্র ছিল খুবই সস্তা। আমি জানতাম দাদা কিছু হাতখরচা পেতেন, তাই আমার যা যা প্রয়োজন ছিল দাদাকে কিনে দিতে বললাম। দাদা আমাকে বাজারে নিয়ে গেলেন। বাজারে গিয়ে আমি একটি গোলাপী রঙের কাপড়ের টুকরো এবং নীল রঙের এক বাণ্ডিল সিল্কের সুতো পছন্দ করে আনলাম। তারপর শীতল পাটির ধারগুলো সরু করে মুড়ে সেলাই করলাম। আবার যেখানে যেমন প্রয়োজন বুঝলাম সেখানে সেলাই-এর মধ্যে কিছু কিছু কারুকার্যও করলাম। সব শেষ করে যখন দত্তার কাছে নিয়ে গেলাম, দত্তা সেগুলি দেখে খুবই খুশী হয়ে শ্রীমা'র কাছে নিয়ে গেলেন। যদিও শ্রীমা মুখে কিছু বলেননি, তবুও মনে হয় তিনি খুশীই হয়েছিলেন; কারণ তারপর থেকে আমার কাছে আরও বেশী বেশী সেলাই-এর কাজ আসতে লাগল।

শ্রীমাকে বলেছিলাম, আমি কিছু সূচী-শিল্পও জানি। তাই শ্রীমা'র ব্লাউজ সেলাই ও আরও নানান ধরনের সূচী-শিল্পের কাজ তিনি দত্তার মারফৎ আমাকে পাঠাতে লাগলেন। আমরা শ্রীমাকে প্রত্যহ দেখতে পেতাম—সকালে ধ্যানের সময়, সন্ধ্যায় যখন তিনি মোটরে করে বেড়াতে বের হতেন আর রাতে সুপ দেবার সময়।

দিনের পর দিন সূচী-শিল্পের কাজ বাড়তে লাগল। এই প্রসঙ্গে ললিতার কথা বলতে হয়। তোমরা কি জান, ললিতা কে? ললিতা একজন পার্শী মেয়ে, সে তখন এখানে থাকত। একবার সে অনেকগুলো শাড়ী শ্রীমাকে দেয়। শাড়ীগুলো ছিল খুব দামী। তোমরা দেখেছ নিশ্চয় পার্শী শাড়ীর আঁচলের একদিকের সূচী-শিল্প করা থাকে। শ্রীমা সেই শাড়ী বাঙালীদের মত করে পরতেন, যাতে শাড়ীর আঁচলের দুই কোণই দেখা যায়। কিন্তু এই শাড়ীগুলোর একদিকের কোণে সুন্দর সূচী-কর্ম করা আর অন্য কোণায় কিছুই না থাকায় দেখতে এত বিশ্রী লাগত কি বলবো। তাই একদিন শ্রীমাকে বললাম, আমি এই ধরণের সেলাই করতে পারি। (হাস্য)

তারপর শ্রীমা আমাকে একখানি শাড়ী পাঠিয়ে দিলেন, আর সেই সঙ্গে কিছু সিল্কের সুতো। আমি নক্সাটি শাড়ীর অপর কোণে তুলে নিয়ে ঠিক সেই রকম আর একটি ফুল তৈরী করলাম শ্রীমা দেখে ভারী খুশী হলেন। যে-সব শাড়ীতে ফুল তোলা বাকী ছিল, সেগুলোও তিনি পাঠিয়ে দিলেন কোণ পুরণ করবার জন্যে।

শ্রীমা'র সেই সময়কার আর একটি কাজের কথা তোমাদের বলতে ভুলে গিয়েছি:

সপ্তাহে তখন একবার কি দু'বার ক'রে শ্রীমা প্রত্যেক সাধকের ঘরে যেতেন। যেখানে এখন আমাদের সেলাই ডিপার্টমেন্ট হয়েছে, ওইখানে একদিন আমাদের বাড়ীতে শ্রীমা এলেন। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"আমার জন্য একটা শাড়ী ক'রে দিতে পার?"

উত্তরে শ্রীমাকে বললাম—"হ্যাঁ, নিশ্চয় পারবো।" যদিও একটি শাড়ীতে সূচী-কর্ম করা খুবই শক্ত, তাছাড়া পূর্বে কখনও শাড়ীর কাজ করিনি। তবুও শ্রীমাকে ব'লে ফেললাম—"হ্যাঁ, নিশ্চয় পারবো।"

শ্রীমা আমার কথা নকল করে বললেন—"হ্যাঁ, নিশ্চয় পারবো।" (হাস্য)

সেইদিন সন্ধ্যার সময় আমি দত্তার নিকটে গিয়ে শুনলাম, ফ্রান্স থেকে কয়েক জন লোক আসছে তারা তখনো সমুদ্র পথে, শ্রীমা আমাকে জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই তাদের কিছু সিল্কের সুতো আনতে বলেছেন। তখন প্লেনে করে আসা যেতো না, জাহাজে করেই আসতে হতো।

এমনি করেই আরম্ভ হলো শাড়ী সেলাই করা। প্রথম শাড়ীখানা আরম্ভ করলাম ১৯২৯ সালের আগষ্ট মাসে। শাড়ীতে নক্সা করলাম সাদা পদ্ম। বাইরের কাজও করলাম সাদা। শাড়ীখানা শেষ করলাম সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে। আমি সব কাজ বাদ দিয়ে প্রায় সারা দিন ধরে শাড়ী সেলাই করতাম। সে-সময় আশ্রমে খুব নামকরা চিত্রকর ছিলেন না যে, শাড়ীর জন্য নক্সা এঁকে দিতে পারেন। অবনক্রিরণই ছিলেন আমাদের একমাত্র চিত্রকর। তিনি শাড়ীর উপর কিছু সাধারণ পদ্মফুল এঁকে দিলেন যা এখন আমাদের আর্ট-স্কুলের ছোট শিশুরাও আঁকতে পারে। পরের বছর শ্রীমা তাঁর জন্মদিনে সেই শাড়ীখানা পরলেন।

কিন্তু সে যা হোক, তোমাদের জিজ্ঞাস্য হলো, কি করে আমি উপরে গিয়ে শ্রীমা'র সেবা করতে লাগলাম—

সাধারণতঃ আমি কাজ ক'রে দত্তার হাত দিয়েই শ্রীমাকে পাঠাতাম। আবার কখনো কখনো শ্রীমা আমাকে তাঁর কাছে ডাকতেন। পরে সপ্তাহে দু'দিন ক'রে আমাকে তাঁর কাছে ডাকতে লাগলেন। শ্রীমার কাপড় কাচা, কাপড় ইস্ত্রি করা ও কাপড় রিপু করা ইত্যাদি করতে আরম্ভ করলাম। এইভাবে শ্রীমা'র ঘরে আমার কাজ বাড়তে লাগল এবং যখন যে-কোনো কাজই হোক আমিও কখনো 'না' করতাম না। যেমন কাজই হোক না কেন, তা করবার জন্য সর্বদাই নিজেকে প্রস্তুত করে রাখতাম। এইভাবে ক্রমশঃ শ্রীমা'র ইস্ত্রি করা কাপড় তাঁর ঘরে নিয়ে যেতে হত। সেই সময় থেকেই শ্রীমা আমাকে ফুল দিতে আরম্ভ করেন।

বাস্তবিকপক্ষে সেবার কাজ আরম্ভ হলো দত্তার দেহত্যাগের পরে এবং চিন্ময়ী কাজ করতে অস্বীকার করলে। শ্রীমা তখন তাঁর সকল কাজ আমাকে দিলেন। এইরূপে শ্রীমায়ের খুব নিকট সংস্পর্শে এসে পড়লাম ১৯৫৮ সালে ৯ই ডিসেম্বর যখন শ্রীমা অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

তোমরা স্মরণ করতে পার, এই সময় থেকেই শ্রীমা শুধু টেনিস খেলাই নয়, অন্যান্য কাজও ছেড়ে দিলেন। আমিও সেই সময় থেকে শ্রীমা'র কাছে কাছে রইলাম। তারপর আবার ৩রা এপ্রিল ১৯৬২ সালে রাত্রে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাকে ডেকে পাঠান হলো। সেই সময় থেকেই কয়েক বছরের জন্য আমার দিন-রাত শ্রীমা'র কাছে কাটতে লাগল। এরপর থেকে তিনি আর নীচে নামেননি।

প্রশ্ন—(একটি অল্প বয়স্ক ছাত্রের নিকট থেকে প্রশ্ন এলো :) ছোট শিশুরা কখন থেকে এখানে আসতে আরম্ভ করলো ?

বসুধা—১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। তোমরা যারা এখানে আছো অনেকেই তখন জন্মগ্রহণ করোনি...জাপান যখন হিটলারের পক্ষ অবলম্বন করলো, তখন শুধু কলকাতাই নয়, বাংলাদেশের আরও অনেক স্থানের লোকেরা জাপানীদের বোমা ফেলবার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। সে-সময় ওই সকল স্থানের ভক্তগণ আশ্রমকেই একমাত্র নিরাপদ স্থান ভেবে শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয় নেয়। শ্রীমা ওই সব পরিবারগুলিকে স্থান দেন, এবং এমনি করেই শিশুরা এখানে প্রথম এসে পড়লো। শিশুরা যখন আসতে সুরু করেছে তখন প্রয়োজন হলো পড়াশুনা, খেলাধূলা ও আরও নানা ধরনের কাজকর্ম যাতে তারা সারাক্ষণ তাতেই ব্যস্ত থাকতে পারে। এমনি করে বিদ্যালয় ও খেলার মাঠ তৈরী হলো। ক্রমশঃ শ্রীমাও পূর্বের থেকে কড়াকড়ি বেশ কিছুটা কমিয়ে দিলেন, পূর্বে নিষিদ্ধ ছিল এমন কিছু কাজেরও অনুমতি দিলেন।

প্রশ্ন—কড়াকড়ি কমালেন মানে ? কেন বলছেন শ্রীমা কড়াকড়ি কমালেন ?

বসুধা—তোমরা জান নিশ্চয়, শ্রীমা তাঁর মাথাটিকে ঢেকে রাখতেন। এমন কি, আমিও যখন মায়ের কাছে শাড়ী পরে গিয়েছি, তখন তিনি আমার মাথাটাও পুরো ঢেকে দিতেন। (হাস্য) মায়ের এই ধরনের ভাব দেকেলে গোঁড়া মহিলারা খুব পছন্দ করতেন। আসলে মায়ের তো নিজের কোনো পছন্দ-অপছন্দ ছিল না, অন্যরা পছন্দ করে ব'লেই তিনি ওইরূপ করতেন। ঠিক তেমনি ভাবে এক সময় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যে-সব ব্যবস্থা করেছিলেন, পরে পরিস্থিতির পরিবর্তনে তাঁকে অন্য রকম ব্যবস্থা করতে হলো। পূর্বে আশ্রমবাসীদের আচার-ব্যবহার ও খাদ্যের ব্যাপারে শ্রীমা যতখানি কড়াকড়ি করে ছিলেন, শিশুরা আসার পর তা অনেকখানি সহজ শিথিল হয়ে গেল। শিশুদের জন্যে আমিষ খাদ্যের প্রয়োজন হলো। আশ্রমে তখন মাছ, মাংস, ডিম, ধূম-পান ও পান-ভোজন নিষিদ্ধ ছিল। মাছ আসতো শুধু আশ্রমের বিড়ালের জন্য। এই ব্যবস্থাই এখনো চলে আসছে। তবে জানিনা ভবিষ্যতে কতদিন পর্যন্ত এরকম চলতে পারবে...

প্রশ্ন—আপনি কখনও শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা বলেছেন ?

বসুধা—দর্শনের সময় শ্রীঅরবিন্দের খুবই নিকটে গিয়েছি কিন্তু তখন তো কথা বলা চলতো না। সে-সময় বছরে তিনবার দর্শন হতো। ২১শে ফেব্রুয়ারী (শ্রীমা'র জন্মদিন), ১৫ই আগষ্ট (শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন), ২৪শে নভেম্বর (সিদ্ধি দিবস)। আমরা তখন শ্রীঅরবিন্দের পায়ে প্রণাম করতাম, তিনিও আমাদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতেন। এইরূপ ভাবে দর্শন ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত হলো। পরে শ্রীঅরবিন্দের হাঁটুতে চোট লাগার পর তিনি সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত শ্রীমা একাই দর্শন দিতেন। এরপর সাধকদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় শ্রীঅরবিন্দ বেশীক্ষণ বসতে পারতেন না ব'লে দর্শন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হলো। আমরা লাইন ক'রে শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন ক'রে চলে যেতাম। ২১শে ফেব্রুয়ারী ও ১৫ই আগষ্ট এই

দুটি দর্শন-দিনের মাঝখানে ব্যবধান খুব বেশী হওয়ায় ২৪শে এপ্রিল আর একটি দর্শন-দিনের ব্যবস্থা করা হলো। ১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল এই পুণ্য দিনেই শ্রীমা পণ্ডিচেরীর ভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন স্থায়ীভাবে।

প্রশ্ন—সে-সময় শ্রীমা জন্মদিনে 'কার্ড' দিতেন?

বসুধা—তখন 'কার্ড' দেবার ব্যবস্থা ছিল না। যাদের জন্মদিন থাকত তাদের শ্রীমা দর্শন দিতেন এবং তাঁর সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য তাদের ধ্যানের ব্যবস্থা থাকত। তারপর তিনি বেছে বেছে কয়েকটি ফুল দিতেন, প্রত্যেকটি ফুলের থাকত বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য যার সত্তার পক্ষে যেমনটি প্রয়োজন তাকে তা সেই রকম ফুলই দিতেন। ১৯৫৮ সালে কিছু দিনের জন্য শ্রীমা যখন দর্শন দেওয়া বন্ধ করে দিলেন, তখন থেকেই জন্মদিনের 'কার্ড' দেবার ব্যবস্থা সুরু হলো।

প্রশ্ন—শ্রীমা কি খেতেন?

বসুধা—শ্রমা'র খাদ্যের পরিমাণ খুবই অল্প ও সাধারণ ছিল—বেশীর ভাগ খাদ্য ছিল—ফল, শাক-সব্জি ও বাদাম। শেষের দিকে এইগুলো বেটে খানিকটা পাতলা করে দেওয়া হতো, কারণ এগুলো চিবোতে তাঁর অসুবিধা হতো...তিনি 'চিজ' খেতে খুবই পছন্দ করতেন।

প্রশ্ন—কে তাঁর খাদ্য তৈরী করতেন?

বসুধা—শ্রীমার নিজের রান্নাঘরে খাবার তৈরী হতো। অবশ্য আশ্রমের সাধকরাও নিজেদের বাড়ীতে খাবার তৈরী করে তাঁর নিকট পাঠাতেন; তিনি তা থেকে সামান্য কিছু খেয়ে বাকিটা প্রসাদ করে ফিরিয়ে দিতেন।

প্রশ্ন—শ্রীমা কি সর্বদাই শাড়ী পরতেন?

বসুধা—গোড়ার দিকে যখন তিনি ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন সর্বদাই শ্রীমাকে শাড়ী পরতে দেখেছি। তবে আমার মনে হয়, যখন বিশ্রামের জন্য নিজের ঘরে যেতেন তখন হয়তো 'গাউন' পরতেন। পরে যখন টেনিস খেলতে সুরু করেন তখন সালোয়ার-কামিজ পরতেন। শাড়ী খুবই কম পরতেন...'গাউন' ও 'কোট' ঘরে পরতেন আর বাইরে যাবার সময় পরতেন সালোয়ার-কামিজ।

প্রশ্ন—শ্রীমার কোনো পোষাক কি প্রিয় ছিল?

বসুধা—হ্যাঁ, একপ্রকার নিপুণ সূচী-শিল্প-করা শাড়ী ও 'গাউন' শ্রীমা খুবই ভাল-বাসতেন। সাধারণতঃ তিনি পছন্দ করতেন রঙিন আভা—ফিকে গোলাপী, ফিকে নীল, ফিকে ধূসর বর্ণ ইত্যাদি। তিনি তামাটে লাল রঙও পছন্দ করতেন, তবে গাঢ় লাল নয়। এই সব রঙ-ই তিনি প্রথম দিকে ব্যবহার করতেন। পরে ভক্তদের খুশী করবার জন্যে ভক্তরা যেমন রঙের পোষাক শ্রীমাকে নিবেদন করতো, তিনি সেই রকমই পরতেন।

প্রশ্ন—এখানে থাকাকালীন সময়টা আপনি কেমন উপভোগ করলেন?

বসুধা—উপভোগ? তাহলে আমি তোমাদেরই প্রশ্ন করি—'উপভোগ' বলতে তোমরা কি বোঝাতে চাইছো? এ-কি আইসক্রীম খাওয়ার মত ভাবো? (হাসা) কি যে উপভোগ করলাম তা আমি বলতে পারবো না; তবে বলতে পারি—যতখানি আমার সামর্থ্যে কুলিয়েছে, সেই অনুযায়ী সময়ের সদ্ব্যবহার করেছি, যে-সব অমূল্য সুযোগ এবং উপলব্ধি আমার জীবনে এসেছে তার যথাযোগ্য ব্যবহার করেছি। কিন্তু সে সব অনুভব প্রকাশ করার জন্য 'উপভোগ' কথাটি ব্যবহার করা চলে না...

প্রশ্ন—আপনি কি ফলশ্রুতি অর্জন করেছেন?

বসুধা—সে তো তোমরাই দেখবে—আমি কি বলবো? আমার মধ্যে যদি কোনো ভাল গুণ দেখে থাকো, এখানে থেকে তাই-ই হলো আমার ফললাভ। আর যদি অবাঞ্ছনীয় গুণ কিছু দেখে থাকো, তার অর্থ হলো এখনো অনেক কিছুই আমার মধ্যে সংশোধন করবার বাকী রয়েছে। অবশ্য একে আমি বিফলতা বলতে চাই না। কারণ, আমার সাধনা এখনো চলছে। আমি কখনো একথা ভাবি না যে, আমার সাতচল্লিশ বছরের সমর্পিত সেবা এবং সচেতন সাধনা বিফল হয়ে যেতে পারে—তবুও এ-সব আমার বলবার কথা নয়। যদি কিছু ফলশ্রুতি অর্জন করে থাকি সে শুধু অন্যরাই দেখতে পাবে।

প্রশ্ন—বেশীর ভাগ সময় শ্রীমা কখন অর্গান বাজাতেন?

বসুধা—আমার মনে হয় যখন তিনি প্রথম অর্গান পেলেন সেই সময় প্রায়ই বাজাতেন, কখনো কখনো ব্যক্তি বিশেষের সাক্ষাতের সময় বাজাতেন। আবার নতুন বছর সুরু হবার অব্যবহিত পূর্বে মধ্যরাত্রে তিনি অর্গান বাজিয়ে নতুন বছরকে অভ্যর্থনা জানাতেন। পরে এ সবই তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে মধ্যে মধ্যে কখনো বাজাতেন...

প্রশ্ন—আশ্রমে কখন 'চিঠি লেখা' সুরু হয়?

বসুধা—আমার যতদূর মনে হয়, ১৯৩০ সালে। শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ সাধকদের চিঠি লেখা সুরু করেন তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ও সাধন পথের নির্দেশ দেবার জন্য। কিন্তু মনে আছে, শ্রীমা আমাকে প্রতিদিন তাঁর কাছে চিঠি লিখতে বলেছিলেন দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত ঘটনা জানিয়ে—কোথায় যাই, কি করি, কাদের সঙ্গে চলাফেরা করি এবং কি করে সময় কাটাই। মনে হয় মা আমার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য এই কথা বলেছিলেন। তাছাড়া আমার অনেক বাধা-বিঘ্নও ছিল তার জন্যও হয়তো প্রতিদিন তাঁর কাছে চিঠি লিখে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় জানাতে বলেছিলেন। তোমরা অনেকেই হয়তো বুলেটিনে প্রকাশিত আমার সেই সব চিঠি পড়ে থাকবে। ওই ভাবেই আমার চিঠি লেখা সুরু হয়েছিল। কিন্তু এই চিঠি লেখা চলেছিল মাত্র কয়েক বছর—মনে হয় ১৯৩৮ সালে শ্রীঅরবিন্দের যখন হাঁটুতে আঘাত পান তখন থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। আমি অনেক আগেই চিঠি-পত্রের যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কারণ, তখন শ্রীমাকে প্রত্যহ দর্শন করতে যেতাম। কাজেই চিঠি লেখার আর প্রয়োজন হতো না।

প্রশ্ন—আপনি শ্রীঅরবিন্দকেও চিঠি লিখেছেন?

বসুধা—যদিও আশ্রমবাসীর সংখ্যা তখন বেশী ছিল না, তথাপি যাঁরা শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দকে নিয়মিতভাবে চিঠি দিতেন, তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ কমও বলা যায় না। যাঁরা চিঠি লিখতেন তাঁদিকে দুই দলে ভাগ করা হতো—কিছু সংখ্যকদের উত্তর দিতেন শ্রীঅরবিন্দ আর বাকীদের দিতেন শ্রীমা। আমার চিঠির উত্তর দিতেন শ্রীমা, তবে দুই তিনবার শ্রীঅরবিন্দও আমাকে চিঠি লিখেছেন।

প্রশ্ন—তাঁদের উত্তর দেওয়ার রীতির মধ্যে কি কোনো পার্থক্য ছিল?

বসুধা—হ্যাঁ, পার্থক্য ছিল বৈকি—বিস্তর পার্থক্য ছিল। শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের উভয়ের চিঠি-পত্র পড়লে তোমরা নিজেরাই সে-কথা বুঝতে পারবে। (হাস্য)

প্রশ্ন—আপনি কি করে ফরাসী ভাষা শিখলেন?

বসুধা—শ্রীমা আমাকে ফরাসী ভাষা শিখতে বললেন—আবার শুধু বললেনই নয়, নিজেই শেখাতে আরম্ভ করলেন। শিক্ষা দেওয়া হত ভারি সুন্দর পদ্ধতিতে। সপ্তাহে একবার আমি কাগজ পেন্সিল নিয়ে তাঁর কাছে যেতাম। তিনি আমাকে ফরাসীতে প্রশ্ন করতেন, এবং সেই প্রশ্নটাই আবার উত্তরসহ খাতায় লিখে দিতেন। তারপর আমি সেটাকে মুখস্ত করে নিতাম। এই ভাবে আমার ফরাসী ভাষা শেখা আরম্ভ হয়। একদিন তিনি সেই ফরাসী শেখার খাতাতেই আমার একটি স্কেচ্ আঁকলেন। আমার থুতনীটা শ্রীমার কোলের উপর রেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। শ্রীমা বললেন—একটুও নড়বে না যেন।

চুপচাপ সেইভাবে বসে রইলাম। ব্যাস্, দু'মিনিটের মধ্যেই ছোট্ট একটি স্কেচ্ তৈরী হয়ে গেল। স্কেচ্টির নীচে তিনি লিখে দিলেন: "এটি তোমার প্রকৃতি—মুখে হাসি, মাথা আমার কোলে।" (হাস্য)

তোমরা নিশ্চয় সুব্রতা অর্থাৎ Madame Gaebelé-এর নাম শুনেছ, পরে শ্রীমা তাঁকেই বললেন, কয়েকজন সাধককে ফরাসী ভাষা শেখাবার জন্যে একটি ফরাসী ক্লাস নিতে। আমিও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ দিলাম। তারপর যখন ফরাসী দেশ থেকে কখনো কেউ এসে ফরাসী ক্লাস নিতেন, আমি তাতে যোগ দিতাম। এই ভাবেই আমি ফরাসী ভাষা শিখলাম।

প্রশ্ন—তখন কি কোনো 'পিক্নিকের' ব্যবস্থা ছিল?

বসুধা—তখন কোনো 'পিকনিকের' ব্যবস্থাই ছিল না। কারণ, তখন ছোটরা কেউ-ই ছিল না। তবে শ্রীমা কখনও কখনও গাড়ীতে করে দূরে বেড়াতে যেতেন। সে-সময় আমাদেরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিতেন। আমরা যেতাম অন্য একটা গাড়ীতে। তারপর সেখানে গিয়ে পছন্দমত একটি জায়গা ঠিক করে কাপড় বিছিয়ে তার উপর আমরা সকলে বসতাম। মনে পড়ে, একবার আমরা পিক্নিকে গিয়ে অনেক তাল খেয়েছিলাম।

একজন স্থানীয় লোক তালগাছে উঠে তাল পেড়ে ছুরি দিয়ে ছাড়িয়ে দিলে। পরে পবিত্রদা তার থেকে কোয়া বার ক'রে আমাদের প্রত্যেককে খেতে দিলেন। একে যদি তোমরা 'পিক্‌নিক' বলো, তবে এই ছিল আমাদের 'পিক্‌নিক'।

প্রশ্ন—প্রথম যখন শ্রীমাকে দেখলেন, তখন তিনি দেখতে কেমন ছিলেন?

বসুধা—একথা বলা খুবই শক্ত। তবে আমার মনে হয় আমি তাঁকে একজন বিদেশী মহিলার মতই দেখেছিলাম। যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখন তাঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর কিন্তু তাঁকে দেখতে খুবই অল্প বয়স্কা লাগতো। শ্রীমা'র মুখশ্রী খুবই সুন্দর ছিল—বিশেষ করে তাঁর নাকটি ছিল অতীব সুন্দর। আমি তাঁর চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। শ্রীমা ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী এবং শীর্ণকায়া। তাঁর শরীরের গঠনভঙ্গীও ছিল চমৎকার—তাঁকে দেখতে ছিল অপূর্ব সুন্দরী।

প্রশ্ন—যখন আপনি প্রথম শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছিলেন তখন তাঁর গায়ের রঙ কি খুব কালো ছিলো?

বসুধা—আমি তাঁকে খুব কালো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সবাই বলে বটে যে, তাঁর গায়ের রঙ কালো ছিল। কিন্তু আমি দেখিনি।

১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে শেষবারের মত আমি দর্শন করলাম। তখন তাঁকে দেখেছিলাম উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ—এমন রূপ পূর্বে কখনো দেখিনি—মনে হলো তাঁর দেহ যেন জ্যোতির্ময়!

প্রশ্ন—তখন কি কোনো ফিল্ম দেখান হতো?

বসুধা—না, সে-সময় ফিল্ম দেখার ব্যবস্থা ছিল না। তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ফ্রেঞ্চ-ফিল্ম দেখতে যেতো Salle Jeanne d'Arc-এ। আমার মনে আছে, সুব্রতা তাঁর ফ্রেঞ্চ-ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে সেখানে যেতেন।

অবশ্য এবার তোমরা যদি জিজ্ঞেস করো—প্লে-গ্রাউণ্ডে কখন্ 'ফিল্ম শো' দেখানো আরম্ভ হলো, সে-কথা আমি বলতে পারবো না। সে-কথা বলতে পারেন 'দাদা'। কারণ ওটা তাঁরই এলাকা। (হাস্য)

প্রশ্ন—শ্রীঅরবিন্দ কখনো ফিল্ম দেখতেন?

বসুধা—না। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে এসে কখনো ফিল্ম দেখেন নি, তোমরা নিশ্চয় স্মরণ করতে পারো, যে-সময় আমি এখানে আসি তখন স-বাক্ চলচ্চিত্রই ছিল না—ছিল শুধু মূক চিত্র। যখন ১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী এলেন, তখন কোনোরকম ফিল্মই ছিল না।

প্রশ্ন—শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ঘরেও কি কখনো 'মুভাইড্ শো' দেখেননি?

বসুধা—না, কখনোই না।

প্রশ্ন—মায়ের কাছে থেকে আপনার সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা কি ?

বসুধা—সবচেয়ে স্মরণীয় ? কী সবচেয়ে বেশী স্মরণীয় ? সেই বলো জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় জিনিষ যা মানুষ কখনো ভুলতে পারে না, নয় কি ? তা যদি হয়, তবে এ বিষয়টি নিয়ে আমাকে একটু ভাবতে হবে !

এখন আমাদের উঠবার সময় হয়ে এলো। আমি না উঠলে তোমরাও দেখছি কেউ উঠতে পারবে না।

আশা করি, এই সব আলোচনায় তোমরা ক্লান্তি বোধ করোনি।

(ক্রমশঃ)

বেদের কাব্যভাবনা

রণজিৎ সরকার

আমরা বাল্মীকিকে বলি আদিকবি। তেমনি ইউরোপে হোমার হলেন আদি-কবি। বাল্মীকি বা হোমারের আগে কি তাহলে কবি ছিল না ভারতবর্ষে বা গ্রীসে? আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। বিরাট বৈদিক কাব্যসংহিতার কথা কি আমরা ভুলে যাব? বাল্মীকিকে বা হোমারকে আদিকবি বলার একটা বিশেষ অর্থ আছে। এখানে কথা ওঠে কাব্যের সংজ্ঞা নিয়ে। বাল্মীকি আর হোমারের সময় থেকে কাব্য পেল এমন একটি অর্থ, এমন একটি বিশেষ রূপ যা আগের যুগের কাব্যের মুখ্য অর্থ বা রূপ ছিল না। যা আগের যুগে গৌণ ছিল তাকে করা হল মুখ্য, যা ছিল মুখ্য তা হয়ে গেল গৌণ, এমন কি কখনো কখনো তা একেবারে উহ্য রয়ে গেল। তবে সেই প্রথম উষার কাব্যচেতনার রেশ যে মানুষের মন থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন আমরা পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যের পর্যালোচনা করি। তখন দেখতে পাই কবিরা কেউ কেউ সচেতন ভাবে ফিরে পেতে চেয়েছেন 'আদিকাব্যের' আগের কবিতা। সেই কথাই ফরাসী কবি স্তেফান মালার্মে বলেছেন সূত্রাকারে Avant Homère, quoi ?—Orphée. জানতে চাও হোমারের আগে কি আছে? আছে অর্ফিয়ুস্। মালার্মে চেয়েছিলেন সেই অর্ফিক কাব্যকে ফিরিয়ে আনতে, যে-কাব্যের জগতে মানুষের সঙ্গে দেবতার সংযোগ ছিল একান্ত নিবিড়, একান্ত গভীর।

শ্রীঅরবিন্দও সেই কথাই বলেছেন; তিনি বলেছেন যে কাব্যকে হতে হবে মন্ত্র। এবং যেই আমরা বলি 'মন্ত্র' অমনি আমাদের মন চলে যায় আদিকবি বাল্মীকির অনেক অনেক যুগ আগে। সেখানে পাই এক বিরাট কাব্যের নিদর্শন। বাল্মীকির আগে কবি কে? আমরা বলব, একজন নন, অসংখ্য। আমরা সাক্ষাৎ পাই কয়েক যুগব্যাপী এক শক্তিমান কবিমণ্ডলীর। এখানে কয়েকজনের নাম করাই যথেষ্ট উশনা অঙ্গিরা বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র দীর্ঘতমা বামদেব মধুচ্ছন্দা ঘোষা! গ্রীসের অর্ফিক বা এলুসিনীয় গুহ্যতত্ত্বের (Orphic and Eleusinian Mysteries) খুব কম নিদর্শনই পরবর্তী যুগে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য ভারতের প্রাচীন কাব্য ঐশ্বর্যের এক বিপুল অংশ নানা ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। বৈদিক সাহিত্যের এক বিরাট এবং প্রধান অংশ আমরা পেয়েছি প্রায় নিখুঁত অবস্থাতেই।

বৈদিক কাব্য এবং পরের যুগের কাব্যের তুলনা করলে আমরা বুঝতে পারি কেন বাল্মীকিকে বলা হয়েছে আদিকবি। যদিও বাল্মীকির কাব্যে ঋষিদৃষ্টির—ঋষিদৃষ্টিই হল হল বৈদিক কাব্যের প্রধান কথা—প্রকাশ আছে নানা জায়গায়, তবু দেখা যায় ক্রমে তার স্থান অধিকার করছে প্রাকৃত মনের কল্পনা। সে-কল্পনা মিথ্যা নয় কিন্তু তাতে নেই ঊর্ধ্বতম সত্যের প্রোজ্জ্বল প্রকাশ। বাল্মীকির কাব্যে বা কালিদাসের কাব্যে মন্ত্র

নেই বললে ভুল বলা হবে কিন্তু তা সমস্ত কাব্যকে পরিব্যাপ্ত করে নেই, তার প্রকাশ ঘটে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎঝলকের মতো। শ্রীঅরবিন্দ বেদ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে মন্ত্রকাব্য আর প্রাকৃত কাব্যের মধ্যে কি তফাৎ। "সেই আদিযুগের ঋষিদের মতে বেদ হচ্ছে সেই বাক্ বা সত্যের আবিকর্ত্রী, যা জীবনের গুহ্য অর্থকে রূপ দেয় চিত্রকল্প আর প্রতীকের সহায়ে। দিব্য সেই আবিষ্কার, তার দ্বারা প্রনুর্ত হয় শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তি, শব্দের প্রকাশক্ষম ও সৃজনক্ষম সামর্থ্য—সে-শব্দ দার্শনিক যুক্তিবাদী বা রূপতাত্ত্বিক বুদ্ধির জগতের শব্দ নয়, সে-শব্দ হল প্রজ্ঞাঘন প্রেরণাময় ছান্দিক অভিব্যক্তি: অর্থাৎ মন্ত্র।"(১)

কিন্তু পরের যুগে আমরা শব্দকে করে তুলেছি আমাদের প্রাকৃত মনের দাস। কবিরা বুনেছেন সত্যের পরিবর্তে স্বপ্নজাল। কাব্য যেখানে মন্ত্র সেখানে বাগ্দেবী স্বয়ং প্রকট করেন নিজের গুহ্যতম রূপ। সেখানে কবিকে সেবকের মতো শ্রদ্ধাবানের মতো সরে দাঁড়াতে হয়। তাই শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত বলেছেন, "সকল মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল এই অপৌরুষেয়তা, এই নৈর্ব্যক্তিকতা। সৃষ্টির মধ্যে যতক্ষণ রয়েছে ব্যক্তিগত অস্মিতার ছাপ ততক্ষণ স্রষ্টা মন্ত্রকৃৎ ঋষি হয়ে উঠতে পারেন নাই—তিনি কবি হয়েই রয়েছেন।" (২)

এখানে দেখতে পাচ্ছি ঋষির আর কবির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। বৈদিক যুগে সেই পার্থক্য ছিল না। বলতে পারি আদিকবির যুগ থেকে এই পার্থক্যের সূত্রপাত। আগের যুগের মন্ত্রকাব্য বা আর্ষ কাব্য ছিল ব্রহ্মের স্ফুট রূপ। ব্রহ্মের আদি অর্থ শব্দব্রহ্ম —আর মন্ত্রকাব্যের মাধ্যমে মানুষ পেতে পারে ব্রহ্মের উপলব্ধি। কিন্তু পরের যুগে কাব্যের উপলব্ধি হল ব্রহ্মাস্বাদন সহোদর। পার্থক্যটা লক্ষণীয়। তবুও ঋষি আর কবিকে দুই বিভিন্ন জগতে নির্বাসিত করা হল না। দশম শতকের কাশ্মীরী রূপতাত্ত্বিক ভট্ট তৌত বলছেন যে কবি আর ঋষি একই সত্তার দুই দিক—ঋষিদৃষ্টি ছাড়া কাব্য অসম্ভব।

নানৃষি: কবিরিত্যুক্ত: ঋষিশ্চ কিল দর্শনাৎ।

দর্শন আর বর্ণন কাব্যের এই দুটি অঙ্গ। ঋষির কাজ হচ্ছে দেখা, কবির কাজ হচ্ছে বর্ণনা করা। কবিসত্তা ছাড়া ঋষি থেকে যান নীরব কবি আর ঋষিসত্তাছাড়া কবির কাব্য-সত্যের লাঘব হয়।

তাহলে কাব্য হল ঋষিদৃষ্টি আর কবিকৃতির সুষ্ঠু সমন্বয়। এই সমন্বয়ের স্বরূপ নির্ণয় করা এখানে সম্ভব নয়, কারণ তার প্রকাশ হয়েছে নানা ভাবে নানা রূপে। কিন্তু আমরা যদি বৈদিক কবিদের কাব্যাদর্শের কিছুটা আলোচনা করি তবে এই সমন্বয়ের আদর্শ আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

বেদের ঋষিকবিরা পৃথক করে অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা করেননি। কিন্তু তাঁদের রচনার নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে এমন সব কথা, এমন সব ইঙ্গিত ও চিত্রকল্প যা থেকে আমরা তাঁদের কবিকৃতির পরিচয় পেতে পারি। আমরা আগে বলেছি মন্ত্রকাব্যের বৈশিষ্ট্য হল অপৌরুষেয়তা ; তার অর্থ নয় যে কবি তাঁর কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ছিলেন। বৈদিক কবিরা জানতেন তাঁদের মুখ দিয়ে যে বাণী মূর্ত হচ্ছে তাতে আছে ঐশী শক্তির প্রকাশ। আরো জানতেন যে সেই বাণী তাঁদের নিজেদের মনগড়া কথা নয়, সাময়িক মতবাদের প্রকাশ নয়। জানতেন সে বাণী চিরন্তন, যুগ যুগ তা বেঁচে থাকবে। নদীরা সেই কথাই

বলছে ঋষি বিশ্বামিত্রকে। বৃত্রকে ধ্বংস করে দেবরাজ ইন্দ্র মুক্ত করেছেন জলধারা। কবি বলতে চাইছেন সেই নদীদের জন্মকথা। কবির মনশ্চক্ষে প্রতিভাত অপূর্ব রহস্য। তখন নদীরা বলছে, ভুলো না, হে গায়ক, উত্তর যুগ সব তোমার এই কথা উদ্‌ঘোষিত করবে। (৩)

এতদ্বচো অভিহর্যামি তুষ্টো বা যত্তে সুতাসুতৃপা যুগানি। (৩, ৩৩, ৮)

অন্য জায়গায় দেখেছি বরুণ কবির কাছে গুপ্ত রহস্য খুলে দিয়েছেন এবং বলছেন সত্যের যে স্থিতি, যে পদ তার গুহা রহস্য জেনে বিপ্র তা বলুন না উত্তর যুগকে শিক্ষা দিতে

বিদ্বান্ পদস্য গুহ্যা ন বোচদ্যুগায় বিপ্র উপরায় শিক্ষন্। (৩, ৮৭, ৪)

এখানে দেখতে পাচ্ছি কবি জানেন যে কাব্য ক্ষণস্থায়ী আনন্দের খোরাক নয়। কবির কথা থাকবে চিরন্তন হয়ে। কিন্তু এ-ও জানেন যে কেবল নিজের শক্তিতে কাব্যসত্যকে জানা যায় না। সত্যকে লাভ করার কথাই ঋষি বিশ্বামিত্র নদীর রূপকের ভিতর দিয়ে বলছেন। সত্যের জলধারা কবির পার হতে হবে। নদী কি? নদীরা হচ্ছে ঋতাবরী— ঋতকে বহন করে নিয়ে যায়। ঋতের আর সত্যের বাহিকা নদীরা যদি কৃপা করে তবেই কবি নদী পার হতে পারবেন এবং পার হতে পারবে অন্যরাও। পার হবার অর্থ জয় করা অধিকার করা, জানা। বহুদূর থেকে কবি এসেছেন, দূরাৎ, তোমরা নত হও, সুনম হও, ভবতা সুপারা (৩, ৩৩, ৯)। কবি জোর করে পার হবার চেষ্টা করছেন না; তিনি প্রার্থনা করছেন, আর সেই প্রার্থনা শুনেই নদীরা কবির সামনে উন্মুক্ত করে ধরছে তাদের রহস্য, তাদের ঋতের প্রসার। তাই নদী বলছে তুমি দূর থেকে এসেছ, তোমার প্রার্থনা আমরা শুনব; নারী যেমন শিশুকে দুধ খাওয়াবার সময়, কন্যা যেমন প্রিয়জনকে আলিঙ্গন করবার সময় নত হয়, আমি তেমনি নত হব তোমার জন্য।

নি তে নংসৈ পীপ্যানেব যোষা মর্যায়েব কন্যা শশ্বচৈ তে। (৩, ৩৩, ১০)

এখানে একটা জিনিস লক্ষনীয়: নদী অর্থাৎ ঋতের স্রোত, সত্যের ধারা, নেমে আসছে আপন করুণায় মাতার মতো, প্রিয়ার মতো, এখানে নেই কবির অহঙ্কার। ভবভূতির স্পর্ধা, আর বৈদিক ঋষির প্রেমের ও প্রার্থনার বিনয়—দু-এর পার্থক্য স্পষ্ট। ভবভূতি বলছেন:

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কো ঽপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।

হয়তো আবার সমানধর্মা কেউ আছে, নয়তো জন্ম নেবে একদিন, কারণ কাল নিরবধি আর বিপুল এ পৃথিবী। (৪)

এখানে একটা কথা কাব্যজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হল 'সমান-ধর্মা'। কবি কাব্য রচনা করেন কিন্তু সে-কাব্যের রস গ্রহণ করবার অধিকারী রসিক কেবল তিনিই যিনি কবির আত্মিক সখা। ভবভূতি খুঁজছেন তাঁর সমানধর্মাকে কিন্তু তেমন সখা দুর্লভ। বৈদিক কবি বলছেন অন্যকথা। কবির কথা যদি শ্রোতা বুঝতে না পারে তা হলে দোষটা অনেকাংশে কবিরই, কারণ কবি কথায় ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি সেই শক্তি যা সব বাধা ধ্বংস করে অন্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে। অর্থাৎ কবি পারেননি সত্য বাক্য সৃষ্টি করতে।

সকৃন্নিব তিতিউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখায়: সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি। (১০, ৭, ১২)

ছাতু যেমন করে চালুনি দিয়ে পরিষ্কার করা হয় তেমনি ধীমান্ কবিরা যখন মন দিয়ে কথা পরিষ্কার করেন তখন সখাগণ জানেন সখ্য ; তখন সেই কথায় পড়ে এক কল্যাণকর ছাপ।

সখায়ঃ সখ্যানি জানতে—সখা কে? সখা হচ্ছেন একমনা, সমধর্মা, সহৃদয়। সখ্য হচ্ছে একমনত্ব, সমধর্মত্ব সহৃদয়ত্ব। আমাদের প্রাত্যহিক অসংস্কৃত বাক্‌কে যখন কবি —তাঁর মনের—প্রজ্ঞানময় কবিমনের দ্বারা বিশোধন করে নেন তখন আর আন্তর যোগাযোগের সমস্যা থাকে না। তখন বাক্ হয় কল্যাণময়ী। যতক্ষণ থাকে স্পর্ধা, অস্মিতা, ততক্ষণ বাক্ অপরিশুদ্ধ। শুদ্ধা বাকে নেই কোন ব্যক্তিমানসের ছাপ ; যে ছাপ তাতে পড়ে তা হল 'ভদ্রা লক্ষ্মীঃ' কল্যাণকর ছাপ . তাই সে-শব্দ অপৌরুষেয়। তাই তা সবার। সেই জন্যই বৈদিক কবির প্রার্থনা শুনি :

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।

সমানং মন্ত্রং অভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥ (১০, ১৯১, ৩)

এক হোক তোমাদের মন্ত্র, এক হোক তোমাদের সম্মেলন, এক হোক তোমাদের মন, এক হয়ে যাক তোমাদের চেতনা। তোমাদের সঙ্গে এক মন্ত্র আমি পাঠ করি, এক আহুতি অর্পণ করি। (৫)

একদিকে কবি হতে চাইছেন সমানমর্মা, অন্যদিকে তিনি দীর্ঘশ্রুৎ (৭, ৬১, ২) তাঁর বাণী অনুরণিত হয় বিপুলা পৃথিবীর দিকে দিকে। কবি নতুন শ্রুক্ রচনা করে বলছেন :

আদিত্যা রুদ্রা বসবো জুষন্তেদং ব্রহ্ম ক্রিয়মাণং নবীয়ঃ।

শৃণ্বন্তু নো দিব্যাঃ পার্থিবাসো গোজাতা উত যে যজ্ঞিয়াস॥ (৭, ৩৫, ১৪)

হে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, আমরা নবতর স্তোত্র রচনা করছি, গ্রহণ করো তা। স্বর্গের অন্তরিক্ষের আর পৃথিবীর দেবতারা, আর যারা যজ্ঞার্হ সবাই শুনুক আমাদের স্তোত্র।

কবি রচনা করছেন স্তোত্র ; ছড়িয়ে দিচ্ছেন তা মহাবিশ্বে, অনাগত কালের বুকে। তিনি এক বিরাট ঐশী শক্তির যন্ত্র। তাঁর মুখে ঋতের সত্যের আর বৃহতের প্রকাশ। অন্য-ভাবে বলতে পারি, আসল কবি হচ্ছেন তাঁরাই যাঁরা ঋতের সত্যের বৃহতের ধাতা, অর্থাৎ দেবতারা। সত্যই, বেদে আমরা দেখতে পাই দেবতাদেরই বারবার সম্বোধন করা হচ্ছে কবি বলে। দেবতারাই হচ্ছেন প্রথম কবি। আর পার্থিব জগতে প্রথম কবি হলেন সেই ঋষিরা যাঁরা সর্বপ্রথম দৈব প্রসাদে বাক্যের বাধ্যমে, ছন্দের বাধ্যমে ধরতে পেরেছেন শব্দব্রহ্মকে।

তাই পূর্ব পূর্ব ঋষিদের বলা হয়েছে দেবপুত্র, দেবসখা। দেবপ্রসাদে তাঁরা হয়েছেন ঋষি। বসিষ্ঠ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে বরুণ তাঁকে ঋষি করেছেন, ঋষিং চকার (৭, ৮৮, ৪)। ঋগ্বেদেরই অর্বাচীন ঋষিরা বলছেন যে আগের যুগের ঋষিদের সঙ্গে দেবতাদের যোগাযোগ ছিল সহজতর কিন্তু অর্বাচীন ঋষিরাও সেই ঋষিদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হননি। তাই একজন কবি বলছেন, আমাদের মধ্যে, এই অর্বাচীন যুগে, যে দেখেছে, যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে (১০ ৭২, ১), সে বলুক দেবতাদের জন্মকথা।

প্রথম কবি হলেন দেবতারা। আর পার্থিব কবিরা যাঁরা মহান ঋষি—তাঁরা দেবজাত, দেবশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত ; বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে—মহী ঋষির্দেবজা দেবজূতঃ (৩, ৫৩, ৯)। তাই আমরা যদি জানতে চাই কে কবি, তবে আমাদের জানতে হবে

দেবতাদের। সব দেবতাকেই কখনো না কখনো কবি বিপ্র ধীর বিপশ্চিৎ আখ্যা দেওয়া হয়েছে কিন্তু মনে হয় অগ্নিকেই যেন কবিশ্রেষ্ঠের সম্মান দিয়েছেন ঋষিরা। তাই আমরা প্রথমে দেখব অগ্নির সঙ্গে কবির কি সম্বন্ধ!

অগ্নিকে বলা হয়েছে কবি, প্রচেতা। কবিরগ্নিঃ (১, ১২, ৭). ত্বং দূতঃ কবি-রসি প্রচেতা (১০, ১১০, ১)। তুমি দূত, কবি তুমি, প্রচেতা তুমি। আরো বলা হয়েছে যে অগ্নি ধারণ করে আছে ঋত সত্য, অগ্নি জাতবেদা, অগ্নি বিশ্বদ্রষ্টা বিশ্ববিদ্। একজন ঋষি ঘোষণা করছেন—

ঋতাবান্ মহিষং বিশ্বদর্শতমগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনাঃ। (১০, ১৪০, ৬) মানুষ সুখের জন্য সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করেছে মহান্ ঋতবান্ বিশ্বদ্রষ্টা অগ্নিকে।

অগ্নিকে কবিরা যে সব বিশেষণে বিভূষিত করেছেন সেগুলোর অনেকেই একদিকে পরাজ্ঞান বিশ্বজ্ঞান ও দিব্যচেতনার ইঙ্গিত বহন করে আর অন্যদিকে দেখায় কি করে তা মন্ত্রে ও কর্মে প্রমূর্ত হয়। এই দুই ধারাকে এক কথায় ব্যক্ত করা হয়েছে 'কবিক্রতু' শব্দের সহায়ে। কবি হচ্ছেন ক্রান্তদর্শী, সত্যদ্রষ্টা ; আর 'ক্রতু'র অর্থ হল ইচ্ছাশক্তি যা দ্বারা জ্ঞান চেতনার ঊর্দ্ধ জগৎ থেকে নেমে এসে মূর্তি ধরে পার্থিব মানবিক চেতনায়। চেতনার এই যে দুটি ধারা—একটি 'জানা' অন্যটি 'করা'—অর্থাৎ চিৎ আর শক্তি, এক কথায় চিৎ-শক্তি, তার কথা কখনো ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই ভারতবর্ষে যোগ ছাড়া দর্শনের মূল্য নেই। অগ্নি তাই একাধারে কবি ও সুক্রতু। পরবর্তী ভারতীয় দর্শনের সম্বন্ধেও তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "ভারতে দর্শনশাস্ত্রের জন্ম হয়েছে নিষ্টিকদের (বৈদিক ঋষিদের) জিজ্ঞাসা থেকে ; সেই শাস্ত্রে তাঁদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সম্প্রসারিতও করা হয়েছে, আর পরবর্তী ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনায় ও যোগে ঋষিদের পন্থাও কিছু কিছু ধরে রাখা হয়েছে।" (৬)

কবির সঙ্গে অগ্নির সংযোগ খুবই নিবিড়। অগ্নি জানেন জ্ঞানের, জ্যোতির সব পন্থা—

জুষাণো অগ্নে প্রতি হর্য মে বচো বিশ্বানি বিদ্বান্ বয়ুনানি সুক্রতো। (১০, ১১২, ২) হে অগ্নি, প্রীত হয়ে তুমি গ্রহণ করো আমার কথা, কারণ হে সুক্রতু, তুমি জানো জ্ঞানের সকল পন্থা।

এখানে 'বিশ্বানি বিদ্বান্ বয়ুনানি' পদাংশটি অনুধাবনযোগ্য। বয়ুন কথার অর্থ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। সায়ন নানা অর্থ দিয়েছেন, কোথাও প্রজ্ঞা, কোথাও প্রকৃষ্ট কান্তি, কোথাও মার্গ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও নানাবিধ ব্যাখ্যা দিয়েছেন ; কেউ বলেছেন বয়ুনের অর্থ 'কাল', কেউ বলেছেন 'বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন', ম্যাকডনেল বয়ুনাবৎ-এর অর্থ করেছেন, 'making the way clear.' শ্রীঅরবিন্দ বয়ুনের অর্থ দিয়েছেন 'discovery of truth,' সত্যের আবিষ্কার। (৭) এই অর্থটিই সর্বীচীন মনে হয়, কারণ আমরা যদি আরো কয়েকটি জায়গায় শব্দটির প্রয়োগ দেখি তবে তাতে প্রজ্ঞান বা জ্যোতি, আর পন্থা—এই দুটি ভাবই ফুটে ওঠে। উষাস্তোত্রে ঋষিকবি বলছেন—

অতারিষ্ম তমসস্পারমস্যোষা উচ্ছন্তী বয়ুনা কৃণোতি। (১, ৯২, ৬)) আমরা পৌঁছেছি এই তমসার অন্যপারে ; উষা উদ্ভাসিত হয়ে সৃষ্টি করে জ্যোতির মার্গ।

অগ্নি জানেন জ্ঞানের, জ্যোতির সব পথ। কবির লক্ষ্য হচ্ছে সেই পথ আবিষ্কার করে উত্তীর্ণ হওয়া তমসার পরপারে। অগ্নি তাই কবির আরাধ্য। অগ্নিকেই কবি অর্পণ করছেন তাঁর বাক্য, অগ্নে প্রতি হর্য যে বচো। অথবা বলছেন—

এতা বিশ্বা বিদুষে তুভ্যং বেধো নীথান্যগ্নে নিণ্যা বচাংসি।
নিবচনা কবয়ে কাব্যান্যশংসিষং মতিভির্বিপ্র উক্থৈঃ॥ (৪, ৩, ১৬)

হে অগ্নি, হে বিধাতা, কবি তুমি, জানো তুমি তাই তোমাকে বলেছি, আমার মতি দিয়ে, কথা দিয়ে সেই গুহ্য বাক্য যা পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, বলেছি গূঢ়ার্থময় কাব্য।

অগ্নি থেকে জন্ম হয়েছে ঋষি অঙ্গিরার এবং তাঁর বংশের অন্যান্য ঋষিদের। অঙ্গিরসঃ সূনবস্তে অগ্নেঃ পরিজজ্ঞিরে (১০, ৬২, ৫)। আবার আদিঋষি অঙ্গিরার সঙ্গে কখনো কখনো অগ্নিকে একীভূত করা হয়েছে—ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষিঃ (১, ৩১, ১) তুমি, হে অগ্নি, প্রথম ঋষি অঙ্গিরা। (৮) আর অগ্নি হলেন ঋতের সত্যের প্রথম প্রকাশ, প্রথমজা ঋতস্য (১০, ৫, ৭)। এবং অগ্নি জানেন পদং গোরপগূল্হং। (৯) বেদে 'গো' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে প্রায়ই রূপক হিসেবে। (১০) 'গো'-শব্দের জ্যোতি অর্থে, অদিতি অর্থে এবং বাক্ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। ঋষি বামদেব বলছেন—

পদং ন গোরপগূল্হং বিবিদ্বানগ্নির্বহ্যং প্রেদু বোচন্মনীষাম্। (৪, ৫, ৩)

গাভীর গোপন পদের মতো গূঢ় বাক্‌কে জেনে অগ্নি আমার কাছে ব্যক্ত করুন মনীষা। (১১)

অগ্নি কবির কাছে নিয়ে আসেন সত্যের আর ঋতের শক্তি। বৈদিক ঋষিদের কাব্য-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে বামদেবের এই উপরের সূক্তটি আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান তথ্য তুলে ধরে। কবি প্রকাশ করেন সত্যকে। সত্যের নানা রূপ—কিন্তু তার দুটি রূপের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। একটি হচ্ছে, সত্যের স্থিতিশীল রূপ, অন্যটি সত্যের সক্রিয় রূপ। দ্বিতীয়টিই ঋত বা ধর্ম। (১২) সব দেবতারাই সত্যের ধারক কিন্তু বৈদিক দেবতাদের কোন দুজনকে এদুটি তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা রূপে গ্রহণ করতে হলে মিত্র আর বরুণের নাম করতে হয়। ঋত আর সত্য (১৩) যেমন একসঙ্গে জড়িত তেমনি মিত্রবরুণও বহু সূক্তে একত্রে গ্রথিত, একত্রে বন্দিত। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে বরুণ সত্যের আর মিত্র ঋতের দেবতা। (১৪) কিন্তু প্রায়ই তাঁরা এই বাঁধাছাঁচা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকেন না।

কবি চান মিত্র আর বরুণের প্রকাশ। অগ্নির বরে সে-প্রকাশ সম্ভব। কিন্তু প্রকাশের বাধা আসতে পারে। তাই কবি অগ্নির কাছে প্রার্থনা করছেন, হে অগ্নি, তোমার তীব্রতম জ্বালা দিয়ে—তপিষ্ঠৈন শোচিষা—তাদের গ্রাস করো যারা জেনে-শুনে নষ্ট করে বরুণের আর মিত্রের প্রিয় ধ্রুব ধামসকল।

প্র যে মিনন্তি বরুণস্য ধাম প্রিয়া মিত্রস্য চেততো ধ্রুবাণি। (৪, ৫, ৪)

এখানে কবি আর অকবির প্রশ্ন উঠছে। বরুণের আর মিত্রের ধাম কি? তা হচ্ছে ঋতের আর সত্যের প্রতিষ্ঠান। যারা সেই ধামের স্থিতি এবং নিয়ম জানে না, যারা নয় সত্যদ্রষ্টা, যারা শুধু কথা গেঁথে মিথ্যা রচনা করে, কবি বলছেন, তারা যেন ধ্বংস হয়। যদিও তারা সেই গভীর গহন পদ সৃষ্টি করে (১৫)—ইদং পদমজনতা গভীরম্—কিন্তু সেই সৃষ্টিতে কোন সত্যের প্রকাশ নেই কারণ সেই স্রষ্টারা পাপী ঋতহীন সত্যহীন—পাপাসঃ অনৃতাঃ

অসত্যাঃ। তাদের রচনা যে ভুয়ো, তাতে যে সত্য নেই, স্থিতি নেই, ধর্ম নেই, সেই কথা বামদেব সুন্দর করে বলেছেন : ভ্রাতৃহীন নারীর মতো তারা, পতিঘাতিনী স্ত্রীর মতো দুরাচারিণী তারা, অজ্ঞাতরো ন যোষণঃ পতিরিপো ন জনয়ো দুরেবাঃ।

যাঁরা সত্যদ্রষ্টা ঋতবান্ তাঁদেরও কবিকৃতি সহজ নয়। কারণ এই মন্ত্র, এই মনীষা, এই প্রজ্ঞান গুরুভার, গুরুং ভারং ন মন্ম। তাকে ধারণ করা মানুষী শক্তি দ্বারা সম্ভব নয়। মন্ত্রের জগতে, সত্যের জগতে প্রবেশ করতে হলে কবিকে হতে হবে শুদ্ধ, অগ্নিই পাবকরূপে তাঁকে পবিত্র করে ঋত ও সত্যকে প্রকট করে ধরেন কাব্যে মন্ত্রে ছন্দে। আর কেবল তখনই মন্ত্র হয় সুষ্টু—তেজগর্ভ। মানুষের মন পবিত্র হলে, পুনতী ধীতিঃ, তা হয় অগ্নির সমান এবং তাই তখন জানতে পারে অগ্নির সত্য। কবির মনশ্চক্ষে মূর্ত হয় গুহাহিত বাক্। আরো একটা প্রশ্ন তবু থেকে যায়। মানুষ পেয়েছেন সত্যের দর্শন; তিনি এখন ঋষি। কিন্তু তাঁকে এখনও হতে হবে কবি। কিন্তু জগৎ কি প্রস্তুত সেই গহন রহস্যময়—নিণিক—বাক্‌কে গ্রহণ করবার জন্য? ঋষি পেয়েছেন বাক্-এর বর। তিনি শুনেছেন বাণী, কিন্তু তবু তাঁর মনে প্রশ্ন জাগছে—

প্রবাচ্যং বচসঃ কিং মে অস্য গুহা হিতমুপ নিনিগ্ বদন্তি।

যা ছিল রহস্যময়, গুহায় নিহিত, তা আমার কাছে ব্যক্ত করা হয়েছে। সে-কথার কতটুকু বলা যেতে পারে?

কিন্তু ক্রমে ঋষির সমস্ত দ্বিধা কেটে যায়। তিনি প্রকাশ করেন জ্ঞান। তবে সে জ্ঞান সবার জন্য নয়। কেবল যারা সমচিত্ত, যারা নতিবান্ শ্রদ্ধাবান্, যারা বিনতভাবে জিজ্ঞাসা করে, তাদের কাছে অগ্নিদেবের আদেশে কবি সত্যকে উন্মোচিত করেন—

ঋতং বোচে নমসা পৃচ্ছ্যমানস্তবাশসা জাতবেদা যদীদন্।

হে জাতবেদ, এই যে সত্য তা তোমার আদেশে তার কাছে বলি যে বিনত হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

বামদেবের এই মন্ত্রটিতে (৪, ৫) আছে এমন অনেক কূট কথা যা সহজবোধ্য নয়। কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট—বামদেব বারবার বলছেন তিনি এমন বাক্য চান না যাতে নেই সত্যের পূর্ণতম প্রকাশ, যা নয় ঋতগর্ভ, যা প্রকট করে না জ্যোতির পদ।

আমরা এখানে অগ্নির সঙ্গে কবির সম্বন্ধ পর্যালোচনা করে কবির আস্পৃহা দৃষ্টি আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয়ে কিছু তথ্য পেলাম। কবিকর্মের অন্য একটি দিক এখনও আমাদের দেখতে হবে—সেটা হল বিচারসামর্থ্য, বাছাই করার যাচাই করার ক্ষমতা। বেদে এই ক্ষমতার নাম 'দক্ষ'। দক্ষের অর্থ শক্তি কিন্তু প্রায়ই তা ব্যবহার করা হয়েছে বিচার করার মানসিক শক্তি হিসেবে। (১৬) অগ্নিকে বলা হয়েছে 'সুদক্ষ'। অগ্নি কেবল দেন না প্রেরণা, দৃষ্টি, স্মৃতি, তিনি দেন বিচারক্ষমতাও।

সুদক্ষো দক্ষৈঃ ক্রতুনাসি সুক্রতুরগ্নে কবিঃ কাব্যেনাসি বিশ্ববিৎ। (১০, ৯১, ৩) হে অগ্নি, বিচারক্ষমতায় তুমি সুবিচারক, কর্মের ইচ্ছায় তুমি সুকর্মা, কাব্যধারা তুমি সর্বজ্ঞ কবি।

আরো বলা হয়েছে, অগ্নির মন যার উপরে পড়ে, তাকে তিনি দেন ঊর্ধ্বতন বিচারশক্তি, দক্ষং উত্তরং—

যত্র ক চ তে মনো দক্ষং দধস উত্তরম্। (৬, ১৬, ১৭)

অগ্নি যেমন তেমনি অন্য দেবতারাও কবি। অগ্নির সঙ্গে বিশেষ করে ইন্দ্র কবিকর্মের বিরাট অংশীদার। 'কবিক্রতু'র কবি যদি বলা যায় অগ্নিকে তবে ইন্দ্রকে বলা যেতে পারে ক্রতু, যদিও উভয়ের মধ্যে আছে দু-ই। ঋষি বলছেন, ইন্দ্রঃ...ক্রতুর্ভবতি (১, ১৭, ৫), ইন্দ্র ক্রতু হন। আবার, ইন্দ্রঃ...ক্রতুং পুনীতে (৮, ১৩, ৮), ইন্দ্র ক্রতুকে করেন পরিশুদ্ধ।

ইন্দ্রকে বলা হয়েছে কবিদের মধ্যে বিপ্রতম।

ঘামাহবিপ্রতমং কবীনাম্।

ন ঋতে ত্বৎ কিষ্ণনারে মহামর্কং মঘবঞ্চিত্রমর্চ। (১০, ১১২, ৯)

তোমাকে বলা হয় কবিদের মধ্যে কবিশ্রেষ্ঠ ; তুমি ছাড়া কোথাও কিছু করা যায় না ; রচনা করো, হে ইন্দ্র, এক মহাগীতি।

ইন্দ্র বৃত্রকে হত্যা করে মুক্ত করেছেন নদী। নদীর অর্থ কি ? আর নদীদের মধ্যে আমরা পাই সরস্বতীর নাম। সরস্বতীর সঙ্গে ইন্দ্রের যোগ আছে। ইন্দ্র দিব্যানন্দ আর সরস্বতী হচ্ছেন বিজ্ঞানলোক থেকে নেমে-আসা প্রেরণা। (১৭) ইন্দ্রও কবি, বিশেষ করে কবির সক্রিয় শক্তি, ক্রতু, যা সব বাধা বিদীর্ণ করে ঊর্ধ্বলোক থেকে নিয়ে আসে সত্যের জ্যোতি। বেদে সে-জ্যোতিকে বলা হয়েছে গাভী যা বন্দী ছিল পণিদের অন্ধকার গুহায়। ইন্দ্র গাভীদের ফিরিয়ে এনেছেন। গাভী এবং জল উভয়ই জ্যোতির এবং গীতির প্রতীক। (১৮) একটি শ্লোকে এই দুটি প্রতীক একসঙ্গে গাঁথা হয়েছে—

অতিষ্ঠন্নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।

অপাং বিলমপিহিতং যদাসীৎ্ত্রং তদবধীঃ অপ তদ্ববার। (১, ৩২, ১১)

অবরুদ্ধ ছিল জল পণির হাতে গাভীদের মতো ; বৃত্রকে হত্যা করে (ইন্দ্র) মুক্ত করলেন জলের সেই গহ্বর যা বন্ধ হয়ে ছিল।

তাই দেখি ইন্দ্র কেবল সত্যকে দেখান না, তিনি নির্ঝরের স্বপ্ন ভাঙিয়ে মুক্ত করে দেন জ্যোতির্ময়ী বৃহদ্বাক্।

অন্য দেবতারাও কবিকর্মের ও কবিদৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এখানে তাদের আলোচনার সুযোগ অল্প। বেদের ঋষিরা জানতেন যে দেবতারা তদেকং-এর বিভিন্ন প্রকাশ। দেবতারা পুরোপুরি স্বতন্ত্র নন। তাই এক দেবতার বিশেষণে অন্য দেবতাকে বিভূষিত করতে ঋষিরা দ্বিধা করেন নি। আমরা এখানে বিশ্লেষণের খাতিরে দুজন প্রধান দেবতার কিছু আলোচনা করে দেখতে চেষ্টা করেছি যে, অগ্নি ও ইন্দ্র ঋষিকবির কাব্যসাধনার দুই অপরিহার্য শক্তি—একে অন্যের পরিপূরক এবং একজন অন্যজনের কর্ম নির্বাহ করতে ইতস্তত করেন না। ইন্দ্র তাই বিপ্রতমঃ কবিনাং, অগ্নিও তেমনি ক্রতু—স হি ক্রতু (১, ৭৭, ৩), তিনিই ক্রতু। আবার অগ্নিকেই বলা হচ্ছে, ঋতস্য ধারা অনু তৃঙ্ধি পূর্বীঃ (৫, ১২, ২)—তুমি খনন করো ঋতের বহু ধারা।

দেবকবিদের যা গুণ দেখা যায় মর্ত্যকবিদেরও তা-ই, কারণ দেবপ্রসাদে এঁরা হন দেবতার সমান ; এঁরা পান দেবরহস্যের খোঁজ। বারবার বেদে কবিকে যে-সংজ্ঞাদ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে তা হল—কবয়ঃ সত্যশ্রুতঃ, অর্থাৎ কবি তাঁরাই যাঁরা শুনেছেন সত্য। সত্যশ্রুৎ-এর সঙ্গে বলা হয়েছে যে কবিরা সত্যদ্রষ্টাও।

কবিকে যে-সব সংজ্ঞায় বেদে অভিহিত করা হয়েছে তার বিশ্লেষণ করলে আমরা কবি

সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য পেতে পারি। ঋষি ও কবি ছাড়াও প্রায়ই কবিকে বলা হয়েছে বিপ্র, বিপশ্চিৎ, মনীষী, মেধাবী, ধীর। ঋষি বা কবি তিনিই যিনি দেখেছেন সত্যের ঋতের বৃহতের দীপ্তি এবং সে-দর্শনকে ব্যক্ত করেছেন ভাষায়। কবি যে সত্যের শ্রোতা, ঋষি যে সত্যের দ্রষ্টা এ-কথা ভারত কখনো ভুলে যায়নি। পরের যুগের স্মৃতিতেও তা উদ্ঘোষিত হয়েছে। মহাভারতে তাই বলা হয়েছে, অতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টারঃ ঋষয়ঃ। তেষাং বেদদ্রষ্টৃত্বং স্মর্যতে। (শান্তিপর্ব) ঋষিরা দেখেন অতীন্দ্রিয় বস্তু। সত্য কবির চোখে উদ্ভাসিত হয় চিত্রকল্পে। দার্শনিক মনের কাছে যা বিমূর্ত, যা ভাবমূলক মাত্র, ঋষিমনের কাছে তা হয় মূর্তিমান্, হয় বস্তুমূলক। ঋষিকবির প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে তাই সত্যের সক্রিয় শক্তি প্রতিভাত হয় অশ্বরূপে। (১৯) ঋষি দীর্ঘতমা বলছেন—

অধা তে ভদ্রা রশনা অপশ্যন্নৃতস্য যা অভিরক্ষন্তি গোপাঃ।।
আন্নানং তে মনসারাদজানামবো দিবা পতয়ন্তং পতঙ্গম্।
শিরো অপশ্যং পথিভিঃ সুগেভিররেণুভির্জেহমানং পতত্রি।। (১, ১৬৩, ৫-৬)

এখানে আমি দেখেছি তোমার কল্যাণময় রশ্মি যা ঋতের পালকদের রক্ষা করে। আমি মন দিয়ে দূর থেকে জেনেছি তোমার আত্মাকে যা স্বর্গপথে পাখির মতো উড়ে নামছে নিচের দিকে। আমি দেখেছি তোমার পক্ষবান্ শির যা হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে সুগম ধূলাহীন পথ দিয়ে। (২৩)

'অপশ্যন্' কথাটি প্রণিধানযোগ্য। কথাটি আরো গভীর অর্থবহ হয়ে ওঠে যদি আমরা পরবর্তী পৌরাণিক কাহিনী মেনে নিই যে দীর্ঘতমা ছিলেন জন্মান্ধ। তিনি যা দেখেছেন তা হচ্ছে মন দিয়ে—মনসা—অর্থাৎ প্রজ্ঞাচক্ষু দিয়ে। তিনি সমস্ত অন্ধকারের অন্তরালে দেখেছেন অগ্নির কল্যাণময় রশ্মি। 'রসনা' শব্দের শ্লেষ এখানে লক্ষ্য করার জিনিস। 'রসনা' শব্দের অর্থ 'রশ্মি' শব্দটির মতোই, একদিকে কিরণ অন্যদিকে বল্গা। একটি কথার সাহায্যে এক আধ্যাত্মিক বিমূর্ত অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি হয়ে উঠেছে বাস্তব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য।

সত্য বৈদিক কবিদের কাছে বাস্তব অর্থাৎ পিণ্ডীভূত হয়ে ধরা দিয়েছিল। এক-জন কবি বলছেন—

অভি প্রিয়াণি মর্মৃশৎ পরাণি কর্বীরিচ্ছামি সম্দৃশে সুমেধাঃ। (৩, ৩৮, ১)

সুমেধা আমি, অতি তীব্রভাবে স্পর্শ করেছি আমার প্রিয় পরম বস্তু সকল ; আমি ইচ্ছা করি অন্য কবিরা তা দেখুন।

এখানে শুধু দেখা নয়। কবি সত্যকে স্পর্শ করেছেন এবং সে স্পর্শ অত্যন্ত তীব্র। (২১) তিনি যে সব পরম বস্তুকে স্পর্শ করেছেন সে-গুলিকে দেখাতে চান অন্য কবিদেরও। একই সূক্তে কবি আরো বলছেন—অপশামত্র মনসা—মন দিয়ে, প্রজ্ঞাচক্ষু দিয়ে, দেখেছি আমি।

দেখা যেমন আছে তেমনি আছে শোনা—কবয়ঃ সত্যশ্রুতরঃ। বস্তুকে দেখে যেমন

জানা যায় তেমনি জানা যায় তার শব্দময় রূপকে উপলব্ধি করে। বস্তুর শব্দব্রহ্মময় সার হলো তার 'নাম।' প্রতি বস্তুর আছে 'নাম' আর 'রূপ'। রূপকে জানা যায় দৃষ্টি দিয়ে আর নামকে জানতে হয় শ্রুতি দিয়ে। রূপের মাধ্যমে যেমন, নামের মাধ্যমেও তেমনই সদ্‌বস্তু প্রকট হয়; যা ছিল গুহাহিত তার হয় আবির্ভাব।

বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎ প্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
যদেষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রমাসীৎ প্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ॥ (১০, ৭১, ১)

হে বৃহস্পতি, যখন আদিতে বস্তুর নাম দিতে দিতে প্রথম বাক্ উচ্চারণ করল মানুষ তখন সেই বস্তুপুঞ্জের যা ছিল শ্রেষ্ঠ, যা ছিল শুদ্ধ, যা ছিল গুহামধ্যে লুক্কায়িত প্রেরণের পথে তার হল আবির্ভাব।

আরো বলা হয়েছে—

গৃৎসস্য পদং কবয়ঃ নি পান্তি গুহা নামানি দধিরে পরাণি। (১০, ৫, ২)

কবিরা রক্ষা করেন গৃৎসের পদ, গুহার মধ্যে ধরে রাখেন সব পরম নাম।

এখানেও দেখছি 'নাম' সত্যের পদ, সত্যের ধামের মতো কবির আয়ত্তাধীন। সেই পরম নাম গাভীরূপে, জলরূপে, বন্দী ছিল অন্ধকার গুহার মধ্যে, তা মুক্ত হয়েছে; এখন কবির উপর ভার পড়ল সেই বাক্-ব্রহ্মকে রক্ষা করার। অদীক্ষিতের কাছ থেকে এবং পণিদের কাছ থেকে সেই নামকে রাখতে হবে গোপনে—অন্য এক গুহার মধ্যে। মনে হয় এই গুহা হল বৈদিক কাব্যের রূপক ও প্রতীক। কবিরা তাঁদের উপলব্ধি, তাঁদের প্রজ্ঞা, তাঁদের দেখা সমস্তর রূপ এবং তাঁদের শোনা সমস্তর নাম, এক জটিল অনেকাংশে দুর্বোধ্য, রূপকের মধ্যে ধরে রেখেছেন।

দেখা আর শোনা চর্মচক্ষে ও চর্মকর্ণে হয় না, একথা ঋষিরা ভালো করেই জানতেন। তাই—

উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্। (১০, ৭১, ৪)

কেউ কেউ দেখেও দেখেনি সেই বাক্, কেউ কেউ শুনেও শোনেনি তাকে।

কান থাকলেই শোনা যায় না; চোখ থাকলেই দেখা যায় না। বৈদিক ঋষিরা যাকে বলেছেন মন—মনঃ—তার উপর নির্ভর করে দেখা ও শোনার ক্ষমতা।

অক্ষণ্বন্তঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ো মনোজবেষ্বসমা বভূবুঃ। (১০, ৭১, ৭)

বন্ধুরা সবাই ছিলেন চক্ষুষ্মান্ ও কর্ণবান্ কিন্তু মনের গতিতে তাঁরা হলেন অসম।

বৈদিক ঋষিদের কাব্যচিন্তায় 'মন' কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। মন হচ্ছে সত্তার সেই অংশ যা দ্বারা কবি সত্যকে জানেন, দেখেন, শোনেন। এর সঙ্গে ব্যুৎপত্তিগত যোগ আছে মন্ত্রের মনীষাকার, মনীষীর। ঋগ্বেদে কবিকে মনীষী বলা হয়েছে বহুবার। আমরা উপরে দেখেছি কবি দেখেন ও শোনেন। কিন্তু এ-দেখা ও এ-শোনা মনের। মনকে তপস্যা দ্বারা পবিত্র করলে মন হয় প্রাজ্ঞ। এই প্রাজ্ঞমনের শক্তিই মনীষা। কিংবা কিংবা বলতে পারি মনীষা হচ্ছে মনের সেই অবস্থা যাকে আমরা সচেতন ভাবে, সরাসরি

প্রেরণ করতে পারি সমস্তর দিকে সমস্তকে জানবার জন্য। মনীষা এক উজ্জ্বল দৈবী শক্তি কিন্তু তার ধাম মানুষের মনে ; আর মন থেকে তার যাত্রা সুরু হয় ঊর্ধ্বের দিকে, সম্মুখের দিকে—

প্র শুক্রৈতু দেবী মনীষা অস্মৎ (৭, ৩৪, ১)

শুভ্রা দেবী মনীষা এগিয়ে যান আমার মন থেকে।

মনীষা হচ্ছে প্রজ্ঞাবান মন। সেই মনের মধ্যে যে সত্য মূর্ত হয় তাকেও বলা হয়েছে মনীষা বা মন্ম ; আর মনীষার বীর্যময় ছন্দোময় শব্দমূর্তি হল মন্ত্র। একটি সূক্তে বামদেব অগ্নিকে আহ্বান করে বলছেন

বি ঘাহ্যগ্নে গৃণতে মনীষাং ঋং বেপসা তুবিজাত স্তবানঃ।
বিশ্বেভির্যদ্ বাবনঃ শুক্র দেবৈরগ্নো রায় সুবতো ভূরি জন্ম॥
ত্বদগ্নে কাব্যা ত্বন্মনীষাস্ত্বদুক্থা জায়ন্তে রাধ্যানি। (৪, ১১, ২-৩)

বহুজন্মা হে অগ্নি, তোমার স্তব করা হচ্ছে। তোমার বেপনান তেজে তাদের জন্য খুলে দাও স্বর্গের দ্বার যারা গাইছে মনীষা। হে সুমহান, হে শুভ্র, সব দেবতাদের সঙ্গে যা জয় করেছ, সেই বিপুল জন্ম আমাদের দাও। হে অগ্নি, তোমা থেকে জন্মাচ্ছে কাব্য, তোমা থেকে মনীষা, তোমা থেকে সার্থক স্তোত্র।

মনীষাকে যিনি প্রকাশ করেন তিনিই মনীষী। বৈদিক যুগে বোধহয় কবি আর মনীষীর মধ্যে খুব বেশি প্রভেদ ছিল না। কিন্তু কবিকৃতির মধ্যে দেখা যায় সৃষ্টির প্রাধান্য আর মনীষার মধ্যে প্রথম থেকেই ছিল মননের ইচ্ছা, মন দিয়ে বিচার করবার বিশ্লেষণ করবার জানবার একটা আকাঙ্ক্ষা। পরবর্তী যুগে প্রভেদটা স্পষ্টতর হয়েছে। ঋগ্বেদের শেষের দিকেই দেখা যায়—মনীষিণো মনসা পৃচ্ছেদং (১০, ৮১, ৪), হে মনীষীগণ, মন দ্বারা জিজ্ঞাসা করা হোক। আগে দেখেছি 'মনসা অপশ্যন্', সেখানে মন দিয়ে দেখার কথা ছিল কিন্তু পরে পাচ্ছি 'মনসা পৃচ্ছেদং', মন দিয়ে জিজ্ঞাসা করার কথা।

কবির সমার্থক আর একটি শব্দ হচ্ছে 'ধীর'। ধীর হচ্ছেন তিনি যাঁর আছে ধী-শক্তি। 'ধী'র সঙ্গে বুদ্ধি ও ধ্যানের যোগ আছে। বেদে শব্দটির অর্থ 'মনন' অথবা 'মননের প্রকাশক শব্দ'। (২২) যিনি ধী-সম্পন্ন তিনিই 'ধীর'। কিন্তু ধী শুধু যুক্তিবাদী মনের মনন নয়। কবি সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা করছেন, সরস্বতী...ধিয়ং ধাৎ (৬, ৪৯, ৭), সরস্বতী দিন ধী। সরস্বতীর দান হচ্ছে কাব্যমন্ত্র ; ধী তাই উজ্জ্বল বিজ্ঞানময় মনের মনন। ঋষিকবি মধুচ্ছন্দা ধীকে বিশেষিত করেছেন 'ঘৃতাচী' কথাটি দিয়ে। ধিয়ং ঘৃতাচীং (১, ২, ৭), জ্যোতির্ময়ী ধী, "bright understanding" (২৩)

'বিপ্র' আর 'বিপশ্চিৎ'ও কবির সমার্থক। আমরা উপরে 'বেপসা' (৪, ১১, ২) কথাটি পেয়েছি। বিপ্র বিপশ্চিৎ আর বেপসা কথা তিনটির মূলে আছে বিপ্- (বেপ্-) ধাতু। বিপ্- অর্থাৎ কম্পন। এই কাঁপা, স্পন্দ, হচ্ছে ব্রহ্মের প্রথম উন্মেষ। তার দ্বিধা প্রকাশ নামে ও রূপে, কিংবা বলতে পারি ছন্দে ও জ্যোতিতে। তিনিই বিপ্র যিনি

জ্যোতির্ব্রহ্ম বা শব্দব্রহ্মকে জানেন। বিপশ্চিৎও তা-ই—যিনি এই স্পন্দন বোঝেন। এই স্পন্দনই হল প্রজ্ঞান; কবিরা তা-ই গম্ভীরবেপসঃ—গভীরপ্রজ্ঞ।

কবি যা প্রকাশ করেন তা হল কাব্য। কাব্য আসে দেবতাদের কাছ থেকে—ত্বদগ্নে কাব্যা...জায়ন্তে (৪. ১১. ৩). হে অগ্নি, কাব্য সব তোমার কাছ থেকে জন্ম নেয়। কাব্যের দ্বারাই অগ্নি বিশ্ববিদ্ (১০. ৯১. ৩)। শুধু জ্ঞান নয়। কাব্য শক্তিও। সেইজন্যই অগ্নির কাছে মানুষের প্রার্থনা—

পশ্চাৎ পুরস্তাদধরাদুদক্তাৎ কবিঃ কাব্যেন পরি পাহি রাজন্ (১০, ৮৭, ২১) হে রাজন্, কবি তুমি। কাব্য দিয়ে তুমি আমাদের সামনে পিছনে উপরে নিচে রক্ষা করো। সেখানে ঝরে পড়ে মধু (মাধুর্য) আর ঘৃতের (জ্যোতির) ধারা।

স্রোতন্তি ধারা মধুনো ঘৃতস্য বৃষা যত্র বাবৃধে কাব্যেন (৩. ১, ৮)

কাব্য থেকেই আসে মাধুর্য, মধু, সোমরস। পরের যুগে অলঙ্কারশাস্ত্রে যাকে বলা হয়েছে 'রস' তাকেই এখানে বলা হচ্ছে 'মধু'। এই মধুর সঙ্গে আছে জ্যোতি বা প্রজ্ঞান। যখন জ্যোতির আর রসের মিলন হয় সুষ্ঠু তখনই কাব্যে আসে উৎকর্ষ।

অগ্নি সমস্ত কাব্য জানেন—বিশ্বানি কাব্যানি বিদ্বান্ (৩. ১, ১৭, ১৮)—তাই তিনি হন মানুষের অন্তরে দেবতাদের মন্ত্র কেতু—যা দেবানামভবঃ কেতুরগ্নে মন্দ্রো। কেতু কি? কেতু হচ্ছে নিশান—যা করে দিক্ নির্দেশ, 'a ray of perception or intuition' (২৪); এবং সমস্ত কাব্য জানেন বলেই অগ্নি মর্ত্যের গৃহে, অমর তিনি, বসেন রাজা হয়ে—নি দুরোণে অমৃতো মর্ত্যানাং রাজা সসাদ।

এখানে আমরা পাচ্ছি কাব্যের এক বিস্তৃত সংজ্ঞা। কাব্য শুধুই নয় মানুষী ভাষায় সত্যের বা সমস্তর প্রকাশ। ভাষায় প্রকাশ মানবিক জগতের কাব্যের এক অপরিহার্য অঙ্গ। দেবতাদের প্রয়োজন সেই ভাষার, তাই হয়তো কখনো কখনো মর্ত্যকবিদের অনুসরণ করেন দেবতারা যখন তাঁরা চান ভাষায় প্রকাশ করতে বিমূর্ত কাব্যকে। ঋগ্বেদে দেবতা সোম সম্বন্ধে বলা হচ্ছে—

প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তি। (৯, ৯৭, ৭)

উশনার মতো কাব্য বলতে বলতে দেবতা (সোম) দেবতাদের জন্ম প্রকট করে বললেন।

আমরা এখানে দেখেছি কাব্য দেবালোকে ভাষায় অপ্রকাশিত থাকতে পারে কিন্তু মরলোকে প্রকাশ ছাড়া কাব্য নেই। তাই ভট্ট তৌত বলেছেন—

নোদিতা কবিতা লোকে যাবদ্ভজাতা ন বর্ণনা।

যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্ণনার জন্ম হল ততক্ষণ পৃথিবীতে, 'লোকে', কবিতার উদয় হল না। তাই পার্থিব কাব্যে প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি, প্রথম সত্য।

"অনেকে বলেন, সাহিত্যে কেবল একমাত্র সত্য আছে, সেটা হচ্ছে প্রকাশের সত্য। অর্থাৎ, যেটি ব্যক্ত করতে চাই সেটি প্রকাশ করবার উপায়গুলি অবধা হলেই সেটা মিথ্যা হল এবং যথাযথ হলেই সত্য হল।

"এক হিসাবে কথাটা ঠিক। প্রকাশটাই হচ্ছে সাহিত্যের প্রথম সত্য। কিন্তু ওইটেই কি শেষ সত্য?" (সাহিত্যের প্রাণ?) (২৫)

বৈদিক কবিদের দিক থেকে দেখতে গেলে হয়তো কথাটিকে উলটে বলতে হবে। কারণ সেখানে দর্শনটা হচ্ছে প্রথম সত্য কিন্তু তা শেষ সত্য নয়। বৈদিক ঋষিরা দুই সত্যকে ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রে। এখানে আমরা পাচ্ছি বাল্মীকি পূর্ব ও বাল্মীকি উত্তর কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্যময় পার্থক্য।

সদ্বস্তুর দর্শন ও তার প্রকাশ—আমরা এ-ভাবেও কাব্যের একটা সংজ্ঞা দিতে পারি। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, কাব্য হচ্ছে সদ্বস্তুর মন্ত্র "the *mantra* of the Real." (২৬) বৈদিক কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংজ্ঞাটি বিচার্য।

কবি চাইছেন সত্যকে, ঋতকে প্রকাশ করতে। কিন্তু যা আমাদের মধ্যে নেই তা আমাদের পক্ষে প্রকাশ করা অসম্ভব। এমন কি যা আমাদের মধ্যে নেই তাকে দেখাও সম্ভব নয়, জানাও সম্ভব নয়। বেদে নানা ভাবে বেদান্তের মূল সত্যটি—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম —প্রকাশ করা হয়েছে। (২৭) যে এক অদ্বিতীয়, ঊর্ধ্বের জ্যোতির্ময় অর্ণব, তা-ই নিম্নে অবচেতনার সাগর, অপ্রকেতং সলিলং। তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল যে অগ্নি—অর্থাৎ ঊর্ধ্বের জ্যোতির্ময় অর্ণবের ঢেউ তা জন্ম নিয়েছে মানুষের দেহে। তাই অগ্নি দেহের পুত্র, তনূনপাৎ। অগ্নি তাই মানুষের মধ্যে ঊর্ধ্বের আর নিম্নের যোগসূত্র। নিম্নের যে সমুদ্রের কথা বলা হল তার দুটো রূপ আছে; একটা নৈর্ব্যক্তিক, যা ছিল মানবের আবির্ভাবের আগেও; অন্যটির স্থান ব্যক্তির অন্তরে। নৈর্ব্যক্তিক মহা অচেতনার সমুদ্র থেকে অগ্নির জন্ম হল, অর্থাৎ সৃষ্টি হল মানবের, ব্যক্তিত্বের। অগ্নি প্রবেশ করলেন মানবদেহে আত্মারূপে—আত্মাই পুত্র—আর সেই সঙ্গে নিতে এলেন মহাসমুদ্রকেও। কিন্তু বহু ব্যক্তির অন্তরে সমুদ্র প্রবেশ করলেও নৈর্ব্যক্তিক সমুদ্রের ক্ষয় ক্ষতি হল না, কারণ পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

ব্যক্তির আন্তর সমুদ্রকে বেদে বলা হয়েছে হৃৎ-সমুদ্র। (২৮) অন্যভাবে বলতে পারি, অপ্রকেত সলিল, নিম্নের নৈর্ব্যক্তিক সমুদ্র হল অচেতনা, inconscient, আর হৃৎ-সমুদ্র হল অবচেতনা বা অন্তশ্চেতনা, subconscient বা subliminal consciousness। অচেতনার মধ্যে ঊর্ধ্বচেতনা সম্পূর্ণ গোপন, আন্তর চেতনায় তা অগ্নি রূপে, আত্মারূপে ঊর্ধ্বচেতনার দিকে প্রসারিত। দার্শনিকতার পথে না গিয়ে কাব্য মানসের ব্যক্তিগত চেতনার আঙ্গিক থেকে বিচার করলে পূর্ণ অচেতনার কোন স্থান নেই আমাদের আত্মিক উপলব্ধিতে—সেখানে থাকে শুধু আন্তর চেতনা আর ঊর্ধ্বচেতনা। মনে হয় বেদের কবিরা বিশেষ করে এ দুটির কথাই বলেছেন।

দেবতারা ধারণ করে আছেন ঊর্ধ্বসমুদ্র। তাই কবির প্রার্থনা—

যে অপ্সবরূর্ধং চিত্ররাধসস্তে নো রাসন্তাম্ বহয়ে সুনিত্র্যাঃ। (১০, ৬৫, ৩) যাঁরা অপূর্ব আনন্দের অধিকারী, আমাদের প্রিয় মিত্র তাঁরা; তাঁরা আমাদের দিন জ্যোতির্ময় সমুদ্র যাতে আমরা হতে পারি মহৎ।

দেবতারা চিত্ররাধাঃ, অর্থাৎ বিচিত্র আনন্দের অধিকারী। ইন্দ্রকে বলা হয়েছে সত্যরাধাঃ—সত্যেই তাঁর আনন্দ। (২৯) তাঁদের কাছে কবি প্রার্থনা করছেন 'অপ্সবং অর্ণবং'। প্রার্থনার বস্তু নিশ্চয়ই জলময় সমুদ্র নয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে উর্ধ্ব আনন্দের পরম জ্যোতির কথা।

যোগী সেই জ্যোতিসমুদ্রের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করতে পারেন. ঋষি তার দর্শন পেতে পারেন কিন্তু কবি চাইছেন তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে। কিন্তু প্রকাশ আসে হৃৎ-সমুদ্র থেকে। ঋষিকবি যখন উর্ধ্বজ্যোতির দর্শন পেলেন তখন বুঝি সেই উর্ধ্বের আকর্ষণে তাঁর হৃৎ-সমুদ্র থেকে উত্থিত হয় এক মধুময় তরঙ্গ—সেই ঊর্মিধুমান্-ই মন্ত্র, আন্তর অগ্নির বাঙ্ময় প্রকাশ যা উঠে যায় উর্ধ্বে, উর্ধ্বের সঙ্গে যুক্ত করে অধঃকে। এবং উর্ধ্ব থেকে নিয়ে আসে সত্যের আলোক।

বৈদিক কবিরা নানা উপমার ও প্রতীকের ভিতর দিয়ে এই 'সত্য' আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কখনো তার নাম দিয়েছেন আলো জ্যোতি, কখনো জল, জলধারা ঊর্মি; 'ঘৃত' শব্দটির মধ্যেও অনেকগুলি প্রতীক এক হয়ে গেছে। ঘৃত একদিকে আলোর প্রতীক অন্যদিকে জলের। কিন্তু এই জল হল মধুমান্ জল, অর্থাৎ সোম, এবং তা আবার বাক্-ও। একদিকে যেমন বলা হয়েছে ঊর্মির্মধুমান্, তেমনি অন্যদিকে বলা হয়েছে মধুমৎ বচঃ (১, ৭৮, ৫), মধুমত্তমং বচঃ (৫, ১১, ৫)। ঋষিরা বহুবার নানাভাবে আন্তর জ্যোতির কথা বলেছেন। সে-জ্যোতি সম্বস্থ, চিৎশক্তি কিন্তু তা কাব্যও। বৃহস্পতির উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে—বিভতো জ্যোতিরাসা (১০. ৬৭, ১০), মুখে জ্যোতি ধারণ ক'রে... অন্য জায়গায় বৃহস্পতির কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, হে বৃহস্পতি, হে গুতজাত, দাও আমাদের উজ্জ্বল ধন—দ্রবিণং ধেহি চিত্রং (২, ২৩, ১৫১)। বৃহস্পতির কাছে যে উজ্জ্বল ঐশ্বর্যের যাচ্ঞা করা হচ্ছে তা যে বাক্ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাঙ্ময় জ্যোতি পৃথিবীতে নেমে আসে সুপর্ণ গরুত্মানের (৩০) মতো। কারণ যে 'একং সৎ'-কে আমরা ইন্দ্র মিত্র বরুণ অগ্নি যম মাতরিশ্বা বলে ডাকি, সেই এককেই ঋষি দীর্ঘতমা বলছেন 'দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্ (১, ১৬৪, ৪৬)। তিনি আরো বলছেন,

কৃষ্ণং নিয়ানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিবমুৎপতন্তি।
ত আববৃত্রন্ সদনাদৃতস্যাদিদ্ ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে॥ (১, ১৬৪, ৪৭)

সুবর্ণপক্ষ রশ্মিকুল, বিহঙ্গের মতো, জলস্রোতের রূপ ধারণ করে কৃষ্ণ পথ বেয়ে দ্যুলোকে উঠে চলে। তারা ফিরে আসে সত্যের আসন হতে, তপ্ত তেজে পৃথিবীকে উর্ধ্বের প্রসারে ঠেলে নিয়ে চলে। (৩১)

কবি দীর্ঘকাল এখানে বাষ্প ও বৃষ্টির প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করছেন আর্যচেতনার ও কবিচেতনার সত্য। কবিকর্মের গতি দ্বিমুখী, সাধনার গতির মতোই। (৩২) সত্যকে জানবার জন্য কবির আশ্পৃহা হচ্ছে সুন্দরপক্ষ রশ্মিরাজি, হরয়ঃ সুপর্ণাঃ—এই রশ্মিরাজি বাষ্পের মতো উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। এখানে হরয়ঃ সুপর্ণাঃর সঙ্গে আগের ঋকের

গরুত্মান্-এর সম্বন্ধ লক্ষণীয়। 'একং সৎ'-রূপ গরুত্মানের দিকে, বহুরূপে সম্বিত মর্ত্যের কাব্য আশ্লিষ্ট প্রার্থনা শোভনপক্ষ রশ্মিরাজি। (৩৩) এবং তা আবার নিয়ে আসছে সত্যকে, সত্যের ধাম থেকে, সদনাদ্ ঋতস্য। যে সত্য নেমে আসছে তার রূপ হচ্ছে ঘৃত—সাধনার দিক থেকে দেখলে সেই ঘৃত হল বিজ্ঞান, কাব্যের দিক থেকে দেখলে তা-ই ব্রহ্ম-কাব্য।

এখানে একটা প্রশ্ন জাগে—কাব্যের দ্বিমুখী গতির অর্থ কি? কবির হৃৎ-সমুদ্র থেকে যে বঙ্কুর উর্মি উঠে গেছে কাব্যরূপে তা-ই কি যথেষ্ট নয়? তা-ই কি প্রকাশের চূড়ান্ত নয়? ব্যক্তিগতভাবে দেখলে তা-ই যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে বৈদিক ঋষিকবিদের আদর্শ ছিল না কেবল ব্যক্তিগত কৈবল্যলাভ, তাঁরা চেয়েছিলেন পৃথিবীকে স্বর্গে উন্নীত করতে, ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে। কাব্যের দিক থেকেও একই কথা প্রযোজ্য। কাব্য তো শুধু ব্যক্তিগত প্রকাশ নয়। ব্যক্তির হৃৎ-সমুদ্রের যে ঊর্মি তাকে যদি না যুক্ত করা যায় বিশ্ব-সমুদ্রের (৩৪) সঙ্গে তবে সে-কাব্যে জগতের কোন লাভ নেই। সে-কাব্য দেবতার ভোগে লাগলেও, মানুষের ভোগে লাগে না। কিন্তু ঊর্ধ্ব-অর্ণবের সঙ্গে হৃৎ-সমুদ্রের ঊর্মি যুক্ত হয়ে আবার যখন নেমে আসে তখন সে-অবতরণ আর ব্যক্তিমুখী থাকে না, তা হয় সর্বতোমুখী—তখন তা জয় করে সমস্ত পৃথিবীকে—ভূমিং পর্জন্যা দিবমুস্তি (১, ১৬৪, ৫১)। এবং কাব্য বিশ্বজনীন হয় বলেই আমরা কাব্যের পথে—যা কি না 'ঋতস্য পন্থা'রই (৩৫) বাক্-রূপ—যুক্ত হতে পারি ঊর্ধ্বের সঙ্গে, বিশ্বের সঙ্গে এবং কবিমানসের সঙ্গে। ঋষিকবির উপলব্ধি তখন আর ব্যক্তিমনে আবদ্ধ না থেকে হয়ে যায় জগতের সম্পদ।

আমরা বিশ্লেষণের খাতিরে সমস্তকে নানাবিধ সমুদ্রের রূপে দেখেছি—বৈদিক ঋষিরাও নানা সমুদ্রের কথা বলেছেন কিন্তু তাঁরা ভালো করেই জানতেন বহু একেরই প্রকাশ। জগতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তা 'বহু', ব্রহ্মের স্থিতি থেকে দেখলে তা 'এক'—আত্মার স্থিতি থেকে দেখলেও তা এক। তাই ব্যক্তিমানস থেকে যদি আমরা বিচার করি তবে দেখতে পাই হৃৎ-সমুদ্র এক এবং অদ্বিতীয়। অর্থাৎ যা হৃৎ-সমুদ্র তা-ই ঊর্ধ্বের জ্যোতির্ময় অর্ণব। (৩৬) ঋষিকবি বলছেন—

এক: সমুদ্রো ধরুণো রয়ীণামস্মদ্ঘৃদো ভূরিজন্মা বি চষ্টে।
সিষক্ত্যূ:ধনিণোরুপস্থ উৎসস্য মধ্যে নিহিতং পদং বে:। (১০, ৫, ১)

সমুদ্র এক, তা ধরে আছে সম্পদ সব, আমাদের হৃদয় থেকে বহুরূপে জন্ম নিয়ে সব কিছু তিনি (অগ্নি) বৃহৎ দৃষ্টিতে দেখেন। দুই গহনের ক্রোড়ে বসে, তাদের স্তনে আসক্ত তিনি। (হে অগ্নি), তুমি উৎসের মধ্যে গূঢ় পদ ভোগ করো।

দুই গহনের—নিণ্যো:—পুত্র হচ্ছেন অগ্নি। দুই সমুদ্র, কিন্তু তা এই হৃৎ-সমুদ্রে নিহিত এবং তাতেই আছে গূঢ়পদ—ঋতস্য পদং—যা হল 'পরম নাম', তাকেই পালন করছেন কবিরা—

ঋতস্য পদং কবয়ো নি পান্তি গুহা নামানি দধিরে পরাণি। (১০৫, ২)

কবিরা পালন করছেন সত্যের পদ, তাঁরা ধারণ করে আছেন গুহ্য নাম সব।

অগ্নি যে স্তনে আসক্ত, যা সমুদ্রের গভীরে, তাতে কবিও আসক্ত। সে-সমুদ্র সোমের ; সেই সোমরস—জ্যোতি, ঘৃত—পান করে কবিরা সূর্যেরও ওপারে উড়ে যান।

উতাহং নক্তমুত সোম তে দিবা সখ্যায় বভ্রু উদনি।
মৃণা তপান্তমতি সূর্যং পয়ঃ শকুনা ইব পপ্তিম॥
মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্য সমুদ্রে বাচমিন্বসি। (৯, ১০৭, ২০-২১)

এবং, হে বভ্রুবর্ণ সোম, রাত্রিদিন আমরা মিলনের আশায় তোমার স্তনে (আসক্ত)। বিহঙ্গের মতো আমরা বিপুল তেজে প্রজ্বলন্ত সূর্য পার হয়ে উড়ে যাই। সুন্দর তোমার হাত ; (৩৭) সমুদ্রে পরিমার্জিত হতে হতে তুমি প্রকট করো বাক্।

আমরা এখানে দেখছি, কবি সোমরস পান করে হচ্ছেন জ্যোতির ও জ্ঞানের অধিকারী। এবং সেই সোমের সমুদ্র থেকে তখন উদ্‌থিত হচ্ছে মন্ত্র, যাকে ঋষি বামদেব বলছেন মধুমান্ ঊর্মি—

সমুদ্রাদূর্মির্মধুমাঁ উদারদুপাংশুনা সমমৃতত্বমানট্।
ঘৃতস্য নাম গুহ্যং যদস্তি জিহ্বা দেবানামমৃতস্য নাভিঃ॥ (৪, ৫৮, ১)

সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়েছে এক মধুমান তরঙ্গ, সেই ধারা বেয়ে মানুষ লাভ করে অমৃতত্ব। এই হল ঘৃতের গুহ্য নাম, দেবতাদের জিহ্বা, অমৃতের মধুবিন্দু। (৩৮)

কবি এই গুহ্য নাম প্রকট করতে চাইছেন—স্বয়ং নাম ব্রবামা ঘৃতস্য। হৃদ্য সমুদ্র থেকে উঠছে এই ঘৃতের ধারা—এতা অর্ষন্তি হৃদ্যাৎ সমুদ্রাৎ। বৈদিক কবিরা ঘৃতের ধারা, মধুর ধারা, সোমের ধারাকে প্রায়ই কাব্যের বা কাব্যপ্রেরণার প্রতীক রূপে নিয়েছেন। বামদেব চতুর্থ মণ্ডলের ৫৮ সংখ্যক সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে, গূঢ় ভাষায়, রূপকের আবরণে বলেছেন, ঘৃত ব্রহ্মেরই বাঙ্‌ময়ী মূর্তি। চতুঃশৃঙ্গ বৃষভ (৩৯) ক্ষরিত করেছে ঘৃত। সেই ঘৃতকে পণিরা চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিল, দেবতারা আবার তা আবিষ্কার করেছেন, দেবাসো ঘৃতমনুবিন্দন্।

'ঘৃত' একাধারে স্তুতি ও জ্যোতি। (৪০) তার উৎস হৃৎ-সমুদ্রে, সেখান থেকেই ঋষি পান জ্যোতি, কবি পান স্তুতি, মতি, মন্ত্র। হৃদা মতিং জনয়ে চারুম্ (১০, ৯১, ১৪), হৃদয় থেকে সুন্দর মতির জন্ম দিই। 'চারুং মতিং' শুধু মনের বিমূর্ত ভাব চিন্তা আইডিয়া নয় ; এখানে কবি ভাবছেন সেই মতিকে কিভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে তার কথাও। ঋষি বামদেব বলছেন—

সম্যক্ স্রবন্তি সরিতো ন ধেনা অন্তর্হৃদা মনসা পূয়মানাঃ।
এতে অর্ষন্ত্যূর্ময়ো ঘৃতস্য মৃগা ইব ক্ষিপণোরীষমাণাঃ॥ (৪, ৫৮, ৬)

সরিতের মতো 'ধেনাঃ' অন্তর্হৃদয়ে আর মনের মধ্যে পবিত্র হতে হতে একসঙ্গে বয়ে চলেছে। এই ঘৃতের ঊর্মিরা বের হয়ে ছুটে চলেছে যেমন মৃগ ছুটে যায় ব্যাধের কাছ থেকে।

'ধেনাঃ' শব্দটি বহ্বর্থক। এর ব্যুৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে, তবে অনেকেই মনে করেন, একদিকে কথাটির সংযোগ আছে 'ধেনু'র সঙ্গে, অন্যদিকে

'ধী'র সঙ্গে ; শব্দটি জ্যোতির, ধী'র ও স্তুতির ব্যঞ্জনাবাহক। বিশেষ করে পূর্বোদ্ধৃত ঋকে সবগুলি অর্থই প্রযোজ্য। (৪১)

সমুদ্র ও জলধারার উপমা বৈদিক কবিরা বহুভাবে ব্যবহার করেছেন। সমুদ্র থেকে জন্ম হচ্ছে পক্ষবান্ পুচ্ছবান্ অশ্বের, যার পিঠে সর্বপ্রথম আরোহণ করেছেন ইন্দ্র। (৪২) সেই 'মনোজবা' অশ্বের সঙ্গে মধুমান্ ঊর্মির তুলনা স্বতঃই মনে জেগে ওঠে। ঋষি দীর্ঘতমা বলছেন—

তব শরীরং পতয়িষ্ণবন্ তব চিত্তং বাত ইব ধ্রজীমান্ । (১, ১৬৩, ১১)

হে অশ্ব, তোমার শরীর উড্ডীয়মান ; চিত্ত তোমার বায়ুর মতো ধাবমান।

সমুদ্রের সঙ্গে দেখা যায় কাব্যের উৎসের গভীর সম্বন্ধ রয়েছে। বেদের হৃৎ-সমুদ্রই হল কাব্যের উৎস যেখানে নিহিত ঋতের পদ। সমুদ্র স্থিতিশীল, কিন্তু নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হলে ঋতের ধারা, ঘৃতের ধারা সেই সমুদ্র-উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে ধেয়ে চলে অন্যসমুদ্রের দিকে, সমুদ্রের উদ্দেশ্যে। অন্য একটি সূক্তে (৭, ৪৯) স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, জল-ধারাগুলি এক সমুদ্রে জন্ম নিয়ে ছুটে যায় অন্য সমুদ্রের দিকে। সমুদ্র সেই জলধারাদের 'জ্যেষ্ঠ'—তারা তাই 'সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ', তারা উঠেছে সমুদ্রের গর্ভ থেকে, সলিলস্য মধ্যাৎ। তারপরই আবার বলা হয়েছে, তাদের লক্ষ্যও হল সমুদ্র, 'সমুদ্রার্থাঃ' তারা।

বর্তমান প্রসঙ্গে সরস্বতী বিশেষ অর্থবহ। সরস্বতী প্রেরণাদাত্রী ; সরস্বতী শুধুই একটি ভৌগলিক নদী নয়—তিনি হচ্ছেন কাব্যপ্রেরণার প্রবাহ। সাতটি নদীর কথা বলা হয়েছে ; তারা সাত বোন। (৪৩) তাদের মধ্যে সবার প্রিয় হলেন সরস্বতী—নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু (৬, ৬১, ১০)।

মধুচ্ছন্দা বলছেন—

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং যজ্ঞং দধে সরস্বতী।

মহো অর্ণঃ প্র চেতয়তি কেতুনা বিশ্বা বি রাজতি। (১, ৩১১,-১২)

সরস্বতী সত্য বাক প্রেরিত করেন ; উদ্বোধিত করেন সুমতি, ধারণ করেন যজ্ঞ। প্রজ্ঞার আলোকে সরস্বতী মহান্ সমুদ্রকে জাগান চেতনায় ; উদ্ভাসিত করেন সবাকার ধীশক্তি।

এখানে দেখা যাচ্ছে সরস্বতী দিব্য প্রেরণার বাহিকা ; তাঁরই দ্বারা প্রচোদিত হয়ে বাক্ মূর্ত হয় কাব্যে।

বাক্ কি ? ঋষিদৃষ্টিতে বাক্ প্রতিভাত হয়েছে ব্রহ্মরূপে—কিংবা আরো বিশ্লেষিত করে বললে বলতে হয় ব্রহ্মশক্তিরূপে। তাই বেদোত্তর যুগে বাক্ বা সরস্বতীকে ব্রহ্মার শক্তি বলে কল্পনা করা হয়েছে।

বেদে বহু স্থানেই বাক্ দৈবী বলে আখ্যাত—দৈবং বচঃ (১, ৩৭, ৪), বচসা দৈবেন (৪, ১, ১৫)। এবং সবার আগে তাঁকেই সৃষ্টি করেছেন দেবতারা, দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাঃ (৮, ১০০, ১১) ; সূক্তবাকং প্রথমং...অজনয়ন্ত দেবাঃ (১০, ৮৮, ৮)। বাক্ দেবতাদের মধ্যে দেবতা, বিচরণ করেন রুদ্রদের সঙ্গে, বসুদের সঙ্গে (১০, ১২৫, ১)।

ঋষিরা বাকের বন্দনা করেছেন নানা ভাবে এবং তাঁকে দেখেছেন নানা রূপে। বাক্ দেবতাদেরও সম্রাজ্ঞী—আনন্দময়ী ছন্দোময়ী—রাষ্ট্রী দেবানাং...যজ্ঞা (৮, ১০০, ১০) ; অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী (১০, ১২৫, ৩)—সম্রাজ্ঞী বাক্ হচ্ছেন সৃষ্টিকর 'অক্ষর', অদিতি, জ্যোতির্ময়ী গাভী যাকে পণিরা বন্দী করে রেখেছিল অন্ধকারের গুহায়। বলা হয় বৃহস্পতি সেই লুক্কায়িত বন্দী গাভীদের আবিষ্কার করেছেন। বৃহস্পতির্যা অবশন্নি-গূর্তা: (১০, ১০৮, ১১)।

আরো বলা হয়েছে বৃহস্পতি: পর্বতেভ্যো বিতূর্যা নির্গা উপে যবমিব (১০, ৬৮, ৩), বৃহস্পতি পর্বত থেকে গাভীদের বের করে যবশস্যের মতো ছড়িয়ে দিলেন। বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি আবিষ্কার করেছেন সেই ধেনু যা বাকের প্রতীক। আগেই বলেছি বাক্ এবং ধেনুকে সমার্থক হিসেবে প্রায়ই বৈদিক ঋষিরা প্রয়োগ করেছেন। সা নো মন্দ্রেষমূর্জং দুহানা ধেনুর্বাক (৮, ১০০, ১১), সেই মন্ত্র বাক্ হল ধেনু যে ক্ষরণ করছে সমৃদ্ধি ও শক্তি।

তিনিই কবি যিনি জানেন এই 'গো'র পদ। সেই পদ বা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মহোলোক মহো অর্ণ:—যেখানে জন্ম নেয় 'অক্ষর'। যি অক্তে অক্ষরং পদে গো: (৩, ৫৫, ১)। আর তাই ঋষিরা হলেন 'পদজ্ঞ'। এবং বৃহস্পতি যেমন গাভীদের মুক্ত করেছেন, উদ্‌ঘাটিত করেছেন তাদের গূঢ় নাম, তেমনি মানুষেরাও দিব্য বাক্ দিয়ে খুলে দেয় গাভীদের গুহা—

দুলহং নর: বচসা দৈব্যেন ব্রজং গোমন্তমুশিজো বি বব্রু:। (৪, ১, ১৫) ঋষি দীর্ঘতমার সূর্যমন্ত্রে (৪৪) বাক্ আর ব্রহ্মের নিবিড় সম্বন্ধের কথা আছে। সূক্তটি কঠিন সন্দেহ নেই ; কিন্তু আমরা যে-সব রূপক ও প্রতীকের কথা পূর্বে বলেছি তাদের সাহায্যে বর্তমানে বিচার্য বিষয়ে আমরা বেশ কিছু তত্ত্ব ও তথ্য পেতে পারি।

ঋষি বলছেন 'একং সৎ' এবং তার প্রকাশের কথা ; অর্থাৎ পিতা ও মাতার কথা ; পুরুষ ও প্রকৃতির কথা। কাব্যের আদিক থেকে দেখলে এই যুগল হল শব্দব্রহ্ম ও বাক্। ঋষিকবি নিজেও স্পষ্ট করেই ব্রহ্ম আর বাক্‌এর কথা বলেছেন। ব্রহ্মায়ং বাচ পরমং ব্যোম (১, ১৬৪, ৩৫), অর্থাৎ ব্রহ্ম হল বাকের পরম স্থিতি। ব্রহ্ম স্থিতি, বাক্ গতি। সেই বাক্ ধেনুরূপে আবির্ভূতা হন কবির সামনে, কবি তাঁর পুত্র, কবির্য পুত্র: (ঐ ঋক ১৬)। আর সেই 'সুহস্ত' দোগ্ধা গাভীকে দোহন করেন। সে-দুগ্ধ কি? দুগ্ধ হচ্ছে সবিতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠং সবং (ঐ, ঋক্ ২৬)। সবিতার সৃষ্টি যে মন্ত্রোজ্জ্বল কাব্য তাতে কোন সন্দেহ থাকে না যখন পড়ি—

আ বিশ্বদেবং সৎপতিং সূক্তৈরদ্যা বৃণীমহে সত্যসবং সবিতারম্।

য ইমে উভে অহনী পুর এত্যপ্রযুচ্ছন্ স্বাধীর্দেব সবিতা।

য ইমা বিশ্বা জাতান্যাপ্রাবরতি শ্লোকেন প্র চ সুবাতি সবিতা॥ (৫, ৮২, ৭-৯)

আমরা বিশ্বদেব সৎপতি সত্যপ্রসূ সবিতাকে সূক্ত দিয়ে এখন বরণ করছি—সুধীবান্ দেব

সবিতা যিনি নিরাপদে চলেন রাত্রিদিনের আগে আগে ; সবিতা যিনি শ্লোকের দ্বারা সমস্ত জাতবিশ্বের কথা বলেন এবং তাকে প্রচোদিত করেন।

বাক্‌কে আবার বলা হয়েছে 'গৌরী', গৌরবর্ণা, গাভী। তিনি পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরা। (৪৫) যার সেই পরম ব্যোমে উর্ধ্বতন দেবতাদের অধিষ্ঠান। সেখান থেকে বাক্ নেমে আসে সহস্রধারায়।

দীর্ঘতমা বাক্ আর ব্রহ্মের মধ্যে যদিও ভেদ সৃষ্টি করেছেন তবু তিনি বলছেন এই বিচ্ছেদ শুধু বাকের প্রকাশের জন্য। সুপর্ণ গরুত্মান্ এক কিন্তু তিনি দুই হয়ে একই শাখা আশ্রয় করে আছেন। অন্য এক ঋষি বলছেন,

সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি। (১০, ১১৪, ৫)

এবং সৎ যে সুপর্ণ তা ব্রহ্ম। সে কথা দীর্ঘতমাও সাঙ্কেতিক ভাষায় নয়, সূর্যোজ্জ্বল ভাষায় বলেছেন, একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি (১, ১৬৪, ৪৬)।

আমরা বলেছি বাক্ ব্রহ্মের ছন্দোময় প্রকাশ। কিন্তু তার আছে নানা স্তর, নানা পদ। দীর্ঘতমা বলছেন বাক্ চারটি পদে বিভক্ত। মন্ত্রকাব্যের কথা আলোচনা করতে গেলে এই বিভেদটির কথা বিচার করা উচিত।

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।

গুহা ত্রীণি নিহিতানেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥ (ঐ ঋক্, ৪৫)

বাক্ চারটি পদে বিভক্ত। যাঁরা মনীষী, যাঁরা ব্রহ্মবিদ্ তাঁরা জানেন এদের। তিনটি গুহার মধ্যে নিহিত, তাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। চতুর্থ বাক্ বলে মানুষেরা। (৪৬)

তন্ত্রে এই চারটি পদের নাম দেওয়া হয়েছে—পরা পশ্যন্তী মধ্যমা আর বৈখরী। পরা বাক্ অপ্রকাশিত, তা ব্রহ্মের সমান, ব্রহ্মবাক্। তা ভাষায় মূর্ত হয় না। তন্ত্রমতে তার স্থিতি মূলাধারে। ভাষার জগতে যা সূক্ষ্মতম তা হল পশ্যন্তী ; তা-ই মন্ত্রের ভাষা। ঋষিকবি যখন বস্তুর, বিশ্বের ও নিজের পরম সত্যে পৌঁছোন তখন সেই সত্যালোক থেকে, সদনাৎ ঋতস্য, পরাবাক্ জাগ্রত হয়ে, স্পন্দিত হয়ে পশ্যন্তী রূপে মূর্ত হয়। সেই বাক্ যেমন কবির মনশ্চক্ষে প্রকট করে সত্যকে, তেমনি সহৃদয় শ্রোতার অন্তরেও নিয়ে আসে সত্যের দর্শন। বস্তুর এবং ভাবের আধ্যাত্মিক জীবন্ত সত্য তখন আর সুদূরের কিছু থাকে না, হয়ে যায় একান্ত বাস্তব—বহিরিন্দ্রিয়ের ভিত্তর দিয়ে অন্তরে সাড়া জাগায়, অন্তশ্চক্ষে প্রতিভাত করে দিব্য প্রজ্ঞান। পশ্যন্তী বাকের অধিষ্ঠান হৃদয়ে। তার পরের স্তর মধ্যমা তা হচ্ছে বুদ্ধির ভাষা। এবং চতুর্থ স্থূলতম ভাষার নাম দেওয়া হয়েছে বৈখরী। সেটা মানুষী ভাষা। আমাদের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ কামনাবাসনা চিন্তাভাবনার ভাষা, এ-ভাষাই 'মনুষ্যা বদন্তি'। দীর্ঘতমা বলছেন অন্য পদগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সাক্ষাতের বাধা কিছু অলঙ্ঘনীয় নয়। শুদ্ধবুদ্ধির সহায়ে মধ্যমা বাকের অধিকারী হওয়া সম্ভব। এবং দৃষ্টি ও শ্রুতির দ্বারা কবি লাভ করেন পশ্যন্তী বাক্। (৪৭)

বলেছি পরা বাকের প্রকাশ নেই। তাই হয়তো 'বৃহদ্দেবতা'য় (১, ৭৪) বাকের

তিন রূপের কথা বলা হয়েছে : স্থূলতম হচ্ছে ইহলোকের বাক্, তার উপরে ইন্দ্রলোকের বাক্ আর সর্বোত্তম বাক্ স্বর্গীয়। ইন্দ্র হলেন মনোবুদ্ধির দেবতা, তাই এখানে তন্ত্রের কি-ভাগেরই প্রতিফলন পাওয়া যায়।

কবি শ্রুতি ও দৃষ্টির দ্বারা লাভ করেন বাক্-এর প্রসাদ। অন্য ভাবে বলা যায়, দেবী সরস্বতীর প্রেরণা কবির দৈনন্দিন ভাষাকে রূপান্তরিত করে মন্ত্রে, ঋকে। প্রশ্ন জাগে— বৈদিক কাব্যে কবির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা কতটুকু? কবি কি শুধুই প্রেরণার অক্রিয় ধারক, না তিনি সক্রিয়ভাবে কবিকর্মে অংশ নেন। কবিকে 'সুহস্ত' বলা হয়েছে। তাতেই দেখা যাচ্ছে বৈদিক কবিরা অক্রিয় ছিলেন না। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তেই কবির সক্রিয়তার কথা বলা হয়েছে। আমরা সেই সব সূক্তগুলি থেকে বিচার করতে চেষ্টা করবো প্রেরণা প্রচেষ্টার সম্বন্ধ।

প্রেরণার কথা বৈদিক কবিরা বহুবার বলেছেন। প্রেরণা লাভ করাকে বলা হয়েছে দেবতাদের সঙ্গে ঋত বা সত্য নিয়ে কথাবার্তা বলা—সাকং দেবেভিরবদন্নৃতানি (১, ১৭৯, ২)। ঋষিরা ছিলেন 'দেবানাং সখ্যাদঃ' দেবতাদের সঙ্গী অর্থাৎ তাঁরা একসঙ্গে ভোজন করেছেন ; এবং গূঢ় জ্যোতিকে জেনে তাঁরা মন্ত্রের সহায়ে সৃজন করেছেন উষাকে, অর্থাৎ সেই জ্যোতিকে নামিয়ে এনেছেন মর্ত্যে—

ত ইদ্দেবানাং সখ্যাদ আসন্নৃতজ্ঞাসঃ কবয়ঃ পূর্ব্যাসঃ।

গূল্হং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ববিন্দন্ সত্যমন্ত্রা অজনয়ন্নুষাসম্ ॥ (৭, ৭৬, ৪) পূর্বতন সত্যবান্ কবিরা সত্যই ছিলেন দেবতাদের সখা ; সেই পূর্বপিতারা গূঢ় জ্যোতিকে আবিষ্কার করেছিলেন, এবং সত্যমন্ত্রের অধিকারী তারা সৃজন করেন উষাদের।

পরের যুগে কবিরা কিন্তু কখনো কখনো বলেছেন, আমরা দুর্বল মানুষ, আমরা জানি না, অবিদ্বাংসঃ (৬, ১৫, ১০) ; আমি জানি না মন্ত্রবয়নের জন্য তাঁতের টানা-পোড়েনের কথা (৪৮), নাহং তন্তং ন বি জানাম্যোতুং (৬, ৯, ২)। এই দুর্বল মানুষের কাছে তাই জ্ঞান আর মন্ত্র আসে দেবতাদের নিকট থেকে। অগ্নি তাই 'মেধাকার' (১০, ৯১, ৮), তিনি দেন কাব্য, মনীষা, আনন্দসম্পদ্ (৪, ১১, ৩) ; ইন্দ্র হলেন 'কবিবৃধ' (৮, ৫২, ৪) ; বৃহস্পতি 'জনিতা ব্রহ্মণাং' (২, ২৩, ২) ; সোমও জন্ম দেন বাণীর, 'জনয়ন্ গিরঃ সোমঃ' (৯, ২৪, ৫) ; ইন্দ্র-বরুণ ঋষিদের দেন মনীষা, বাক্ মতি, শ্রুতি (৮, ৫৯, ৬)। দেবতারা মনকে বাণীশক্তিকে আলোকিত করেন, প্রচোদিত করেন, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ (৩, ৬২, ১৫)। দেবতাদের দানের কথা আরো স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন বাগ্দেবী— বাক্ই তো কাব্যের প্রেরণাদাত্রী—

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।

যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ (১, ১২৫, ৫) দেবতা আর মানুষের দ্বারা অর্চিত আমি স্বয়ং এই কথা বলছি—আমি যাকে চাই তাকেই শক্তিমান্ তাকেই ব্রহ্মজ্ঞ, তাকেই ঋষি, তাকেই সুপ্রজ্ঞ করে তুলি।

প্রেরণা আসে দেবতাদের নিকট থেকে, কিন্তু দেবতাদের মধ্যেও বাক্‌ই প্রেরণাশক্তি রূপে বিরাজিতা। সেই প্রেরণা যখন মানুষের অন্তরে নেমে আসে তখন তার সমস্ত সত্তা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে দৈবী আবেশে। কী প্রভু সহজ ওজস্বী ভাষায় কবি সেই আবেশের কথা বলেছেন।

বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষুর্বীদং জ্যোতি হৃদয় আহিতং যৎ।
বি মে মনশ্চরতি দূরআধীঃ কিং স্বিদ্‌ক্যামি কিমু নু মনিষেৎ॥ (৬, ৯, ৬)

পাখা মেলে দেয় আমার কান, পাখা মেলে আমার চোখ, পাখা মেলে সেই জ্যোতি আমার হৃদয়ে যার অবস্থান। বিচরণ করে আমার মন দূরে যেখানে তার চিন্তার লক্ষ্যস্থল। কিছু যেন বলতে চাই, কিছু যেন আমি মনের মধ্যে ধরতে চাই।

প্রেরণা যখন নেমে আসে, প্রাণ মন তখন প্রকাশের জন্য আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। সে এক বিপুল আনন্দের ভাব। যে কবি সোমসুধা পান করেছেন তাঁর কাছে প্রেরণা নেমে আসে অতি আদরে, গহন মমতায়, গাভী যেমন আসে বৎসের কাছে। (৪৯) তারপর সুরু হয় প্রকাশের প্রচেষ্টা। প্রেরণার জ্যোতির্দৃষ্টে পুষ্ট হয়ে তারই শক্তিতে কবি সক্ষম হন তাঁর সৃষ্টিকার্যে।

উপ মা মতিরস্থিত বাশ্রা পুত্রমিব প্রিয়ং।
কুবিং সোমস্যাপামিতি॥
অহং তষ্টৈব বন্ধুরং পর্যচামি হৃদা মতিং।
কুবিং সোমস্যাপামিতি॥ (১০, ১১৯, ৪-৫)

দিব্য মতি আসে আমার কাছে যেমন করে গাভী আসে প্রিয় বাছুরের কাছে। আমি কি পান করেছি সোমরস। তষ্টা (রথকার) যেমন সারথীর আসন তৈরি করে তেমনি আমি হৃদয় দিয়ে সুষ্ঠুভাবে রূপ দিই মতিকে। আমি কি পান করেছি সোমরস।

উপরের উদ্ধৃতিতে দেখতে পাচ্ছি কবিকর্মের দুটি স্তর। প্রথমতঃ প্রেরণা নেমে আসে কবির অন্তরে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়—তারপর কবি সেই প্রেরণাকে রূপ দেন ভাষায়। এই রূপায়ণকে তুলনা করা হয়েছে ছুতোরের কাজের সঙ্গে। তাতেই দেখা যাচ্ছে যে প্রেরণার প্রসূতির জন্য চাই প্রচেষ্টা, উদ্যম। অগ্নি ইন্দ্র বায়ু বাক্‌ সোমের সঙ্গে তাই বন্দিত হয়েছেন তষ্টা প্রভু বিশ্বকর্মা। তাই কবি তাঁতির মতো মননের ও কথার তন্তু বিছিয়ে দেন হৃদয় থেকে স্বর্গ পর্যন্ত—

নব্যং নব্যং তন্তমা তন্বতে দিবি সমুদ্রে অন্তঃ কবয় সুদীতয়ঃ। (১, ১৫৯, ৪)

প্রজ্ঞাদীপ্ত কবিরা স্বর্গ আর হৃৎসমুদ্রের মধ্যে নতুন নতুন সুতো দিয়ে তাঁতের টানা দেন।

প্রেরণার আর প্রচেষ্টার উভয়েরই প্রয়োজন আছে সুষ্ঠুভাবে পরম সত্যকে ভাষায় প্রকাশ করবার জন্য। বেদের উপমা ব্যবহার করে শ্রীঅরবিন্দ এই কথাটি সুন্দর করে বলেছেন, "মন্ত্র হৃদয়ের পথে জন্ম নেয়; চিন্তাগত মন তাকে পিণ্ডীভূত বা রূপায়িত ক'রে তৈরি করে ঈশ্বররূপী ব্রহ্মের রথ : দৃশ্যমান এই সত্য ব্রহ্মেরই একটি মুখ বা অবয়ব।" (৫০)

রথের উপমা বৈদিক কবিরা বহুবার প্রয়োগ করেছেন। ঋষিকন্যা ঘোষা বলছেন,

এতং বাং স্তোমমশ্বিনাবকর্মাতক্ষাম ভৃগবো ন রথম্। (১০, ৩৯, ১৪)

হে অশ্বীদ্বয়, আমরা তোমাদের জন্য তৈরি করেছি এই স্তোম শিল্পকাররা যেমন তৈরি করে রথ। (৫১)

কখনো কখনো রথকার আর কবি এক হয়ে যান ; উপমান আর উপমিতের মধ্যে প্রভেদ থাকে না। তাই অনেক সময় ঋষিকবিরা রথ, নৌকা, বস্ত্র প্রভৃতি কথাগুলিকে স্তোমের সূক্তের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

ইমাং তে বাচং বসূয়ন্ত আয়বো রথং ন ধীরঃ স্বপা অতক্ষিষুঃ। (১, ১৩০, ৬)

ঋদ্ধিকামী আয়ুগণ এই গীতি তৈরী করেছেন সুকর্মা ধীমান্ কবি যেমন রথ তৈরি করেন।

ঋষিরা বলছেন, স্তোম হওয়া চাই সুগঠিত, সুতষ্টং মন্ত্রং (২ ৩৫, ২)। নানা কর্মের উপমা থেকে বোঝা যায় যে কাব্যসৃষ্টিতে প্রেরণার সঙ্গে প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন ঋষিকবিরা।

মন্ত্রা কৃণুধ্বং ধিয়ঃ যা তনুধ্বং নাবমরিত্রপরণীং কৃণুধ্বম্ (১০, ১০১, ২)

ধীমতী গীতিকে করো মনোরম ; বিস্তারিত করো (তাঁতের টানার মতো) ; বৈঠা মেরে পার হবার জন্য তৈরি করো নৌকা।

এখানে তৈরির কথা বলা হচ্ছে বটে কিন্তু সে-তৈরি শুধু মানুষের নিজমনের দ্বারা হয় না। তৈরির প্রেরণা ও নির্দেশও আসে অন্তর থেকে। তাই কবি বলছেন, এই মন্ত্র হৃদয়ের দ্বারা তষ্ট, হৃদা তষ্টঃ (১, ১৭২, ২), হৃদা তষ্টং (৪, ১৬, ৪৭)। আরো, ইমং স্তৈমং হৃদা যা সুতষ্টং মন্ত্রং মোচেম (২, ৩৫, ২), আমরা যেন হৃদয় থেকে এই সুনির্মিত মন্ত্র।

কবিকর্মের কথা বেদে ঋভুদের কাহিনীর মাধ্যমে সুন্দর করে বলা হয়েছে। ঋভুরা দক্ষ শিল্পকার, তাঁরা সুসহায়ক, সুকর্মা, দক্ষহস্ত—সবসঃ সপসঃ সুহস্তাঃ (৪ ৩৩, ৮)। সমস্ত শিল্পের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা তাঁরা এবং বাক্-শিল্পের সঙ্গেও যে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। উপরে দেখেছি কবিকর্মকে তক্ষণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে অনেক বার। ঋভুরাও তক্ষক। তাঁরা নির্মাণ করেছেন ইন্দ্রের দুই ঘোড়া যাদের একসঙ্গে জোতা হয়েছে বাক্ দিয়ে।

যা ইন্দ্রায় বচোযুজা ততক্ষুর্মনসা হরী। (১, ২০, ২)

ঋভুদের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ বাক্-শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যাকে ঋভুরা পোষণ করেন সে হয় ধীর শক্তিমান্ আর সে বাক্‌প্রতিভায় হয় ঋষি, 'স ঋষির্ভবচ্ছায়া' (৪, ৩৬, ৬)। তাঁরা অমৃতত্বের শিল্পকার। কবিও অমৃতের সাধক ; বৈদিক যুগে মিষ্টিক আর কবিকে পৃথক করে দেখা হয়নি। অমৃতের সাধনায় মন্ত্রকাব্যের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মন্ত্র মানুষের উদ্ভাসনতম জ্যোতির্ময় মনের প্রকাশ ; মন্ত্র অধঃ আর ঊর্ধ্বকে গেঁথেছে এক ছন্দে। এবং সাধক সেই ছন্দোময় মন্ত্রের পথে—যা হল সত্যের পথ, ঋতের

পথ—পৌঁছতে পারেন সত্যের সদনে। ঋভুদের বহু কর্মের মধ্যে তাই, শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, ইন্দ্রের অমৃতত্বের সৃষ্টি মুখ্য। (৫২)

আমরা তাই দেখছি অগ্নি সরস্বতী সবিতা ইন্দ্রের সঙ্গে কবিকর্মে ঋভুদের দানও নিতান্ত নগণ্য নয়। সৃষ্টিতে কোন খুঁত থাকলে তা হতে পারে না অমৃতত্বের বাহন। প্রেরণা আসে জ্যোতির্ময় ধারায় কিন্তু মনের এবং অচেতনার অন্ধকার বাধাগুলি দূর করে মনের ছাঁচকে যদি না প্রকাশের জন্য নিখুঁত করে তোলা যায় তবে মন্ত্রশক্তি ব্যাহত হয়। 'তক্ষণ' কথাটি কবিকর্মের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা। তক্ষণ হচ্ছে ছেঁদা করা, চাঁচা। আমাদের অর্ধচেতন মনের অন্ধকার ও মালিন্য অনেক সময় প্রেরণার সহজাত ঔজ্জ্বল্যকে খর্ব করে—প্রেরণার গায়ে বুঝি লাগে অন্ধকারের অজ্ঞানের প্রলেপ। কবিকে তাই হতে হয় 'সুদক্ষ', স্বপা, সুহস্ত। তিনি তাঁর পূতদক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পান সেই অন্ধকারের প্রলেপ, এবং তা দূর করে, চেঁচে ফেলে, প্রকট করেন প্রেরণার শুদ্ধতম মন্ত্ররূপ।

আমরা দেখেছি কাব্যের দুটি প্রধান অঙ্গ—দৃষ্টি আর সৃষ্টি। অর্থাৎ সত্যের দর্শন হল ঋষিকর্ম ; আর সেই সত্যকে বাক্যে ছন্দে মূর্ত করা কবিকর্ম। কিন্তু তার পরও একটা জিজ্ঞাসা বাকি থাকে। এই যে বিরাট আয়োজন তার লক্ষ্য কি ?

কাব্য হচ্ছে দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হবার উপায়। কাব্যকে রথের বা নৌকার সঙ্গে বারবার তুলনা করা হয়েছে ; তা থেকে বোঝা যায় মন্ত্রকে ঋষিকবিরা বাহন মনে করতেন, মন্ত্র মানব আত্মাকে বাহন, মন্ত্রের দ্বারা কবি যুক্ত হন দিব্যচেতনার সঙ্গে। আমার মন্ত্র, বলছেন এক ঋষি, ইন্দ্রকে আলিঙ্গন করুক, স্ত্রী যেমন আলিঙ্গন করে পতিকে, পরি ষ্বজন্তে জনয়ো যথা পতিং (১০, ৪৩, ১)। (৫৩) আরেক জন বলছেন,

প্রতি মে স্তোমমদিতির্জগৃভ্যাৎ সূনুং ন মাতা হৃদ্যং সুশেবং। (৫, ৪২, ২)

অদিতি আমার এ স্তোম গ্রহণ করুন যেমন করে মাতা গ্রহণ করে প্রাণপ্রতিম সুখকর সন্তানকে। অথবা—

পিতুর্ন পুত্র: সিচমা রভে ত ইন্দ্র স্বাদিষ্টয়া গিরা শচীবঃ। (৩, ৫৩, ২)

হে শক্তিমান্ ইন্দ্র, পুত্র যেমন পিতার বস্ত্রপ্রান্ত ধরে রাখে তেমনি আমি অতি মাধুর্যময় কথা দিয়ে তোমাকে ধরে রাখি।

ঋষিকবিরা কাব্যের সঙ্গে দেবতার মিলনের কথা বলেছেন। এই মিলনের দ্বারা কবি উত্তীর্ণ হন সত্যের ধামে। অন্ধকারের উপরে যে মানস জ্যোতি তা-ও পার হয়ে কবি চলে যান উর্দ্ধতম সূর্যলোকে, পান সেই সত্য যা 'জ্যোতিরুত্তমম্' (১, ৫০, ১০)। মন্ত্র-কাব্য তাই সত্যের বাহন, সত্যের রথ, সত্যের তরী যা সুকৃত মানুষকে নিয়ে যায় তমসার পরপারে।

সত্যস্য নাবঃ সুকৃতমপীপরন্ (৯, ৭৩, ১)

সত্যের সঙ্গে বৈদিক ঋষিরা দেখছেন আনন্দের এক নিবিড় সম্বন্ধ। তাঁরা আনন্দের নানা নাম দিয়েছেন—আনন্দ হল গাভীরূপা অদিতির দুগ্ধ, মধু, সোমরস, অমৃতত্ব।

আনন্দকে বলা হয়েছে রত্ন, রয়ঃ, বসু, বার। কবি স্তোত্র রচনা করছেন 'বামস্য ভক্ষয়ে' (৮, ২৭, ১১), প্রেয়কে ভোগ করবার জন্য। কবির উর্ধ্বায়ন সত্যের পথে যাত্রা আনন্দের দিকে। বিশ্বামিত্র ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করছেন—

কবিম্ন ঋষিং পপিবাংসং সুতস্য কবিম্নে বয়ো অমৃতস্য শিক্ষাঃ। (৩, ৪৩, ৫)
আমাকে ঋষি করো, করো সোমপায়ী ; দাও আমাকে অমৃত সম্পদ সব।

অমৃতধন, বয়ো অমৃতস্য, তা-ই হল লক্ষ্য। অমৃতত্বের মধ্যেই শাশ্বত আনন্দ ; সে আনন্দ আসে মর্ত্যের সঙ্গে স্বর্গের মিলনে, যে-মিলনের দূত হলেন দেহের পুত্র জাতবেদা কবিক্রতু অগ্নি। "বৈদিক ঋষির কাছে সত্য হল পন্থা উপকক্ষ, দিব্য অস্তিত্বের আনন্দ হল লক্ষ্য, কিংবা বলা যায় সত্য হল ভিত্তি, আনন্দ তার চরম সার্থকতা।" (৫৪)

আনন্দকে ঋষিরা সোমদেবতার রূপে কল্পনা করে তাঁর স্তুতি করেছেন। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল ছাড়াও সোমের বন্দনা পাওয়া যায় কিছু কিছু অন্য মণ্ডলগুলিতেও। সোমরস আনন্দের আর অমৃতত্বের প্রতীক—আনন্দের সেই সুরা পান করেন দেবতারা এবং মানুষও সেই সুরা পান করে হয় আনন্দের আর অমৃতের অধিকারী। সোমরস আসে পৃথিবী থেকে কিন্তু তাকে পবিত্র করে করা হয় স্বর্গীয় আনন্দের সুরা, দেবসুধা। কাব্যের শক্তিতে সোমের বৃদ্ধি হয় এবং সোম তখন প্রবেশ করেন, কবির সর্ব-সত্তায়।

সোম গীর্ভিষ্ট্বা বয়ং বর্ধয়ামো বচোবিদঃ।
সুমৃলীকো ন আ বিশ। (১, ৯১, ১১)
আমরা যারা বাক্‌কে জানি, হে সোম, গান দিয়ে তোমাকে পুষ্ট করি ; করুণা করে প্রবেশ করো আমাদের মধ্যে।

সোমকে এক জায়গায় বলা হচ্ছে স্বর্ণপক্ষ বিহঙ্গ। সে উড়ে গিয়েছিল অন্তরিক্ষে ; কিন্তু কবিরা তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন পৃথিবীতে, শিশুরূপে। তার মানুষের 'মতি', কবিতা তাকে স্পর্শ করতে লাগল। তারপর গন্ধর্বরূপে সোম অধিষ্ঠিত হলেন স্বর্গে, দেখতে লাগলেন জগতের সব রূপ, তাঁর রশ্মি শুভ্র আলোয় ঝলকিত হল, আর সেই শুচি সোম স্বর্গমর্ত্যকে উদ্ভাসিত করলেন।

উর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্থাদ্বিশ্বা রূপা প্রতিচক্ষাণো অস্য।
ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা ব্যদ্যৌৎ প্রাক্রক্ষচন্দ্রোদসী মাতরা শুচিঃ॥ (৯, ৮৫, ১২)
তাই দেখা যাচ্ছে বৈদিক কবিদের লক্ষ্য ছিল কাব্যতরণী বেয়ে কাব্যরথে চড়ে, তমসার পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু তাঁরা এ-ও চেয়েছিলেন যে সে পরপারের জ্যোতি মর্ত্যের অন্ধকার দূর ক'রে আলোকিত করুক একই সঙ্গে স্বর্গ ও পৃথিবী।

নির্দেশিকা

(১) "The Veda was to these early seers the Word discovering the Truth and clothing in image and symbol the mystic significances of life. It was a divine discovery and unveiling of the potencies of the word, of its mysterious revealing and creative capacity, not the word of the logical and reasoning or the aesthetic intelligence, but the intuitive and inspired rhythmic utterance, the *mantra*." —The Foundations of Indian Culture. পৃ-২৬০। শ্রীঅরবিন্দের লেখা থেকে সমস্ত উদ্ধৃতি ১৯৭২ সালে পণ্ডিচেরীতে প্রকাশিত সমগ্র রচনাবলী থেকে নেওয়া হল।

(২) শিল্প কথা। কলিকাতা ১৩৫৪। পৃ১২৫।

(৩) বেদের সব উদ্ধৃতি ঋগ্বেদ থেকে, মণ্ডল, সূক্ত এবং ঋক্-সংখ্যা দেওয়া হল।

(৪) ভবভূতি উত্তররামচরিতের শেষ শ্লোকে বলছেন নিজের সম্বন্ধে

শব্দব্রহ্মবিদঃ কবেঃ পরিণতপ্রজ্ঞস্য বাণীমাম্। এই বাণী সেই কবির যিনি জেনেছেন শব্দব্রহ্মকে এবং যাঁর প্রজ্ঞা পরিণত। মনে হয় এটাও অহঙ্কারের কথা। আর নয়তো 'শব্দব্রহ্ম' নয় বেদের 'তদ্ একং', নয় পরা বাক্, পরন্তু তা শব্দের নিরুক্তর প্রকাশ, আর প্রজ্ঞাও নয় বেদের অতিমানস বিজ্ঞান, তার অর্থ এখানে মানসিক এবং রূপান্তরিত জ্ঞান।

(৫) অনুবাদ শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, বেদমন্দির, পণ্ডিচেরী ১৯৬৬। পৃ-১৫৭।

(৬) "In India philosophy grew out of the seeking of the mystics and retained and developed their spiritual aims and kept something of their methods in later spiritual discipline and Yoga." —Hymns to the Mystic Fire. পৃ-৭

(৭) 'বিশ্বানি বিদ্বান্ বায়ুনানি'-র অর্থ করে বলছেন শ্রীঅরবিন্দ—"It (Agni's power) knows all manifestations or phenomena or it possesses all forms and activities of the divine wisdom."— The Secret of the Veda. পৃ-৬১

(৮) দ্রষ্টব্য ১, ৩১, ২ ; ১, ১, ৬ ; ৬, ১৬, ১১, ব্যুৎপত্তিগতভাবেও অগ্নি আর অঙ্গিরার মিল আছে।

(৯) ন্=ল (বৈদিক তাড়িত মূর্ধণ্য ল)।

(১০) দ্র : শ্রীঅরবিন্দ, The Secret of the Veda, পৃ-৪১ ও ১৪৭।

(১১) তুলনীয় গুহ্যং নাম গোণাম্ (৯, ৮৭, ৩)

(১২) গম্ ধাতুর অর্থ গমন করা ; গতের মধ্যে তাই গতিশীল রূপটি প্রকট।

(১৩) যেখানে গত্যের দ্বিতিশীল আর গতিশীল রূপের কথা বলা হবে সেখানে 'সত্য' বললে বুঝতে হবে প্রথম রূপটি, 'ঋত' দ্বিতীয়টি।

(১৪) এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের উক্তি—"Mitra is the harmoniser, Mitra

the builder, Mitra the constituent light, Mitra the god who effects the right unity of which Varuna is the substance and the infinitely self-enlarging periphery."—The Secret of the Veda, পৃ-৪৫৬।

(১৫) অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে শুধু মনে হয় যে সে পদ গভীর।

(১৬) শ্রীঅরবিন্দ বলছেন. "We have therefore three possible senses for *dakṣa* in the Veda, strength generally, mental power or especially the power of judgment, discernment."—The Secret of the Veda, পৃ-৬৮

(১৭) "In the Vedic writings Saraswati is spoken of as the secret self of Indra, ...Indra the illumined mind and Saraswati the inspiration that proceeds from the hidden plane of the Supramental Truth." শ্রীঅরবিন্দ—The Secret of the Veda. পৃ-৯৬।

(১৮) জ্যোতি আর গীতি যে ঋষিদের মনে কি ভাবে অঙ্গাঙ্গী হয়ে ছিল তা দেখা যায় 'অর্ক' কথাটি থেকে। এর অর্থ একই সঙ্গে জ্যোতি ও স্তোত্র—ঋক্ এবং অর্ক একই।

(১৯) অশ্বকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—বীর্যের, আত্মিক বলের, তপঃশক্তির প্রতীক। দ্র: The Secret of the Veda. পৃ. ১২-১৩।

(২০) স্মরণীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম মন্ত্র—উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ সূর্যশ্চক্ষুঃ ...

(২১) নর্যশৎ—অতিশয়ার্থে কবি নৃ-ধাতুকে করেছেন যঙন্ত।

(২২) "the thought or the word expressing the thought"—শ্রীঅরবিন্দ, The Secret of the Veda, পৃ-১২।

(২৩) ঐ, পৃ-৩৫।

(২৪) ঐ, পৃ-১৫।

(২৫) শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন—"the Word is a power, the Word creates. For all creation is expression, everything exists already in the secret abode of The Infinite, *guhā hitam*, and has only to be brought out here in apparent form by the active consciousness." The Secret of the Veda পৃ-২৫৮।

(২৬) The Future Poetry, পৃ-৯। শ্রীঅরবিন্দ The Future Poetry গ্রন্থে ভবিষ্যতের কাব্যের যে সব লক্ষণের কথা বলেছেন তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি তাকে বৈদিক কাব্যের উত্তররূপ হিসেবে দেখেছেন। যা ছিল উষার কাব্য তারই রূপান্তর হবে মধ্যাহ্নের কাব্যে। কাব্য একই কিন্তু তার রূপ হবে নবতর। যুগে-যুগে তা-ই হয়েছে। অগ্নি একই কিন্তু তিনি যখন সম্ভূতিতে প্রবেশ করেন তখন তাঁর রূপ হয় বহু—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। এবং আত্মিক বিবর্তনের সঙ্গে সেই রূপের প্রকাশের হয় তারতম্য।

(২৭) যথা—এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধএক: সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূত:।
একৈবোষা: সর্ববিদং বি ভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্বং ॥ (বালখিল্য ১০, ২)
(২৮) হৃদ্যাৎ সমুদ্রাৎ; (৫, ৫৮, ৫) দ্রষ্টব্য।
(২৯) শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, বেদমন্ত্র। পৃ-১৫।
(৩০) গরুত্মান্=প্রসারিতপক্ষ বিহঙ্গ।
(৩১) অনুবাদ শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের। বেদমন্ত্র, পৃ-১০৬।
(৩২) "There are two powers that alone can effect in their conjunction the great and difficult thing which is the aim of our endeavour, a fixed and unfailing aspiration that calls from below and a supreme Grace from above that answers." শ্রীঅরবিন্দ, The Mother পৃ-১
(৩৩) মনে পড়ে ফরাসী কবি র‍্যাঁবোর একটি পংক্তি Million d'oiseaux d'or, ô future Vigneur—শ্রীঅরবিন্দ পংক্তিটিকে মানসোত্তর লোকের মন্ত্র আখ্যা দিয়েছেন।
(৩৪) বিশ্বসমুদ্র অচেতনা নয় বা ব্যক্তিগত অবচেতনাও নয়—তা হলো বিশ্বচেতনা বা বিগত, বর্তমান ও অনাগত অনন্ত হৃৎ-সমুদ্রের সমষ্টি।
(৩৫) (৩, ১২, ৭); ঋতস্য বর্তনয়: (১০, ৫, ৪); ঋতস্য ধারা: (৫, ১২, ২)।
(৩৬) মন্ত্রের উৎপত্তি একসঙ্গে দুই সমুদ্র থেকে—এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, মন্ত্র হল—"that rhythmic speech which, as the Veda puts it, rises at once from the heart of the seer and from the distant home of the Truth." The Future Poetry পৃ-৮
(৩৭) এখানে সোমকে বলা হচ্ছে 'সুহস্তা:'। এর সঙ্গে তুলনীয় 'কবিহি মধুহস্তা:' (৫,৫,২)। কবির হাত মধুময়, অথবা কবির হাত থেকে ঝরে পড়ে মধু বা সোমরস।
(৩৮) দ্র: শ্রীঅরবিন্দ, The Secret of the Veda পৃ-৯৭।
(৩৯) চতু:শৃঙ্গ বৃষভ পৌরাণিক চতুর্মুখ ব্রহ্মার পূর্বরূপ অর্থাৎ শব্দব্রহ্মরূপ নয় কি?
(৪০) আমরা পূর্বে বলেছি অর্ক কথার মধ্যেও এ দুটি ভাব সংশ্লিষ্ট।
(৪১) বৈদিক ভাষায় প্রতীকের ব্যবহার অত্যন্ত জটিল ও বিচিত্র। প্রায়ই দেখা যায় কতকগুলো শব্দ পরস্পর নানা দিক থেকে শৃঙ্খলিত হয়ে আছে, সে-শৃঙ্খল কখনো ব্যুৎপত্তিগত, কখনো অর্থগত, কখনো বা শুধুই ধ্বনিগত। নিচের কথাগুলি ধরা যাক—গো অদিতি সরস্বতী বাক্ ধেনু ধী ধীষণা ধেনা ঘৃত জল জ্যোতি মধু সোম—এরা নানাদিক থেকে এক নিবিড় সূত্রে জড়িত। তাই এদের একটি কথার ব্যবহারের ভিতর দিয়ে পাওয়া যায় অন্য কথাগুলোর কিছু না কিছু রেশ। প্রতিটি কথা তাই বহ্বার্থক এবং তাদের 'ধ্বনি', ব্যঞ্জনা, suggestiveness, আভিধানিক ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে ছাড়িয়ে এক বৃহত্তর ও জটিলতর অনুভূতির ইঙ্গিত দেয়।
(৪২) ইন্দ্রের অশ্বের নাম 'উচ্চৈ:শ্রবা'। নামটির মধ্যে আছে অশ্বের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধের ইঙ্গিত। 'শ্রবস্' কথাটির শ্রীঅরবিন্দ কি অর্থ করেছেন দেখা যাক্। "শ্রবস্-এর আক্ষরিক অর্থ হল শোনা এবং সেই প্রাথমিক অর্থ থেকে পাওয়া যাচ্ছে গৌণ অর্থ 'যশ'।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলে শোনা কথার ভাবটা আমাদের নিয়ে যায় সংস্কৃতে অন্য একটি ব্যঞ্জনার দিকে যেখানে পাওয়া যায় 'শ্রবণ, শ্রুতি, শ্রুত'—অর্থাৎ প্রবুর্দ্ধ জ্ঞান, যে-জ্ঞান আসে প্রেরণার পথে। আভিধানিকেরা শ্রবসের এই অর্থ মানেন না, কিন্তু শ্রুতি, অর্থাৎ বেদের দেবাবিষ্ট সূক্ত অর্থে তা গ্রাহ্য হয়েছে। স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে যে এককালে কথাটি ছিল প্রেরণা কিংবা দেবাবিষ্ট বাক্য বা জ্ঞানের অর্থবাহক।" The secret of the Veda পৃ ৫৯। এ থেকেও আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ঋষি দীর্ঘতমার বন্দিত অন্ন সেই বাক্ বা 'একং সৎ'। এখানে গ্রীক পুরাণের Pegasus-এর কথাও স্মর্তব্য। (৪৩) দীর্ঘতমাও সাত বোনের কথা বলেছেন—

সপ্ত স্বসারো কমভিসংনবন্তে যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নাম। (১ ১৬৪, ৩)

এখানো সেই সাত নদীর কথা, যারা চলেছে গাভীদের গুহ্য সাত নামের সন্ধানে। গাভী হচ্ছে বাক্, বা জ্যোতি, বা মাতা অদিতি। নদীরা এখানে কাব্যপ্রেরণার নানাবিধ প্রকাশ। অন্যভাবে আবার বলা যায়, সাতটি নদী হল সাতটি ছন্দের প্রতীক—গায়ত্রী, উষ্ণিঃ, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, বিরাট্, ত্রিষ্টুভ্, জগতী। (১০, ১৩০, ৪-৫) ছন্দ হল 'চেতনার গতিচ্ছন্দ' (নলিনীকান্ত গুপ্ত, বেদমন্ত্র, পৃ১০৯), ছন্দের মাধ্যমেই কথার শক্তির হয় প্রকাশ, কথা রূপান্তরিত হয় মন্ত্রে। ছন্দের স্পন্দন প্রেরণারই প্রনুতি। আরো স্মরণীয় "সপ্ত বাণিঃ" (৩. ১, ৬) "Seven words of the creative goddess Vak—speech, the expressive power of Aditi, of the supreme Prakriti who is spoken of as the Cow..." শ্রীঅরবিন্দ The Secret of the Veda পৃ-১১২।

(৪৪) এর একটি যৌগিক ব্যাখ্যার জন্য নলিনীকান্ত গুপ্তের বেদমন্ত্র পৃ-১০০-১০৪ দ্রঃ।

(৪৫) এ-সম্বন্ধে নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখছেন, "সত্যের নানা স্থিতি; উর্ধ্বতম স্থিতি হল একমদ্বৈতম্। এই একম্-র মধ্যেই বিশ্বসৃষ্টি নিহিত, তাই সে সহস্রাক্ষর; এই উভয়ের মধ্যে তার নানা রূপায়ণ। তা ছাড়া পরাচেতনা আবার আদিশব্দ, আদিবাক্; তাই তার ছন্দের প্রকাশ বাক্যে, রূপায়িত ধ্বনি অর্থাৎ অক্ষরে মন্ত্রের বিবিধ আকারে।" বেদমন্ত্র পৃ-১১১।

(৪৬) অনুবাদ, বেদমন্ত্র পৃ ১০৬।

(৪৭) সৃষ্টির আদিতে স্রষ্টার তৈরি চমস ছিল এক, তাকে চতুর্ধা বিভক্ত করেছে ঋভুরা—একং সন্তবকৃণুতা চতুর্বয়ং (১, ১১০, ৩)। এখানেই বোধ হয় বাকের চত্বারি পদানির কথাই বলা হচ্ছে রূপকের সাহায্যে।

(৪৮) তাঁতের উপমা প্রায়ই দেওয়া হয়েছে কবিকর্মের জন্য; যেমন বরুণের কাছে কবির প্রার্থনা, মা তন্তশ্ছেদি বয়তো ধিয়ং মে (২, ২৮, ৫), ধী-বয়নরত আমার তন্ত যেন ছিন্ন না হয়।

(৪৯) আবার লক্ষণীয়—গাভী বাক্-এর প্রতীক, বৎস কবির। যুগে যুগে কবিরা নানা-ভাবে প্রেরণার শক্তির কথা বলেছেন। "In all times and among many peoples there have—independently of religious faith and often also of moral preparation—been men, who were aware of the reality of 'visions' and intuitions, of inspiration and sudden thoughts and ideas, men who understood that besides the

purely sensuous impression a thought, a flash of intuition, in short knowledge, may come to the human mind, as it were spontaneously, at least without any conscious activity of the organ of sensory perception and which leaves an impression of great reality ; men who know that the 'doors of the mind may be opened' (R.V. 9. 10. 6)." Jan Gonda, The Vision of the Vedic Poet. The Hagne. 1963, p. 17—অপ ঘ্নন্তা বতীনাং; প্রত্না ঋণুন্তি—পুরাতন ঋষিরা উন্মোচন করেছেন মননের দ্বার ; সেই দ্বারপথে নেমে আসে উদ্‌গল বাক্‌। কিন্তু কখনো কখনো বাধা দেয় প্রেরণার পথে। বাক্‌-গাভীদেরকে দস্যুরা আবদ্ধ করে রাখে, তখন দেবতারা খুলে দেন দ্বার—দৃঢ়হস্য চিদ্‌ গোমতো বি ব্রজস্য দুরো বর্তং (৬, ৬২, ১১), খুলে দাও গাভীপূর্ণ সুদৃঢ় গোষ্ঠের দ্বারগুলি। ঋতের দ্বার মুক্ত করলে সরস্বতীর বৃদ্ধি হয়।

অয়ন্ তে সরস্বতি বসিষ্ঠো দ্বারাবৃতস্য সুভগে ব্যাবঃ।
বর্ধ শুভ্রে। (৭, ৯৬, ৬)

হে সুভগা সরস্বতী, বসিষ্ঠ তোমার জন্য ঋতের দ্বার দুটি উন্মোচিত করেছেন। হে শুভ্রা দেবী, তোমার বৃদ্ধি হোক।

(৫০) "The mantra is born through the heart or shaped or massed by the thinking mind into a chariot of that godhead of the Eternal of whom the truth seen is a face or a form." The Future Poetry পৃ-২০০।

(৫১) তক্ষ্‌-ধাতুর অর্থ তক্ষণ করা, তৈরি করা ; এবং তষ্ট (তক্ষ্‌+ক্ত) কবিকর্মের প্রসঙ্গে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। আরো দ্রষ্টব্য—তক্ষান রথাবিব (৫, ৭৩, ১০) ; রথং ন ধীর স্বপা অতক্ষন্‌ (৫, ২৯, ১৫)। Louis Renou মনে করেন ঋগ্বেদের ২, ৩১ সূক্তও কবির রথের বর্ণনা দিচ্ছে—"Parait décrire la voiture du poète." Études Védiques et pāninéenes. Tome 1. Paris 1955, p. 15.

(৫২) "And of all their accomphishings that which is central is the formation of the two brilliant horses of Indra, the horses yoked by speech to their movements, yoked by the Word and fashioned by the mind. For the free movement of the luminous mind, the divine mind in man, is the condition of all other immortalising works." The Secret of the Veda, পৃ-৩২৭।

(৫৩) আরো দ্র: (১০, ৯১, ১৩)।

(৫৪) "for the Vedic Rishi Truth is the passage and the antechamber, the Bliss of the divine existence is the goal, or else Truth is the foundation, Bliss the supreme result." The Secret of the Veda পৃ-৯২

খেলার মাঠে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের প্রতি
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

আমাদের সামনে কুচকাওয়াজ করে অত সুন্দর গান* গেয়ে গেলেন যাঁরা সেই তরুণ ও প্রবীণ কিম্বা মনেপ্রাণে সবুজ যাঁরা সকলে তাঁদের সবাইকে দেখবার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি। মায়ের কণ্ঠনিঃসৃত বাণী আমাকে অনুপ্রাণিত করত আর আমি বেশ বুঝতে পারি তোমাদের কাছে তা কতখানি—তোমরা যারা এখানে আছ ও তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি কর।

আমি জানি শারীরিক শিক্ষাকে কতখানি গুরুত্ব তিনি দিয়েছিলেন, বস্তুত প্রথমবার যখন পণ্ডিচেরী আসি, মনে পড়ে একটা শারীরচর্চার খেলা দেখেছিলাম এবং মা'ও তখন আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতবর্ষে আমাদের, যেমন বোধহয় পৃথিবীর সর্বত্র, একটা গুরু দায়িত্ব আছে একটা নূতন ধরনের মানুষ সৃষ্টির জন্য সুষ্ঠুতর বিশ্ব রচনায়। পথ অনেক সত্যও অনেক, আর আমাদের প্রত্যেককেই হয়ত নিজের পথ ও সত্যটি খুঁজে নিতে হবে এবং সার্বথ্যের জন্য বাইরে না হাতড়ে আপন অন্তরে দেখতে হবে।

বারংবার পৃথিবীতে যা ঘটছে যখন দেখি তখন আমরা হতাশ হই, কিন্তু হতাশার কারণ নেই আর এই জায়গায় তো নেই-ই, ভারতবর্ষের জনগণ সর্বদা কালোপযোগী উঠে দাঁড়িয়েছে, তারা সর্বদা অসুবিধা ও বিপদের মোকাবিলা করেছে সাহস বিশ্বাস ও দৃঢ়মন্যতার সঙ্গে। আমি তাহলে ভবিষ্যতের জন্য তোমাদের সকুণ্ঠ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি জানি তোমাদের ভূমিকা রয়েছে যা পালন করবে, আমি সময় হলে তোমরা উঠে দাঁড়াবে মহিমান্বিতভাবে।

---

* "বন্দেমাতরম্"

১৯-৪-৭৫

মোহনা

সুমিত্রা রায়

আমার নদী সাগরে মিশে
হারিয়েছে তার তীক্ষ্ণতা।
যখন আমি ছিলাম নদী,
আমার শ্রবণ ধরেছে কত কী।
উৎকর্ণ তৃষ্ণায় গ্রহণ করেছে কত না শব্দ।
কত কাকলি আর কূজন গুঞ্জন আর নিক্কণ।
যখন পথহারা, হয়েছে বশগতি,
আহ্বান তোমার, তখন ঘন্টাধ্বনি।
কিন্তু এখন আমার ধ্বনি ভেসে গেছে তোমার গর্জনে।
তোমার জলস্রোতই আমার শ্রবণ,
তাই আমি আজ বধির বধির।

যখন আমি স্রোতস্বতী
তখন আমার নয়ন ছিল;
খঞ্জন পাখীর মত দৃষ্টি ছুঁয়ে যেত,
শ্যামল প্রান্তর আর গহন অরণ্য।
দৃষ্টির নাগাল চাইত পথ ভুলতে,
ছায়ার ঘোমটায় মুখ ঢাকতে।
তখন তুমি দাঁড়াতে দৃষ্টিপ্রদীপ জেলে
অতল জলের আহ্বান নিয়ে।
কিন্তু এখন আমার নয়নে নোনাজল লেগেছে।
অতল জলে আমার দৃষ্টি মিলিয়ে গেছে,
তাই আমি আজ অন্ধ, অন্ধ।

যখন আমি তরঙ্গিণী
তখন আমার ভাষা ছিল।
আমি পৃথিবীর সুরে সুর মিলিয়ে
হতাম নক্তুবাক্, খাঁচার পাখী।
তখন তুমি আমার কণ্ঠে জাগাতে
তীব্র আস্পৃহার মন্ত্র।
আমি সব ভেঙে, ভাসিয়ে

গায়িতার উদ্দাম সঙ্গীত।
কিন্তু এখন আমার ভিতরে বাইরে এক হয়ে গেছে।
কণ্ঠের প্রাচীর ভেঙে গেছে তোমার করাঘাতে।
তাই আমি আজ মূক মূক।

আমি যখন ভোগবতী
তখন আমার অনুভূতি ছিল,
বাটির স্পর্শে আমার রোমাঞ্চ জাগত
মন চাইত তার শুষ্ক অভিলাষী বুকে হারিয়ে যেতে।
তখন তোমার অদৃশ্য তীব্র আকর্ষণ
আমাকে তীব্র বেগে ছিঁড়ে নিত পরম পুলকে।
কিন্তু এখন আমার অস্তিত্ব বিলিয়ে গেছে,
অনুভূতির লোমকূপগুলো জলে ডুবে আছে,
তাই আমি অসাড়, অচৈতন্য।

অকূল সীমাহীনতায় বিলিয়ে গেল সব তীব্রতা।
তবু জানি আমার ব্যক্তিত্ব তোমার বুকে ধরা আছে।
যখনই তোমার ইচ্ছার জল ধেয়ে আসবে আমার পুরনো খোলসে।
আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তুমি এক ফুঁয়ে মেলে দেবে।
আর তীব্রভাবে আমি আবার বেঁচে উঠব।
তোমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে, এক নতুন জাহ্নবী।

চরণযাত্রী

দিলীপকুমার রায়

যেতে হয় যাব, শুধু বলো পাব তোমায় কবে ?
কবে মা অধরা, তুমি দিয়ে ধরা আপন হবে ?
দিনে দিনে দিন যায় ফুলহীন কাঁটার বনে,
রাঙো অন্তরে যদি—কেন ঝরে ধারা নয়নে ?
তুমি মহালয়া যদি বরাভয়া—কেন ছলনা
করো মা তুফানে দিশাহারা প্রাণে আলো বলো না ?
যেতে হয় যাব, শুধু বলো পাব তোমায় কবে,
তোমার চরণ করি' মা বরণ প্রেমোৎসবে ?

জানি—তুমি আলো, তবু কেন কালো মেঘ ঘনায়,
তুমি মনোরমা জানি' তবুও মা সাধি অনায় ?
আজ পরীক্ষা থাকুক—দীক্ষা দাও মা সাঁঝে
সাজাতে তোমায় দীপালি আনার বুকের মাঝে।
এলো সুপূরিকা ছায়ানীহারিকা, ধরিয়া কায়া,
জাগো বেদনায় মিলনলীলায় দলিয়া মায়া।
যেতে হয় যাব, শুধু বলো পাব তোমায় কবে
গাহি' মা তোমার নামঝঙ্কার প্রেমোৎসবে।

জননী

রমেন সেনগুপ্ত

তিমির বিদীর্ণ করি প্রকাশিলে মাতঃ
আলোক-বর্তিকা হাতে লয়ে।
হিংসা-দ্বেষ-কণ্টকিত পৃথিবীর দিক্‌চক্রবালে
জমেছে স্বার্থের মেঘ;
মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে—
দেশে দেশে রক্তাক্ত সংগ্রাম,
মানুষে মানুষে হানাহানি।
জীবনের উদ্ধত বুভুক্ষা যত
বিধিদত্ত মনুষ্যত্বে করিছে আঘাত।
শ্রান্ত ক্লান্ত মানবাত্মা শান্তি খুঁজে মরে—
খোঁজে খর দিবসেতে স্নেহস্নিগ্ধ ছায়া।
অনন্তের হাতছানি
কর্মভার-ব্যস্তমন্ত্র জীবনের উষর বেলায়
কখনও ইঙ্গিত দেয় মহাজীবনের।
মূঢ় গর্বস্ফীত মন সে-ইঙ্গিতে সাড়া নাহি দেয়,
আপনার অহমেরে ঘিরি'
দণ্ডে দণ্ডে গড়ি তোলে বাসনার বালুকা-কুটির।
তুমি সে বিনষ্ট মাঝে দেখা দিলে
আপন প্রদীপ্ত মহিমায়,
দেখা দিলে স্মিতহাস্যে
সন্তানের সার্বিক কল্যাণ-ব্রত লয়ে
যুগ-যুগ-বন্দিতা জননী—
স্নেহের সীমায় বদ্ধ চিরন্তনী মা।
রূপান্তর সাধনার দুঃসহ প্রয়াসে
ধ্যানমগ্না ছিলে তুমি,
অঙ্গে অঙ্গে সহিয়াছ নিষ্ঠুর যাতনা;
সিদ্ধি যবে করায়ত্ত,
ত্যজিয়াছ পুরাতন জরাজীর্ণ দেহ
নূতনের আবাহন লাগি।
মৃত্যু নাহি তব,
মৃত্যুর সোপানে চড়ি ঊর্ধ্বায়ত অভীপ্সা তোমার।

তোমার সাধনা
দিব্যজীবনের স্পর্শ নামিয়ে এনেছে ধরাতলে।
ধূলিম্লান ধরণীর বেদনাবিধুর দিনগুলি
অবসান করিছে কাননা,
অসীমের দূর প্রান্তে উদ্ভাসিয়া ওঠে
অতিমানসিক রশ্মিপ্রভা।
সে মহা-আলোকে যায় দেখা
মানুষের শেষ ভাগ্যলিপি।
জড়ত্বের অভিশাপ তুচ্ছ করি
মানুষের মুক্তিকামী মন
উত্তরিবে একদিন প্রশান্তির উন্মুক্ত প্রান্তরে;
নাহি রবে দ্বন্দ্বদ্বেষ—মরণকঠিন স্পর্শ,
প্রতিদিবসের গ্লানি নাহি রবে—
প্রতিদিন অঙ্ক কষে কষে
সুখ ও দুঃখের মূল্যায়ন।
সেদিনের আলোক-বন্যায়—
অতিমানসের তীব্র জ্যোতির উচ্ছ্বাসে
পূর্ণ হবে মানুষের চিরন্তনী প্রৈতি।
অমৃতত্ব লাভ করি মানবসন্তান
দাঁড়াবে বিশ্বের তটে সিদ্ধকাম হয়ে।
যুগের অতীত হতে চলেছে প্রাণের যাত্রা
বিবর্তন-পথে।
জড় থেকে জন্ম তার সৃষ্টির উষায়,
তারপর বিবর্তিছে নব নব দেহে
নব নব রূপে।
আজিকার যে-মানুষ শূন্যপানে ধায়,
দুর্গম পাহাড়চূড়ে ওঠে,
সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দেয়,
সে-ও সে প্রাণের এক বিবর্তিত রূপ।
সে প্রাণধারায়
একদিন দেখা দিবে দিব্যদেহী নর
জরামৃত্যুহীন।
মানবজননী তুমি
জরান্বিত করিয়াছ সে মহালগ্নকে
তোমার অমর্ত্য সাধনায়।
নমি তোমা মাতঃ,

দেহ ছাড়ি আজি তব বিদেহী চেতনা
ছড়ায়ে পড়েছে বিশ্বময় :
তারি স্পর্শ লাগি
উন্মোষিয়া উঠিতেছে বিশ্বপ্রাণ
নবীন পুলকে।
নহে দুঃখ, নহে শোক,
নহে তব অদর্শন লাগি
ক্ষুব্ধমনে অশ্রু বিসর্জন ;
বিশ্ববিজয়িনী তব মহিমার ধ্যাননুতি স্মরি
সম্মুখে চলিতে হবে মহাকাল সাথে
স্থির পদক্ষেপে।
শক্তি দাও মাতঃ,
শক্তি দাও সে পথচলার।
মহাযোগী-নির্দেশিত মহান সত্যের পথে
বাজে তব জয়শঙ্খ,
তোমার সে শঙ্খরবে ধ্বনিছে আহ্বান—
'ওঠো, জাগো, পূর্ণ কর যাত্রা তব
অমৃতের অধিকার লভি'।
এ বিশ্বের কর্ম ও চিন্তায়
সত্য হোক বাণী তব,
সত্য হোক তব মাতৃস্নেহ,
অন্তরে জ্বলুক তব মঙ্গল-আলোক।

ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা

(প্রথম পরিচ্ছেদ)

শ্রী অরবিন্দ

ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের সীমাহীন বৈচিত্র্য য়ুরোপীয় মনের কাছে মনে হয় অনতিক্রম্য, বিভ্রান্তিকর, অবসাদজনক, নিরুদ্যোজন ; আরণ্য বৃক্ষলতাগুল্মের প্রাচুর্য ও পর্যাপ্তি দেখে অরণ্যকে সে আর খুঁজে পায় না ; বহু রূপের মধ্যে একই আধ্যাত্মিক জীবনটি ধরতে পারে না। কিন্তু এই অনন্ত বৈচিত্র্যই—বিবেকানন্দ ঠিকই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন—শ্রেষ্ঠতর ধর্মীয় সংস্কৃতির চিহ্ন। ভারতীয় মন চিরকাল জেনেছে যে সর্বোত্তম হলেন অনন্ত ; বৈদিক যাত্রারম্ভ থেকে সে বুঝেছে প্রকৃতিস্বপ্নী আত্মার কাছে যিনি অনন্ত তিনি সর্বদা নানা ভাবের অনন্ত বৈচিত্র্যে দেখা দেন। পশ্চিমের মন দীর্ঘকাল সকল মানবের জন্য পোষণ করে এসেছে একটা রূপং দেহি এবং অযৌক্তিক একক ধর্ম, তার সংকীর্ণতার প্রবেগের জন্যই বিশ্বব্যাপী এক ধর্ম, এক গুচ্ছ নীতিসূত্র, একটা ব্রত, অনুষ্ঠানের এক পদ্ধতি, এক সার নিষেধাজ্ঞা এবং অনুশাসন, গীর্জানিঃসৃত এক হুকুম। সেই সংকীর্ণ অবাস্তবতাই লেচেকুঁদে-বেড়ানো একমাত্র ধর্ম যা প্রত্যেককেই অবশ্য গ্রহণ করতে হবে—নতুবা এখানে মানুষের উৎপীড়ন এবং পরলোকে ভগবানের হাতে নিদারুণ চিরন্তন শাস্তি, এই ভয়ে। মানুষী অযুক্তির এই বীভৎস সৃষ্টি—এত অসহিষ্ণুতা নিষ্ঠুরতা অন্ধবদ্ধতা ও উগ্র স্বমতবদ্ধতার যা জনক,—মুক্ত ও নমনীয় ভারতীয় মনকে কখনো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে পারেনি। সর্বত্রই মানুষের রয়েছে একই মানুষী দোষত্রুটি, বিশেষত আচরণের ক্ষেত্রে পরমত-অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণতা ভারতেরও দেখা গেছে এবং আছেই তো। দেখা গেছে ধর্মতাত্ত্বিক বাদানুবাদের প্রচুর দ্বন্দ্ব, দেখা গেছে আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা এবং মহত্তর জ্ঞানের দাবি নিয়ে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে তুলকালাম তর্ক এবং সময়ে সময়ে—বিশেষত দক্ষিণ ভারতে একদা তীব্র এক ধর্মীয় দলাদলির যুগে—প্রকট হয়েছে স্থানীয় পারস্পরিক সক্রিয় লাঞ্ছনা ও নিপীড়নে হানাহানির ঘটনা পর্যন্ত। তবু যুগরূপে এসব যে-রূপ ধরেছিল এখানে সে-মাত্রায় যাদৌ পৌঁছে নি। পরমত-অসহিষ্ণুতা অধিকাংশক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল মতবুদ্ধের নুদু কোঠায় কিম্বা সামাজিক অবরোধ বা সমাজচ্যুতিতে ; এ পথে কদাচিৎ তারা বর্বর নির্যাতনের অতিকায় রূপ ধরে য়ুরোপের ধর্মেতিহাসের মতো দিক দিগন্ত জোড়া রক্তিম বীভৎস রেখাপাত করতে পেরেছে। ভারতে বরাবর ত্রাণকারী উর্ধ্বতর শুদ্ধতর এক আধ্যাত্মিক বুদ্ধির স্বীকৃতি কাজে লেগেছে, জনমানসে তার পরিণাম দেখা গেছে। ভারতীয় ধর্ম চিরকাল বুঝে এসেছে যে যেহেতু মন সমাজ এবং মানুষের বুদ্ধিগত মিল বৈচিত্র্যে অনন্ত তাই ব্যক্তিকেও চিন্তা ও উপাসনার অকুণ্ঠ স্বাধীনতা দিতে হবে অসীমে পৌঁছাতে।

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রামাণিকতা স্বীকার করেছে কিন্তু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বৈচিত্র্যের প্রয়োজন সে আরো বেশি স্বীকার করেছে। সেই অধঃ-

পতনের যুগেও, যখন প্রামাণিকতার এই দাবি অতিরিক্ত নানা দিকে কঠোর ও মাত্রাহীন হয়ে উঠেছিল, সে এই বোধটি অটুট রেখেছিল যে একটির মতো বহু মতেরও প্রামাণিকতা থাকা চাই। পুরাতন ঐতিহ্যকে সম্প্রসারণে সমর্থ নূতন আলোককে বরণের জাগ্রত প্রস্তুতি ভারতীয় ধর্মপ্রাণ মনের চিরলক্ষিত বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় সভ্যতা তার প্রাথমিক কালের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বাধীনতাকে অন্তিম যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে নিয়ে চলে নি,—সেই স্বাধীনতার বহুত্ব বা নিরীক্ষণের দুঃসাহস পাশ্চাত্যের ; কিন্তু অন্য সকল ব্যাপারে যেমন তেমনি ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ও ধর্মে চিন্তার পূর্ণ স্বাধীনতাও তার চিরন্তন ঐতিহ্যের মধ্যে গ্রাহ্য হয়েছে। ভারতবর্ষে নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদী লাঞ্ছিত নির্যাতিত হয় নি। উচ্চকো ধর্মমত বলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে অবজ্ঞা করা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু গোঁড়া মতবাদ ও দর্শনগুলির পাশাপাশি অবাধে চলতে দেওয়া হয়েছিল তাদের ; সত্যের তৃষ্ণায় আতুর ভারতবর্ষ তাদের পূর্ণ সুযোগ দিয়েছে, তাদের সকল মূল্য পরীক্ষা করেছে, এবং তাদের সত্যের যতটা পরিপাক করা সম্ভব তা নিয়েছে নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পরিচিত সদাপ্রসারী নিরন্তপ্রবাহের আধারে। সেই অজর প্রবাহটি সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু তাতে আলো আসতে দেওয়া হল সকল দিক থেকে। পরবর্তীকালে হিন্দু ও ঐসলামিক শিক্ষাকে কিছু মিলিয়ে ধরতে পেরেছিলেন যেসব সাধুসন্ত তাঁরাই তৎক্ষণাৎ অবাধে হিন্দুধর্মের নেতা বলে স্বীকৃত হয়েছেন,—এমন কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন, মুসলমানরূপে জন্ম নিয়ে এবং মুসলমানী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শুরু করলেও। যে যোগী এক নূতন যোগপথ গড়ে তোলেন, যে ধর্মগুরু একটা নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন, যে মনীষী আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বহুমুখী সত্যকে অভিনব ব্যাখ্যায় প্রনর্ত করেন, তিনি তাঁর আচরণে ও প্রচারে কোনো গুরুতর বাধা পান না। বড়জোর স্বভাবগত ভাবে সকল পরিবর্তনবিমুখ পুরোহিত ও পণ্ডিতদের বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁদের, কিন্তু এটুকু ঘাড় পেতে বরদাস্ত করা হয়েছিল কেবল যাতে জাতীয় ধর্মের মুক্ত ও সুনম্য দেহে ও সদাগ্রহিষ্ণু প্রতিষ্ঠানে নূতন উপাদানটি গৃহীত হতে পারে।

একটা সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা এবং সেই সঙ্গে একটা অবাধ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সর্বদাই গ্রাহ্য ছিল, তবে তার স্থান হয়েছিল নানাভাবে, কোন একক আকৃতিগত বাহ্যিক বা কৃত্রিম উপায়ে নয়। প্রথমত তার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কতগুলি চিরবর্ধিষ্ণু প্রামাণিক ধর্মশাস্ত্রের স্বীকৃতির উপর। এদের মধ্যে গীতার মতো ধর্মশাস্ত্র পেয়েছিল বহুগ্রাহ্য ও বহুবিস্তৃত আধিপত্য, বাকীগুলি দল ও সম্প্রদায়গত : বেদের মতো কতকগুলির নিরঙ্কুশ ও অপরগুলির আপেক্ষিক পালনীয় শক্তি ছিল। কিন্তু ব্যাখ্যার একাণ্ড বৃহত্তর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, এতেই কোনো প্রামাণ্যগ্রন্থকে ধর্মযাজকের হাতে উৎপীড়নের আয়ুধে পরিণত এবং মানুষের মন ও আত্মাকে স্বাধীনতা-বঞ্চিত করা থেকে বাঁচানো গেছে। আরেকটি শৃঙ্খলাস্থাপক যন্ত্র ছিল পারিবারিক ও গোষ্ঠিগত ঐতিহ্যের শক্তি—কুলধর্ম, অটল হলেও অপরিবর্তনীয় নয়। তৃতীয় হল ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় আধিপত্য ; পুরোহিতরূপে তাঁদের দায় আচাররক্ষকের, পণ্ডিত হিসাবে কর্তব্যরত পুরোহিতের দাবির চেয়েও তাঁদের অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রদ্ধাভাজনের ভূমিকা,—কারণ, ভারতবর্ষে পুরোহিতকুলকে তো তেমন কেউকেটা করা হয়নি, তাঁরা ছিলেন ধর্মীয় ঐতিহ্যের ব্যাখ্যাতারূপে, একটা প্রবল রক্ষণশীল ক্ষমতা হিসাবে। পরিশেষে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যজনক, সবচেয়ে পরাক্রান্ত শৃঙ্খলার

প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অধ্যাত্মশিক্ষক বা গুরুপরম্পরা দ্বারা, যাঁরা প্রত্যেকটি আধ্যাত্মিক পন্থার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন এবং সেটি বংশানুক্রমে অনুসৃত করে দিয়েছিলেন ; তবে পুরোহিত বা পণ্ডিতদের থেকে ব্যতিক্রম হয়ে তাঁদের ক্ষমতা ছিল সেটির তাৎপর্য অবাধে সমৃদ্ধ করা ও তার অনুশীলন গড়ে তোলা। একটা জীবন্ত ও সচল—আড়ষ্ট নয়—ধারাবাহিকতাই ছিল ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ধর্মীয় মনের বিশিষ্ট ভঙ্গি। বহু প্রাচীন কাল থেকে বৈষ্ণবধর্মের বিবর্তন, তার সন্ত ও উপদেষ্টাদের ধারাপরম্পরা, তাতে বিস্ময়কর উন্নতির সাধক ক্রমানুয়ে রামানুজ মধ্ব চৈতন্য বল্লভাচার্যের আবির্ভাব এবং কিছুকাল নির্জীবতায় যাপন ও আংশিক শিথীভূত হবার পরে সাম্প্রতিককালের আলোড়ন-উজ্জীবন এই যুগযুগান্ত-ব্যাপী নিরন্তপ্রবাহের ও অনড় ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রবল ও জীবন্ত পরিবর্তনের গাঢ় সংবিশ্রণ একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। অধিকতর জ্বালন্ত দৃষ্টান্ত শিখধর্মের পত্তন, তার গুরুপরম্পরায় দীর্ঘ ধারা এবং গণতান্ত্রিক খালসা প্রতিষ্ঠান তাতে দিয়েছে একটা অভিনব গতিনির্দেশ ও আকৃতি। বৌদ্ধ সংঘ ও তাদের মন্ত্রণাসভাগুলি, শঙ্করাচার্য-সৃষ্ট এক প্রকার স্বিতন্ত্র ধর্মযাজকীয় দৌরাত্ম্য—যে-দৌরাত্ম্য বংশানুক্রমে সহস্রাধিক বছর পেরিয়ে এসে আজো একেবারে নিস্তেজ হয়নি—শিখ খালসা, আধুনিক সংস্কারবাদী নানা দল যারা সমাজ নামে অভিহিত জনসমাবেশের রূপটি গ্রহণ, একটা সংহত নিরন্ধ্র শৃঙ্খলা স্থাপনের দিকে প্রয়াসেরই ইঙ্গিত। পাশ্চাত্যে অতিকীর্ত যাজক-প্রতিষ্ঠান এবং স্বৈরাচারী শ্রেণীব্যবস্থা যেরকম মানবজাতির আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার কাঁধে চেপে করেছে তাদের তমসাচ্ছন্ন শাসনপীড়নের জোয়াল চাপিয়ে দিতে, বলা উল্লেখযোগ্য সেক্ষেত্রে এই সকল প্রয়াসের মধ্যেও ভারতীয় ধর্মীয় মনের স্বাধীনতা, নমনীয়তা ও জীবন্ত নিষ্ঠা তাকে এর সকল অনুকরণ থেকে বিরত রেখেছে।

যে কোনো ক্ষেত্রে যুগপৎ স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার দিকে প্রবৃত্তি চিরকাল সেক্ষেত্রে উচ্চ স্বাভাবিক যোগ্যতার চিহ্ন, এবং যে-জাতি সদা-সুশৃঙ্খল ধর্মীয় বিবর্তনের সঙ্গে অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতার মিলন ঘটাতে পেরেছিল তার সমুচ্চ ধর্মীয় যোগ্যতা অবশ্য স্বীকারযোগ্য, যেমন তার অনিবার্য ফলও অস্বীকার করা যায় না—একটা মহান ও অদ্যাপি জীবন্ত আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি। চিন্তা ও অভিজ্ঞতার এই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা রক্ষার্থে বিচিত্র ও প্রভূতভাবে নমনীয় এই কাঠামোর ব্যবস্থা যা আবার যথেষ্ট ধ্রুব ও দৃঢ় ব'লে একটা স্থায়ী ও শক্তিশালী বিবর্তনের উপায়—এ-ই ভারতীয় সংস্কৃতিকে দিয়েছে এমন বিস্ময়কর ও আপাত-প্রতীয়মান শাশ্বত ধর্ম, যার ভিতরে তার বহুমুখী দর্শনাবলীর, মহান শাস্ত্রসমূহের, গভীর সব ধর্মগ্রন্থের, নানা ধর্মের অপূর্ব ঐশ্বর্য, যা শাশ্বতের অভিমুখে চলে তার অনন্ত সত্যের, চৈত্য-আধ্যাত্মিক সাধনা ও আত্মআবিষ্কারের নানা যোগপথের, নানা বহুনাময় রূপ, প্রতীক ও অনুষ্ঠানের প্রত্যেক দিক দিয়ে—ভগবৎমুখী প্রয়াসের অভিমুখে এসব প্রত্যেক ধাপে মনকে অনুশীলিত করবার পক্ষে সক্ষম। একটা বিরাট পরমতসহিষ্ণুতা এবং স্বীকরণ মনোবৃত্তিকে নির্বিঘ্নে বহনক্ষম তার দৃঢ় গঠনসৌধটি, তার অভিজ্ঞতার প্রাণোচ্ছলতা, তীব্রতা, গভীরতা ও বহুবৈচিত্র্য, য়ুরোপে একদিকে সাংসারিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে ধর্মের মধ্যে যে বিবাদবিচ্ছেদ তা থেকে এর মুক্তি, বুদ্ধির দাবির সঙ্গে আত্মার দাবিকে এর মিলিয়ে ধরা, এর দীর্ঘ স্থায়িত্ব এবং পুনরুত্থানের অসীম সামর্থ্য একে যাবতীয়

ধর্মসংস্থানের মধ্যে আজ সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ সবুজ ও জীবন্ত বলে তুলে ধরেছে। উনবিংশ শতাব্দী তার উপর হেনেছে নেতিবাদ ও সন্দেহবাদের শাণিত আঘাত, অথচ তার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নিরাপদ শিকড় বিনাশ করতে পারেনি। দেশের প্রাণশক্তির গভীরতম অবসাদের যুগে ক্ষণিকের জন্য বিব্রত, বিস্মিত এবং সাময়িকভাবে এই আক্রমণের ফলে বিহ্বল হয়েও ভারতবর্ষ উঠে পড়েছে প্রায় তৎক্ষণাৎ এবং প্রত্যুত্তর দিয়েছে আধ্যাত্মিক কর্ম, অনুসন্ধান, আত্মস্মরণ, সংগঠনী প্রয়াসের আর এক নবোল্লাসে। এক বৃহৎ নবজীবন তার ভিতরে স্পষ্টত উন্মুখোদ্যত, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অকুণ্ঠান নানা অসীমতায় একটা প্রবল রূপান্তরের, একটা মহত্তর সক্রিয় বিবর্তনের, একটা সমর্থ প্রগতির জন্য।

ভারতীয় ধর্মরীতি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির বহুধা নমনীয়তা তার সত্যের, তার আপ্তত বাস্তবতার, তার অনুসন্ধান ও প্রাপ্তি সম্বন্ধে অবদ্ধ আন্তরিকতার জন্মগত চিহ্ন; কিন্তু এই নম্যতাই য়ুরোপীয় মনের কাছে বারংবার হোঁচট খাবার হেতু। য়ুরোপের ধর্মীয় ভাবনা অত্যন্ত আড়ষ্ট ক্ষয়কারী সংজ্ঞায়, কঠোর বিবর্জনে, বাহ্যভাব, সংগঠন, আকার নিয়ে নিত্য লিপ্ত থাকাতে। ন্যায়িক কিম্বা ধর্মতাত্ত্বিক বুদ্ধি দিয়ে ছকে দেওয়া একটা সুনির্দিষ্ট ধর্মপথ, আচরণ বিধিবদ্ধ করার জন্য একটা নির্দয় ও সুস্পষ্ট নৈতিক প্রণালী, আচার অনুষ্ঠানের এক স্তূপ, ধর্মযাজনার বা যৌথ-উপাসনার একটা দৃঢ় সংঘ—এই-ই হল পাশ্চাত্য ধর্ম। এসব জিনিসের মধ্যে আত্মাকে একবার বন্দী ও শৃঙ্খলিত করে ফেলতে পারলে, তারপর একটু আবেগের উচ্ছ্বাস এবং খানিকটা মিস্টিক অনুসন্ধিৎসা পর্যন্ত বরদাস্ত করা চলে—যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে, তবে তলিয়ে দেখলে এসব নায়ায়ক বর্জনা বাদ দিয়ে চলাই বোধহয় সবচেয়ে নিরাপদ। এই সব ধারণায় অভিসিক্তিত হয়ে পাশ্চাত্য সমালোচক ভারতবর্ষে আসেন এবং এসেই হতভম্ব হয়ে দেখেন একটা বহুদেব-দেবী বহু দেবতা উপাসনার বিপুল সমাবেশ ও জটিলতা যার চূড়ান্তে এক অনন্তের উপর বিশ্বাস। মূঢ়ভাবে সে ধরে নেয় এই বিশ্বাস আর পাশ্চাত্যের তত্ত্বসার বুদ্ধিগত সর্বেশ্বরবাদ একই জিনিস। একটা একগুঁয়ে পূর্বসিদ্ধান্ত ধরে সে নিজের চিন্তার ভাব ও সংজ্ঞাগুলি প্রয়োগ করে, আর এই অসঙ্গত আমদানিই ভারতীয় আধ্যাত্মিক ধারণাসমূহের নানা বিধ্যা মূল্য নির্ণয় করেছে—দুঃখের বিষয়, 'শিক্ষিত' ভারতীয়ের মনে পর্যন্ত। তার নির্দিষ্ট মান যেখানে আমাদের ধর্মের খই পায় না সেখানে তৎক্ষণাৎ তার উদ্ধারকর্তা দেখা দেন ভুলবোঝাবুঝি, নিন্দা এবং প্রকট ভর্ৎসনা। অপরপক্ষে ভারতীয় মন কিন্তু অসহিষ্ণু মানসিক একরোখামিতে বিমুখ; যেহেতু সম্বোধি এবং আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা তাকে শুরু থেকেই দিয়েছে সেই বস্তুটি যার দিকে পাশ্চাত্যের মন মাত্র আজকাল বহু কষ্টে বহু বিভাগের এগুতে চাইছে—বিশ্বচেতনা বিশ্বদৃষ্টি। যখন একেশ্বরাদ্বিতীয়বাদকে দেখে তখনও সে তার পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতসত্তাকে স্বীকার করে; তাতে স্থান হতে পারে তার বহু ত্রিমূর্তি এবং অনন্ত বিভাবের। যখন তা অভিনিবিষ্ট হয় ঈশ্বরের একটিমাত্র সীমা-বদ্ধকারী বিভাবের উপর এবং সেটি ছাড়া অন্য কিছুর উপর দৃক্‌পাত করে না তখনও তা প্রবৃত্তিবশেই চেতনার অন্তরালে ধরে থাকে সর্বের বোধ এবং একনের ধারণা। এমন কি যখন সে তার পূজা বহু ইষ্টের ভিতর বিতরণ করেছে তখনও সেই সঙ্গেই দৃষ্টি মেলেছে নানা আরাধ্যের মধ্যে দিয়ে এবং দেখেছে বহুল দেবতাকে ছাড়িয়ে সেই পরমেরই ঐক্যকে। এই সবনুয়ী দৃষ্টি শুধু মিস্টিকের, মুষ্টিমেয় শিক্ষিতশ্রেণী, কিম্বা বেদবেদান্তের সমুর্ধ্ব শিখরে

পরিপুষ্ট দার্শনিক মনীষীদের একচেটে নয়। তা পুরাণ ও তন্ত্রের ভাবনা রূপক ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক প্রতীকে লালিত গণমানসেও পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল, কেননা এসব জিনিস বৈদিক শাস্ত্রের সমন্বয়কারী অদ্বৈতবাদ, বহুমুখী একেশ্বরবাদ ও বিপুল বিশ্বগত সর্বজনীনতার বাস্তব প্রতিভূ বা জীবন্ত প্রতিমা মাত্র।

ভারতীয় ধর্ম নাম-রূপ-কালের অতীত পরব্রহ্মের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তরুণতর জাতিদের সংকীর্ণতর এবং অধিকতর অন্ধ একেশ্বরবাদের মতো শাশ্বত ও অসীমের যাবতীয় অন্তর্বর্তী নাম রূপ শক্তি ও ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার কিম্বা বিলোপ করে দেবার দায় সে নেয়নি। ধর্মলেশহীন একেশ্বরবাদ অথবা পাশ্চাত্য অস্পষ্ট তুরীয় ঈশ্বরবাদ তার আদি মধ্য অন্ত ছিল না। একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরই সর্বম্ বলে পূজিত হলেন, যেহেতু বিশ্বে সবই তো তিনি অথবা তাঁর সত্তা কিম্বা প্রকৃতি থেকে তৈরি। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম তা বলে সর্বেশ্বরবাদ নয় কারণ এই বিশ্বব্যাপ্তির উপর বিশ্বাতীত শাশ্বতকে সে জেনেছে। ভারতীয় বহুদেববাদ প্রাচীন য়ুরোপের জনপ্রিয় বহুদেববাদ থেকে ভিন্ন; কেননা এখানে বহু দেবতার পূজারী এখনো জানে যে তার দেবতারা সেই এক পুরুষ থেকে উদ্ভূত, তার দেবীরা সেই এক ভাগবতী শক্তিরই তেজ। ভারতীয় ধর্মপ্রণালীর এই যেসব ধারা ঈশ্বরবাদের জনপ্রিয় সুলভ রূপের মতো দেখায় তারা অবশ্য অধিকতর কিছু; তারা ঈশ্বরের বহু দিক নিষ্ক্রান্ত করে না, গ্রহণ করে। ভারতীয় মূর্তিপূজা বর্বর বা অপরিণত মনের পৌত্তলিকতা নয়, কারণ বুদ্ধিতেও জানে যে মূর্তি এখানে শুধু প্রতীক ও বাহক এবং প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেই তাকে ফেলে দেওয়া যায়। পরবর্তী ধর্মমতের মধ্যে যারা ঐসলামিক ভাবের দ্বারা—যেমন নানকের 'অকাল'-পূজা—সব চেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল, এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের অধীনে প্রসূত বর্তমানের সংস্কারবাদী ধর্মমতগুলি তবু প্রতীচ্যের ও সেমেটিক একেশ্বরবাদের নানা অপূর্ণতা এড়িয়ে ছিল। এসব বালসুলভ ধারণা থেকে দুর্বার প্রবেগে তারা ফিরেছিল বেদান্তের অতল সত্যের দিকে। বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম ঈশ্বরের দিব্য ব্যক্তিত্ব এবং মানবের সঙ্গে তাঁর মানুষী সম্বন্ধকে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় সত্য বলে জোর দিয়েছে; কিন্তু এসব ধর্মের তা-ই সব নয়, এবং এই ভগবৎ ব্যক্তিত্ব পাশ্চাত্যের অতিরঞ্জিত মানুষী ব্যক্তি-ভগবান নয়। পাশ্চাত্য বুদ্ধির জানা কোনো সংজ্ঞায় ভারতীয় ধর্মের বর্ণনা চলে না। সমগ্ররূপে তা হল যাবতীয় আধ্যাত্মিক সাধনা ও অভিজ্ঞতার এক স্বাধীন ও পরমতসহিষ্ণু সমন্বয়। এক মহাসত্যকে তার নানা দিক থেকে দেখে আর কোনো সত্যের প্রবেশ নিষেধ করে না। কোনো নির্দিষ্ট নামের কাছে নিজেকে সে ধরে দেয়নি, অবরুদ্ধ হবার কোনো বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বাঁধেনি নিজেকে। তার অভ্যন্তরস্থ নানা মত ও বিভাগের পার্থক্যসূচক নামধাম সে অনুমোদন করেছে, কিন্তু নিজে থেকেছে অনামী অরূপ সার্বভৌম অনন্ত, নিজের যুগযুগান্তের লক্ষ্য ব্রহ্মেরই মতো। যদিও অন্য ধর্মমত থেকে তার পরম্পরাগত বিবিধ শাস্ত্র, সাধনধারা ও প্রতীক দিয়ে বিশেষভাবে চিহ্নিত তবু মৌলিক প্রকৃতির দিক থেকে তা মতবাদ-ধর্ম আদৌ নয়,—পরন্তু একটা বিশাল বহুদিকসমন্বিত, একটা চির-একত্ববিধায়ক ও নিত্য প্রসারমান আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সৌধ।*

---

* শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ কেবল যে-ধর্মকে দৃশ্যত প্রত্যাখ্যান করেছে তা হল বৌদ্ধধর্ম, কিন্তু এ-দৃশ্য প্রকৃতপক্ষে একটা ঐতিহাসিক ভ্রান্তি। বৌদ্ধধর্ম তার ভিন্ন অস্তিত্বের শক্তি

ভারতীয় ধর্মবানসের এই সমন্বয়পরী প্রকৃতি ও আলিঙ্গনদায়ী ঐক্যের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন, নতুবা ভারতীয় জীবনের সমস্ত তাৎপর্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সমস্ত অর্থ হারাব। এই উদার ও নমনীয় চরিত্রটি মেনে নিলেই বুঝতে পারব ব্যষ্টি জীবন ও সমষ্টি-জীবনের উপর তার পূর্ণ পরিণাম কী। আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'তাহ'লে মোটের উপর হিন্দুধর্ম কী, তার শিক্ষা কী, তার সাধনা কী, কী তার মূলভ উপাদান',—তবে উত্তরে বলতে পারি ভারতীয় ধর্ম তিনটি মূল ধারণার বা উচ্চতম প্রশস্ততম আধ্যাত্মিক উপলব্ধির তিনটি মৌল বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম হল সেই বেদোক্ত একম্ সৎ-এর ধারণা যাকে বিপ্ররা বহুধা নামে ডেকেছেন, উপনিষদ যাকে বলেছেন অদ্বিতীয় এক—যিনি এই আছে যা-কিছু তা আবার যা আছে সেসব ছাড়িয়ে, বৌদ্ধদের অক্ষয়, মায়াবাদীদের পরব্রহ্ম, ঈশ্বরবাদীদের পরাৎপর ভগবান বা পুরুষোত্তম, যার বীর্যে ধরা অন্তরাত্মা ও প্রকৃতি —এক কথায় যা শাশ্বত অনন্ত। এই হল প্রথম সহজদৃশ্য ভিত্তি ; কিন্তু মানুষী বুদ্ধি একে অসংখ্য বৈচিত্র্যময় সূত্রে প্রকাশ করতে পারে ও করেছে। এই শাশ্বত এই অনন্ত এই সনাতনকে আবিষ্কার করা, নিবিড়ভাবে তাঁর নিকটস্থ হওয়া ও এই অবিনশ্বর এই অনন্ত এই শাশ্বতের সঙ্গে কোনো রকমে কোনো মাত্রায় একাত্মতায় প্রবেশ করা—এই হল তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির উদ্ভুঙ্গ শিখর ও চরম প্রয়াস। ভারতীয় ধর্মবানসের এটিই প্রথম সর্ব-জনীন ধারণা।

যে-কোনো সূত্রাকারে এই ভিত্তি গ্রহণ করুন, ভারতবর্ষে স্বীকৃত হাজার পন্থার যে-কোনোটি কিম্বা তাদের থেকে নিঃসৃত যে-কোনো নতুন শাখা ধরে এই মহৎ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অনুসরণ করুন তাহলেই ওই ধর্মের মর্মস্থলে পৌঁছে যাবেন। কারণ, তার দ্বিতীয় মূলগত ধারণা হল মানুষের পক্ষে শাশ্বতে অনন্তে পৌঁছিবার রাস্তা বহু। আনন্ত্য বহু অনন্তে পূর্ণ এবং এই বহু অনন্তের প্রত্যেকটিই স্বয়ং শাশ্বত। ভগবান এখানে বিশ্বের সকল সীমাবদ্ধের মধ্যেই জগতে নানাভাবে আপনাকে প্রকাশ করেছেন, তবে প্রত্যেকটিই শাশ্বতের পথ। প্রতিটি সীমার ভিতরে অসীমকে আবিষ্কার করতে পারি এবং তাঁর রূপ ও প্রতীক হিসাবে সর্বভূতের মধ্যে দিয়ে সেই অসীমের সমীপবর্তী হতে পারি ; বিশ্বের সকল তেজবীর্য পরম একেরই প্রকাশ, সকল শক্তি একেরই শক্তি। প্রকৃতির কর্মজালের অন্তরালে দেবতাদের দেখতে হবে, আরাধনা করতে হবে এক পরমদেবতার নানা শক্তি নাম ব্যক্তিরূপে। ভালো হোক আর মন্দ হোক, স্বীকার করি আর না-করি, অনুকূল হোক আর প্রতিকূল হোক, প্রতীত সকল ঘটনার পিছনে রয়েছে এক অনন্ত চেতনশক্তি, এক কার্যনির্বাহক তেজ, ইচ্ছা বা বিধান, মায়া, প্রকৃতি, শক্তি বা কর্ম। অনন্ত স্রষ্টা যখন তখন তিনি ব্রহ্ম ; স্থিতির বিধাতা যখন তখন বিষ্ণু ; প্রলয়-সাধক কিম্বা নিজের মধ্যে সংহরণ করেন যখন তখন রুদ্র অথবা শিব। পরাশক্তিই কল্যাণময়ী হয়ে ধারণ ও পালনের জন্য ছিলেন কিম্বা রূপ নিলেন জগন্মাতা লক্ষ্মী বা দুর্গার। ধ্বংসের মুখোস পরেও মঙ্গলময়ী তিনি চণ্ডী, কিম্বা কালী, ঘোরবর্ণা

হারিয়েছিল, কারণ তার আধ্যাত্মিক সারবস্তু—তারই বিপরীতে মতবাদের অংশটি নয়—হিন্দু ভারতের ধর্মবানসে জারিত হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও উত্তরাঞ্চলে সে টিঁকে ছিল এবং বিলুপ্ত হয়েছিল শঙ্করাচার্য বা আর কারো দ্বারা নয়, তবে ইসলামের প্লাবনী শক্তির দ্বারা।

জননী। এক ভগবান তাঁর গুণাবলীর নানা রূপে নানা নামে নানা দেবতারূপে প্রকাশ হন। বৈষ্ণবের অলৌকিক প্রেমের দেবতা, শাক্তর লোকাতীত শক্তির দেবতা মনে হয় আলাদা; আসলে তারা একই অনন্ত ব্রহ্মের বিবিধ মূর্তি।* এই সমস্ত নামরূপের যে কোনোটির মধ্যে দিয়ে সাধক জ্ঞানে বা অজ্ঞানে পরম বস্তুর কাছে যেতে পারে, কারণ তাদের ভিতর দিয়ে এবং তাদের অতিক্রম করে শেষে পরম উপলব্ধিতে পৌঁছাই।

একটা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে যে অনেক আধুনিকতাগ্রস্ত ভারতীয় ধর্মবাদী যেক্ষেত্রে আধুনিক জড়পন্থী যুক্তিবাদের সঙ্গে বুদ্ধিগত আপসের ভঙ্গিতে এসব জিনিসকে প্রতীক বলে বুঝিয়ে দিতে সচেষ্ট সেখানে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় মনোভাব হল এদের শুধু প্রতীক নয়, বিশ্বসত্য হিসাবেও দেখা,—যদিও মায়াবাদীদের কাছে এসবও মায়িক সত্য মাত্র। কারণ ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও চৈত্যিক জ্ঞান একদিকে উচ্চতম অকল্পনীয় সমস্ত আর অন্যদিকে আমাদের জড়জীবন এই উভয়ের মধ্যে দুটি অসংলগ্ন বিপরীত মেরুর মধ্যে যেমন তেমন ব্যবধান সৃষ্টি করে নি। তার জানা ছিল চেতনা ও অভিজ্ঞতার অন্যান্য অজড় স্তরাবলি এবং জড়জগতের সব স্থূল সত্যের চেয়ে এই সব জড়াতীত ভূমির নানা সত্য তার কাছে কম বাস্তব ছিল না। মানুষ প্রথমটা তার মানসপ্রকৃতি ও গভীরতর অভিজ্ঞতার সামর্থ্য, তার স্বভাব ও অধিকার অনুসারে ভগবানের দিকে চলে। সত্যের কোন স্তরে, চেতনার কোন ভূমিতে সে পৌঁছতে পারে তা নির্ণয় করবে আভ্যন্তরীণ বিবর্তনের পর্যায়। এর থেকেই দেখা দিয়েছে নানান ধর্মপ্রণালীর নানান বৈচিত্র্য, তবে তার তথ্যভিত্তি কপোলকল্পিত নয়, পুরোহিত বা কবির উদ্ভাবনা নয়, বরং স্থূলজাগতিক চেতনা ও পরমতত্ত্বের অনির্বচনীয় অতি-চেতনার মধ্যবর্তী জড়াতীত জীবনের নানা সত্য।

ভারতীয় ধর্মের ভিত্তিমূলে একটা সবলতম পরিণামের ভাবটি আন্তর আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে সবচেয়ে সক্রিয়। তা হল এই যে ভগবান বা সর্বোত্তমে যেমন বিশ্বচেতনার মাধ্যমে এবং সকল আন্তর ও বাহ্য প্রকৃতি ভেদ করে পৌঁছান যায়, তেমনি তন্ময় বা তাঁকে ব্যক্তিগত প্রত্যেক আত্মা পেতে পারে নিজের মধ্যে, নিজের অধ্যাত্ম অংশে, কারণ এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা এক অনন্য দিব্যসত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে একীভূত কিম্বা অন্ততপক্ষে অন্তরঙ্গভাবে সম্পৃক্ত। ভারতীয় ধর্মের সার হল এমনভাবে বেড়ে ওঠা জীবন-ধারণ করা যাতে সম্যক্‌ভাবে বের হয়ে আসতে পারি এই অজ্ঞান থেকে যা আমাদের মনপ্রাণ থেকে আত্মজ্ঞানটি আড়াল করে রাখে, সচেতন হতে পারি অন্তরস্থ ভগবান সম্বন্ধে। এই তিনটি জিনিস একত্রে হিন্দুধর্মের সমস্তখানি, তার সার অর্থ, এবং কোনো ধর্মমতের যদি প্রয়োজন থাকে তবে সে-ই ধর্মমত।

---

* ভারতীয় বহু ঈশ্বরবাদের এই ব্যাখ্যা পাশ্চাত্যের ভর্ৎসনার উত্তরে আধুনিক আবিষ্কার নয়; গীতায় এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে; আরো আগে উপনিষদেরও তাই মর্ম; বেদের প্রাচীন কালের প্রত্যূষে সেই 'আদিম' কবিদের (আসলে গহনচারী মিস্টিক) বাক্যে তা তো সরাসরি উক্তই রয়েছে।

কঠিন ডানায় ওড়া

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বীরবাহু

পূর্বে বলিয়াছি পাঠানী-উকুন সবেত কম্বলের প্রেমালিঙ্গনে (?) কি ভাবে আমাদের সুখ-নিদ্রায় জেলে রাত কাটিত।

তারপর, সকালবেলা, পাঁচটার সময় জেলের ঘন্টা বাজিত। প্রথমে প্রাতঃকৃত্য ও মুখ-প্রক্ষালন। এই দুইটিই ছিল এক মহা সমস্যার ব্যাপার। কারণ পাঠান দেশে জলের ভয়ানক অভাব (মরুভূমির দেশ বলিয়া)। সে জন্য পাঠানরা খুব কৃপণতার সহিত জল ব্যবহার করিয়া থাকেন।

প্রাতঃকৃত্যের জন্য একটি লম্বা ব্যারাক। তাহার মধ্যখান দিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে—রাস্তার দুই পার্শ্বে মাটির দেয়াল তুলিয়া ছোট ছোট কুঠুরীর মত ঘর। প্রত্যেক ঘরে দুইটি ইঁট পাতিয়া মধ্যস্থলে একটি মাটির সরা বসান আছে। "কাজের" পর জল ব্যবহার করিবার নিয়ম নাই। প্রবেশ পথে দরজার কাছে স্তূপীকৃত পাথরের নুড়ী রাখা থাকিত। এই অধমের পক্ষে কোনওদিন ঐ নুড়ি ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। যতবারই নুড়ি লইতে গিয়াছি ততবারই মনে হইয়াছে নুড়িটি আর কেহ ব্যবহার করিয়া রাখিয়া যায় নাই তো? "লজ্জা-ঘৃণা-ভয়" এই তিনের মধ্যে প্রথম ও শেষেরটি ছিল না কোনও দিন কিন্তু মাঝখানেরটিকে পাঠান-জেলে থাকিয়াও ছাড়িতে পারি নাই। জলপানের নিমিত্ত যে পাত্রটি দেওয়া হইয়াছিল শেষে তাহাই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম।

মুখ-প্রক্ষালনের জন্য জেলের প্রশস্ত উঠানে ইঁট ও সিমেন্ট দিয়া তৈরী চৌবাচ্চা ছিল—তাহার চারিদিকে জলের কল। কল খুলিলে জল চৌবাচ্চার মধ্যে পড়িত। বটের ডাল দিয়া তৈরী দাঁতন থাকিত মুসলমান কয়েদীদের জন্য। অ-মুসলমানগণ যদি দন্ত-প্রক্ষালনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন, তো উঠানের কিছু মাটি আঙ্গুল দিয়া তুলিয়া লইয়া সেই কাজ সমাধা করিতেন। দাঁত তো কোনও প্রকারে মাজা হইল, এরপর মুখ ধুইবেন কোথায়? চৌবাচ্চার কলে না জলে? প্রথমতঃ কল আপনি অত সহজে পাইবেন না। যতই সকালসকাল ঘুম হইতে আপনি উঠুন না কেন, দেখিবেন চৌবাচ্চার প্রতিটি কল এক একজন পাঠান অধিকার করিয়া চৌবাচ্চার ভিতর চরণ দুইখানি ঝুলাইয়া বসিয়া আছে ও পরম নিশ্চিন্তে জাতভাইয়ের সহিত সুখদুঃখের খোশগল্পে মত্ত হইয়া আছে। তাহারা মুখে জল লইয়া সেই জল আবার চৌবাচ্চার ভিতরই ফেলিতেছে—কারণ জল তো নষ্ট করা চলিবে না—জলের যে ভীষণ অভাব! আপনি কি পারিবেন ঐ চৌবাচ্চার জল দিয়া মুখ ধুইতে? পাঠানেরা কেবল নিজের নিজের জাত-ভাইকে কল ছাড়িয়া দিবে। সুতরাং আপনি অনিশ্চিত সময়ের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া অপেক্ষা করুন, আর যদি ক্রোধের উপক্রম খুবই বেশী হয় তবে জেলের কর্তাদের মনে

মনে গালি দিয়া নিজের কুঠুরীতে ফিরিয়া যান। এখানে আপনি যদি বুকে কিছু বলিতে যান তো কয়েকজন পাঠান আপনার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ঐ নোংরা চৌবাচ্চার জলেই আপনাকে চুবাইয়া আনিবে। আর, যদি জেল কর্তৃপক্ষকে কিছু বলিতে যান তো তাঁহারা আপনার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার 'বাহার' দেখিয়া হাসিয়া কুটিপাটি হইবে। সুতরাং 'ভগবানের এ-ও এক অভিব্যক্তি' এই ভাবিয়াই তখনকার মত নিজের ক্রোধকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতাম।

যাই হোক, পাঠানদের চরিত্রের ইহা (অপরিচ্ছন্নতা) একটি ক্ষুদ্র অংশ—তাহাও তাহার বাহিরের প্রকৃতির—যাহার জন্য অধিকাংশ দায়ী তাহার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও দেশের জলকষ্ট। কিন্তু ইহাদের চরিত্রের অন্য বৃহত্তর অংশটির দিকে যখন দেখি তখন সেখানে এক বলিষ্ঠ, দৃঢ় ও দুঃসাহসী অথচ এক স্বভাবগত সরল মানুষকে দেখিতে পাই। ইপির-ফকীর ও জোলাবুদ্দীন এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ পাঠান ছিলেন। এঁদের কথা যেটুকু মনে পড়িতেছে তাহা না লিখিলে, নিজের কাছে নিজে দোষী বনিয়া যাইব, কারণ এই সুবিখ্যাত দুর্দ্ধর্ষ জাতিটির গুণ অনেক এবং তাহা যখন জেলে একসঙ্গে থাকিয়া জানিয়াছি তখন দোষত্রুটি বাদ দিয়া গুণগুলি প্রকাশ করিতে চাই।

কোহাট জেলে একজন পাঠান ভদ্রলোক বন্দী ছিলেন তাঁহার মুখে ইপির-ফকীর, জোলাবুদ্দীন, অবলজাদা, রাংগাধীন প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাজবিদ্বেষী পাঠানের কথা জানিতে পারি যাঁহারা নানাভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়িয়া গিয়াছেন ও যাঁহারা লড়িতেছেন তাঁহাদের নানাভাবে সাহায্যও করিয়াছেন।

ঐ পাঠান ভদ্রলোকটি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ডাঃ খান্ সাহবের দূরসম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি পেশাবর হইতে বি-এ পাশ করেন। তিনি ইংরাজীভাষা জানায় আমাদের খুব সুবিধা হইত। আমরা প্রত্যহ বৈকালে কোনও এক নির্জন স্থান বাছিয়া লইয়া দুইজনে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা প্রকার গল্প করিতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার নিকট হইতে পাঠানদের সাধারণ জীবনযাপন প্রণালী যতটা সম্ভব জানিয়া লওয়া। ভদ্রলোকটি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী ছিলেন (কারণ ব্যক্তিগত কারণে তিনি অন্য এক পাঠানকে হত্যা করেন)। কিন্তু একেবারে নির্বিকার ও নিশ্চিন্ত মনে থাকিতেন ও রোজ আনার সহিত বৈকালে হাসি-গল্পে সময় কাটাইতেন। যেন, মৃত্যুর জন্য জেলে খুশীমনে অপেক্ষা করিতেছেন—তাঁহার চরিত্রের এই অসাধারণ নির্ভিকতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

সেই সময় কোহাট জেলে একজন পাঠান ওয়ার্ডার ছিলেন, নাম অবলজাদা। ইনি প্রথমে জেলের একজন কয়েদীই ছিলেন। পরে নিজগুণে ওয়ার্ডার ও আরও পরে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মহাশয়দের খাস বেয়ারা হইতে পারিয়াছিলেন। কোহাট জেলে আসিবার পূর্বে কোহাটের কাছাকাছি এক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন—যৌবনকালে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ শুরু হইবার কিছুদিন পূর্বে ইংরাজের অধীনে "ফ্রনটিয়ার্স ফোর্স রাইফেল" নামক পদাতিক বাহিনীতে যোগ দেন। প্রথমে জাপানের বিরুদ্ধে বিশর যুদ্ধে যান। যুদ্ধের অবসানে ভারতীয় পদাতিক বাহিনী হইতে ছুটি পাইয়া নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসেন কিন্তু নিজের রাইফেলটি সঙ্গে করিয়াই ফিরিয়া আসিলেন। গ্রামে একটি রাইফেল পৌঁছিয়াছে এ খবর ইপির-ফকীরের অনুচরেরা জানিতে পারিলেন ও অবলজাদার নিকট যাতায়াত শুরু

করিলেন। এদিকে ঐ গ্রামে কয়েকটি পাঠান ছিল যাহারা ইংরাজের হইয়া গুপ্তচরবৃত্তি করিত। পাঠান গুপ্তচরের মারফৎ সব খবর পাইয়া ইংরাজ পলিটিক্যাল অফিসাররা অবলজাদাকে রাইফেলটি ফেরৎ দিতে বলে। অবলজাদা সব বুঝিতে পারিয়া ঐ রাত্রেই গুপ্তচরটিকে গুপ্তচরদের স্বর্গে পাঠাইয়া দিলেন ও নিজেই গিয়া পুলিশের কাছে ধরা দিলেন। অবলজাদার কুড়ি বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হইয়া গেল। প্রথম পাঁচ বৎসর কয়েদী হিসাবে খুব ভাল রেকর্ড থাকায় ও জেলের মধ্যে আর কোনও প্রকার গোলমাল কিছু না করায় তিনি প্রমোশন পাইয়া জেলের ওয়ার্ডার হইলেন ও পরে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের বেয়ারা হন—এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

অপর একজন পাঠান কয়েদী সেই সময় কোহাট জেলে ছিলেন তাঁহার নাম জোনাবুদ্দীন। তাঁহারই মুখে ইপির-ফকীরের (বৃটিশবিদ্বেষী পাঠানদের দলপতি) কথা অল্প একটু জানিতে পারি। ইতি ভারত-বিভাগের পর পাকিস্থানের বিরুদ্ধেও বহুদিন লড়াই করিয়াছিলেন। তাঁহার দলে দলভুক্ত হইতে হইলে কেবল ইংরাজ-বিদ্বেষী হইলেই চলিত—সে যে জাতিই হোক্ বা যে ধর্মীয়ই হোক। তাঁহার দলে হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন বাদ-বিচার ছিল না। এ কথা সকলেই জানেন যে, এই ইপির-ফকীরের দলের লোকেরাই নেতাজী সুভাষ বোসকে পেশাবর কালীবাড়ী হইতে কাবুলে ইটালিয়ান এমব্যাসী পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে ও গুপ্তচরদের দৃষ্টি বাঁচাইয়া বোসকে নিরাপদে রাখিতে কত সাহায্য করেন।

এই জোনাবুদ্দীনকে যখন জেলে দেখি তখন তাঁর চেহারা ছিল দীর্ঘকায়—আবক্ষ লম্বিত পাকা দাড়ি, কেশ-বিরল মস্তক, ঈগল-পক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় লম্বা চিকন নাক, গায়ের রং গৌরবর্ণ। তাঁহাকে কোনও সময় শিথিল অবস্থায় দাঁড়াইতে বা বসিতে দেখি নাই। পদাতিক বাহিনীর অফিসারদের মত, কথা বলিবার সময় সর্বদা হাঁটিতেন বা এ্যাটেনশন্ (attention) অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া কথা বলিতেন। তাঁহার কাছে ইপির-ফকীরের কথা কিছু জানিতে পারি।

ইপির-ফকীর জাতিতে পাঠান। তিনি লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, পাশ করিয়া কিছুদিন ইংরাজের অধীনে চাকুরী করেন। কিন্তু ইংরাজ-উপরওয়ালার অন্যায় আচরণে বিরক্ত হইয়া চাকুরীতে ইস্তফা দেন ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যাইয়া বিদ্রোহী পাঠানদের সংঘবদ্ধ করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। ইংরাজরা অবশ্য সে সময় বলিত যে রাশিয়ানরা নাকি ইপির-ফকীরের দলকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিত—ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য।

তারপর জোনাবুদ্দীন কি ভাবে ইংরাজের হাতে ধরা পড়েন সেই গল্পে আসা যাক্। ইহা তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি। একদিন তিনি ও তাঁহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু রাংনাধীন, ইংরাজদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া দুইটি রাইফেল বন্দুক হাতে লইয়া এক দুর্গম গিরিশৃঙ্গে বসিয়া দূরে পাঠান এলাকার মধ্যে একটি রাস্তার উপর নজর রাখিতেছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁহারা নিচে রাস্তা দিয়া ইংরাজের একটি রসদবাহী খচ্চর-শ্রেণী যাইতে দেখিতে পাইলেন। খচ্চরশ্রেণীকে আগলাইয়া চলিয়াছে ইংরাজ পল্টন বাহিনী। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে রসদের মধ্যে গোলা-

বান্দুল অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া প্রচুর গনও আছে। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ইপির-ফকীরের নিকট কৌশলে এই বার্তা প্রেরণ করিলেন। তারপর শৈলশৃঙ্গ হইতে রাইফেলের গুলি দিয়া একটি একটি করিয়া ইংরাজ সৈন্যকে মারিতে লাগিলেন। ওদিকে ইংরাজসৈন্যের কাপ্তেন যখন বুঝিতে পারিলেন যে রাইফেলের গুলি প্রত্যেকবার মোটে একটি করিয়াই আসিতেছে অর্থাৎ বিপক্ষ দলে মোটে একটি কি দুটি লোকই মাত্র আছে তখন তিনি পাহাড়টির চতুর্দ্দিকে ব্যূহ তৈরী করিয়া একসঙ্গে পাহাড়টির চূড়া লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িতে সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন। এইরূপ হঠাৎ আক্রমনের সময় যুদ্ধের কৌশল হইল বিপক্ষকে তখনই পাল্টা আক্রমণ না করিয়া নিকটস্থ ইংরাজ বা ভারতীয় বিমান বাহিনীকে খবর দিয়া আক্রমণকারী পাঠানদের উপর প্রচুর গুলিবর্ষণ করিয়া তাহাদের কাবু করিয়া ফেলা। তারপর সৈন্যদল তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পাল্টা আক্রমণ করিবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন হইল না, কারণ বিপক্ষ পাঠানদলে মোটে কয়েকজনই আছে ইহা ইংরাজকাপ্তেন বুঝিতে পারিলেন। তিনি সেইজন্য পাহাড়টির চারিদিক হইতে গুলি চালাইতে চালাইতে পাহাড়ের চূড়ার উপর উঠিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি গুলি পাহাড়ে লাগিয়া ছিটকাইয়া জোলাবুদ্দীনের বুকে বিদ্ধ হইল, ইহাতে রক্তপাত হইতে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন তিনি সঙ্গী রাংনাধীনকে তাহার রাইফেলটি গুলি ভর্ত্তি করিয়া তাঁহার হাতে দিতে বলিলেন। তিনি দু'হাতে সামনের দিকে দুই রাইফেল চালাইতে লাগিলেন ও রাংনাধীনকে বলিলেন পিছন দিয়া পলাইয়া গিয়া দলপতি ফকীরকে খবর দিতে যে এই কনভয়তে যা কিছু আছে সব আমাদের কাড়িয়া লইতে হইবে। এরপর তিনি একা দুইটি রাইফেল চালাইয়া এক এক গুলিতে একটি একটি করিয়া ইংরাজ সৈন্য মারিতে লাগিলেন। এদিকে ভারতীয় বিমান বহরের একটি বিমান ইংরাজদের সৌভাগ্যক্রমে অকুস্থল দিয়া যাইতেছিল। বৈমানিক দুইজন ছিলেন, তাঁরা নিচের দিকে তাকাইয়া সব বুঝিয়া ফেলেন ও নিকটস্থ বিমান বহরে খবর দিয়া আরও দুই তিনখানি বিমান আনয়ন করিয়া পাহাড় টির চূড়ার উপর বোমাবর্ষণ করিতে লাগিল। অবশ্য বোমা-বর্ষণের পূর্ব্ব হইতেই জোলাবুদ্দীন প্রচুর রক্তক্ষরণের জন্য সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোমাতে তাঁহার শরীরের কোনও ক্ষতি হয় নাই। বিমানগুলি চলিয়া গেলে বীর ইংরাজ সেনারা সিংহবিক্রমে পাহাড়ের চূড়ায় আসিয়া দেখে মোটে একজন বলিষ্ঠ পাঠান একটি প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার দেহের একপাশে প্রচুর রক্ত পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কাপ্তেন তাড়াতাড়ি তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন, কারণ ইহাকে বাঁচাইলে ইপির-ফকীরের কোনও হদিশ পাওয়া যাইতে পারে; না হইলে ইহার যদি মৃত্যু হয় তো ইপির-ফকীরের কোন খবরই আর পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ইংরাজরা ইহা সঠিকভাবে জানিত না যে, যে আহত পাঠানকে তাহারা পাহাড়ের চূড়া হইতে ধরিয়া আনিয়াছে সে-ই ইপির-ফকীরের দক্ষিণহস্ত জোলাবুদ্দীন কি না। তাহারা শুধু এইটুকু জানিত যে ইপির-ফকীরের পরই জোলাবুদ্দীনের স্থান এবং নানারূপ কানাঘুষায় তাহাদের সন্দেহ হইয়াছিল যে হয়ত তাহারা জোলাবুদ্দীনকেই ধরিতে পারিয়াছে। কিন্তু একবছর ধরিয়া বহু চেষ্টা বহু কৌশল প্রয়োগ করিয়াও তাহারা জোলাবুদ্দীনকে সনাক্ত করিতে পারে নাই। ইংরাজের তোষামোদকারী ও ইংরাজের অর্থপ্রলোভনে প্রলোভিত

বহু পাঞ্জাবী মুসলমান এ ব্যাপারে ইংরাজকে সাহায্য করিতে আসিয়া সফলকাম হইতে পারে নাই।

এদিকে রাংনাধীন পাঠানকে ধরিবার জন্য ইংরাজ তখন সহস্র টাকার পুরস্কার ঘোষণার প্রতিশ্রুতি দিয়া এক নোটিশ বাহির করিয়া দিয়াছে। সেই সময় রাংনাধীন তাঁহার দেশে ভাইদের কাছে বেড়াইতে যান—তাঁহার ভাইয়েরা সহস্র টাকা লাভের এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়িল না। তাহারা রাংনাধীনকে ইংরাজের হাতে ধরাইয়া দিল। ইংরাজও তৎক্ষণাৎ রাংনাধীনকে কোহাটে লইয়া আসিল জোলাবুদ্দীনকে সনাক্ত করিবার জন্য।

জেলের প্রশস্ত উঠানে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন কয়েদীকে লাইনে দাঁড় করাইয়া এই সনাক্তকরণ প্যারেড হইত। আমাদেরও এই প্যারেডে গিয়া লাইনে দাঁড়াইতে হইত। একবার জোলাবুদ্দীনকে একটি বালক পাঠান ও সার্জেন্ট ভাদুড়ীর মধ্যস্থলে রাখিয়া রাংনাধীনকে দুইজন পাঞ্জাবী মুসলমান ওয়ার্ডার ও একজন ইংরাজ কাপ্তেনের তত্ত্বাবধানে সনাক্তকরণ প্যারেডে আনা হইল। এই সময় সর্বদা দেখিয়াছি জোলাবুদ্দীন অতি কৃশ-দুর্বল এবং বৃদ্ধের ন্যায় সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া দাঁড়াইতেন। তাঁহার লম্বা দাড়ী সারা বুকী পর্যন্ত নামিয়া যাইত। তাঁহার সেই বলিষ্ঠ দুর্ধান্ত পাঠানের চেহারার সঙ্গে এই চেহারার কোনও মিল খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। আর রাংনাধীনও প্রত্যেকের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে পাঠানী ভাষায় চিৎকার করিয়া বলিত—'নিস্তা, নিস্তা', অর্থাৎ 'এখানে নেই'। ইংরাজ সাহেবও ক্লান্ত হইয়া সনাক্তকরণ প্যারেড বন্ধ করিয়া দিলেন। আমরাও যে যার ঘরে চলিয়া গেলাম—জোলাবুদ্দীন পাঠানকে সনাক্ত করা গেল না।

এবার 'বিচার-প্রহসন'—যেটুকু মনে পড়িতেছে।

একটু পূর্ব কথায় ফিরিয়া যাইতেছি, আশাকরি ইহাতে পাঠকের খুব বেশি আপত্তি হইবে না।

আমাদের পাঁচজনকে (মোঃ লিঃ হাসান ছাড়া) তো ষ্টেশন কম্যাণ্ডার উইং কম্যাণ্ডার মেহের সিং তাঁর অফিসে ঘটনার পরের দিন (অর্থাৎ ১৭ই মে, ১৯৪৩ সাল) ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার সামনে উপস্থিত হওয়া মাত্রই প্রত্যেকের পাশে একজন করিয়া রক্ষী (guard) আসিয়া দাঁড়াইল। উইং কম্যাণ্ডার মেহের সিং আমাদের বলিলেন—তোমরা তোমাদের টুপী খুলিয়া ফেল। তোমাদের গ্রেফতার করা হল। পুনরাদেশ পর্যন্ত তোমরা সকলে 'বন্দী"।

আমাদের বলা হ'ল, প্রত্যেকে একদিনের মত কাপড়জামা সঙ্গে নাও, তোমাদের এয়ারফোর্স ক্যাম্পএর বাইরে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আমরা তৈরী হইয়া পুনরায় ষ্টেঃ কঃএর অফিসের সামনে আসলাম। আসিয়া দেখি একটি ষ্টেশন ওয়াগন অফিসের বাহিরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ষ্টিয়ারিং-এ আছে জনৈক অফিসার। গাড়িতে উঠিয়া উক্ত অফিসারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমাদের কোথায় যাইতে হইবে? তিনি বলিলেন—"প্রশ্ন করিও না"।

আমাদের আনা হইল পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ক্যাম্পে। পথে, নিজেদের মধ্যে কোনও বাক্যালাপ করিতে দেওয়া হইল না। আর্মি-ক্যাম্পে (Army camp)-এ আসিয়া আমাদের পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করা হইল। আর্মি গার্ড (army

guard)-রা আমাদের প্রত্যেককে ভিন্নভিন্ন কোয়ার্টার্সে লইয়া গেল এবং প্রত্যেকের অপর ব্যক্তির সহিত আলাপ করা বন্ধ করিয়া দিল। জনৈক বৃটিশ আর্মি-অফিসার আমাদের সাবধান করিয়া দিল, আমরা যেন কাহারও সঙ্গে কোনওরূপ বাক্যালাপ না করি। কিছু বলিবার থাকিলে গার্ডদের মারফৎ অর্ডারলি-অফিসার (orderly officer বা officer on duty)কে জানাইতে হইবে। এখানে আসিয়াই উইং কম্যাণ্ডারএর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া একটা দরখাস্ত দিলাম। কিন্তু কোনও রহস্যজনক কারণে সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইল না, এমনকি এই দরখাস্তের কোনও উত্তরই পাই নাই। যদিও বিমান-বাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী আমরা এই সাক্ষাতের অধিকারী।

অতঃপর শুরু হইল জিজ্ঞাসাবাদ। জনৈক মেজর, আমির জজ অ্যাডভোকেট জেনারাল এর পক্ষ হইতে আমাদের প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন, "তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ টিকিবে কি না সন্দেহ। উইং কম্যাণ্ডার মেহের সিং কেন মিছিমিছি এ'রকম সোরগোল করিলেন, তিনিও তো একজন 'ভারতবাসী' "।

ইহার পর আসিলেন বিমান বাহিনীর পুলিশের তরফ হইতে দুইজন ব্যক্তি। একজন ওয়ারাণ্ট অফিসর আর একজন সার্জেন্ট। জিজ্ঞাসাবাদের নামে সার্জেন্টটি ধমকাইয়া কথা বলিতে শুরু করিলেন। ইহাতে তীব্র আপত্তি করায় উর্দ্ধতন ওয়ারান্ট অফিসারটি সার্জেন্টকে সংযত করিলেন। বলিলেন, ধমকাইবার অধিকার তোমার নাই—যেটুকু জিজ্ঞাস্য আছে, বিনীতভাবে জানিয়া লও।

কিছুদিন পরে বিমান-বাহিনীর জনৈক অফিসার (ফ্ল্যা লে: আদ্লাল) আসিয়া আমাদের বলিলেন যে গ্রুপ হেড্ কোয়ার্টার্স কোর্ট-মার্শাল কন্ভেন্ (convenc) করিয়াছেন। তিনি 'সামারি অব্ এভিডেন্স্' (summary of evidence) নিতে আসিয়াছেন। এই প্রথম সরকারীভাবে জানিতে পারিলাম যে, আমাদের কোর্ট-মার্শাল (বিচার) হইবে। পর-পর কয়েকদিন আসিয়া তিনি সাক্ষ্যপ্রমাণের সারাংশ লিখিলেন।

ইহার পরেই আমাদের অন্য একটা আর্মি-ক্যাম্পে (army camp) স্থানান্তরিত করা হইল। একদিন আমাদের কোর্ট-মার্শালের তারিখ জানানো হইল। তারিখ অনুযায়ী আমাদের এক একজনের বিচার। এই বিচার এয়ার-ফোর্স ষ্টেশনেই অনুষ্ঠিত হইল।

এই বিচারের প্রাথমিক পর্য্যায়ের পরই আমাদের অন্য ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করা হইল। বিচারের রায় বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত এইখানেই অপেক্ষা করিতে থাকিলাম।

একদিন সকলকে পুনরায় এয়ার ফোর্স ক্যাম্পে আনা হইল। ষ্টেশন অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ্ অফিসার, কোর্ট-মার্শালের রায় পড়িয়া শুনাইলেন। বিচারে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করিয়া সকলকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হইল এবং প্রত্যেককে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হইল।

আমাদের মধ্যে ফ্ল্যা: সার্জেন ভাদুড়ীকে প্রথম দিকে কোহাট জেলে রাখা হয়। পরে আবোটাবাদে জেলে পাঠানো হয়। আরও কিছুদিন পরে উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলে আনা হয়, খালাস পাবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই রংপুর জেল হইতে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মুক্তি পান।

খালাস পাবার পর Airways India Ltd.-এ, শ্রীভাদুড়ীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তিনি তখন সেখানে চাকুরী করিতেছেন। পরে অবশ্য তিনি (১৯৫৩ সনে) I.A.C.তে যোগদান করেন। বেশ কিছুকাল পরে হঠাৎ জানিতে পারি তিনি চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া ১৯৬২ সাল নাগাদ পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে করুণাময়ী শ্রীমায়ের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

(অসমাপ্ত)

সাধক কবি নিশিকান্ত রচিত

কালজয়ী কাব্য

লীলাঞ্জন

ইন্দ্র দুগার অঙ্কিত আটখানি বহুবর্ণ চিত্র ও বিবিধ রেখাচিত্রে অলঙ্কৃত

পরিবেশনে :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশনী বিভাগ
পণ্ডিচেরী—২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

বিক্রয়কেন্দ্র :

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

34-3720

With the best Compliments from:—

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

শ্রীঅরবিন্দায়ণ

নীরদবরণ

(শ্রীঅরবিন্দের সচিত্র জীবন, কর্ম ও সাধনা)

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
মূল্য চার টাকা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

34-2665 Gram: Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড :	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড :	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০
অষ্টম খণ্ড :	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়	২·০০
	প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড একত্রে বাঁধাই	২০·০০

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী সংস্করণ

Words of Sri Aurobindo	1st Series	2·50
,, ,,	2nd Series	4·00
যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০
উত্তরপাড়া অভিভাষণ	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম		২·০০
গীতার ভূমিকা	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
মাতৃবাণী	শ্রীমা	১·৫০
মায়ের আলাপ	শ্রীমা	৩·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী (৩য় সংস্করণ)		২·০০
মা কি বলেন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·০০
শতাব্দীর প্রণাম		৩·৫০
স্মৃতির পাতা (২য় পর্যায়)	,, ,,	৪·০০
শ্রীঅরবিন্দায়ন (সচিত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন, বাণী ও সাধনা) (২য় সং)	নীরদবরণ	৪·০০
অরবিন্দ-প্রসঙ্গ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১·৮০
শ্রীমা-প্রসঙ্গ	কে, আর, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	২·৮০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও যোগ	প্রবোধকুমার সেন	৬.০০
বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা	চারুচন্দ্র দত্ত	৩·৫০
কে এই মা ?	পশুপতি ভট্টাচার্য	৫·০০
দিব্য জীবনের সন্ধানে	,,	৩·৫০
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মযোগ	সুধা বসু	৫·০০
Sri Aurobindo on Man	D. P. Chattopadhyaya	1·80
শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ		৭·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা–১২

ফোন : ৩৪-২৩৭৬

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field:
SREEPORE BAGHARGHOLE
P. O. BONHOOGHLY, 24 PARGANAS

Head Office:
34/1, Puddapukur Road
CALCUTTA 20

PHONE : 47-2869

FOR
NEAT PRINTING
AND
QUICK SERVICE

Specialist in Colour Print

Please Contract :—

Mahamaya Press

2, Bhupendra Bose Ave., Cal-4
Phone : 55-9124

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য...

চারু ও কারুশিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলার কী বৈচিত্র্যই না রয়েছে আমাদের স্বদেশে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে এই বিচিত্র ভারতভূমি গঠিত। রেলপথ প্রতিষ্ঠার আগে যে সব অঞ্চল ছিল বিচ্ছিন্ন ও দুরধিগম্য তাদেরই একসূত্রে গ্রথিত ক'রে এক বিচিত্রবর্ণ পুষ্পহারের সৃষ্টি করেছে আমাদের রেলপথ— ভৌগলিক সান্নিধ্যে তাদের অন্তরঙ্গ করেছে। ভৌগলিক অখণ্ডতাকেও অতিক্রম ক'রে যে আত্মিক ঐক্যে আজ সারা ভারতবর্ষ প্রাণময়—তা' আন্তঃআঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সংযোগের জন্যই সম্ভবপর হয়েছে।

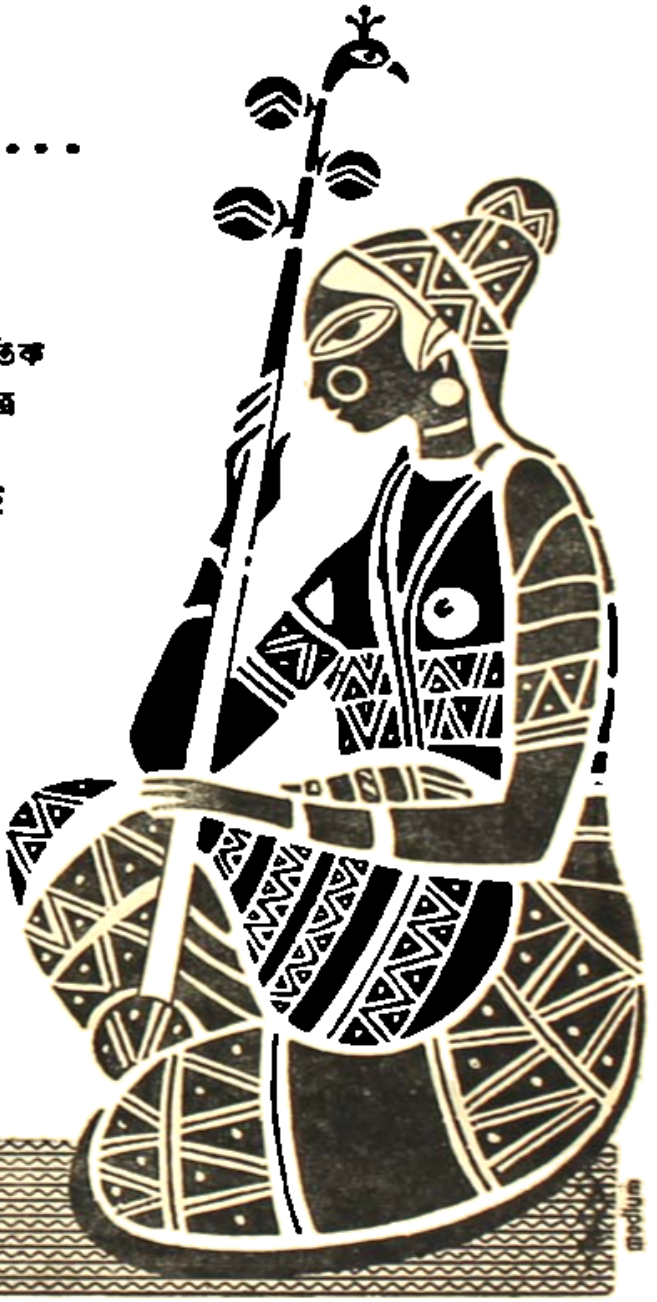

পূর্ব রেলওয়ে

It is the darkest nights that prepare the greatest dawn.
—Sri Aurobindo

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers

149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)

Gram : UNIBOX **Phone :**

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works (P.) Ltd.

90, BENARAS ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-2434

শ্রীঅরবিন্দ
জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

(আগষ্ট ১৯৭২)

সম্পূর্ণ রচনাবলী

ইংরাজীতে ৩০ খণ্ডে সম্পূর্ণ
সুশোভন রাজ সংস্করণ—১০০৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)
সুলভ সংস্করণ—৭৫৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)

বাংলায় : শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলায় রচিত (গীতার ভূমিকা, ধর্ম ও জাতীয়তা, কারাকাহিনী, পত্রাবলী, বিবিধ রচনাদি) দুর্লভ খণ্ড সহ অন্যান্য রচনার নয় খণ্ডে অনুবাদ। ১৬৲ টাকা

আঞ্চলিক ভাষা
হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠি, ওড়িয়াতেও অনুবাদ

বুক সেলস্ ডিপার্টমেন্ট, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

21 JUL 1972

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

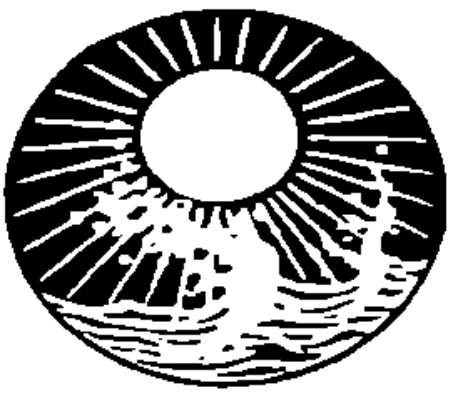

২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৫

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৩)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাবিত্রী		৫
মায়ের উক্তি	...	৯
বেদমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৩
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী	...	২২
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	২৭
বসুধার ভাষণ	দীপা মিত্র	৩৩

বর্ত্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

He has come to
bid the earth to
prepare for its
luminous future

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

২য় পর্ব—১১শ সর্গ

(বৃহত্তর মনোময় লোক এবং তাদের দেবতাবৃন্দ)

(৩)

উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে শ্রেণীবদ্ধ এক সূক্ষ্মদেহী অধিদেবসঙ্ঘ,
আকর্ণবিস্তৃত তাদের নয়নমণ্ডল, দৃষ্টি তাদের খোঁজে অদৃশ্যকে।
মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের জ্যোতি প্রোজ্জ্বল
তাদের চক্ষুগর্ভে গভীর নীরবতা পার হয়ে ;
মানসলোকে নিবাস তাদের, সত্যকে জানে অন্তর হতে ;
অন্তর্মুখী দৃষ্টি তাদের একাগ্র অন্তরতলে,
ভেদ করে পার হয়ে যায় কাল-পরিণামের আবরণ
আর বাহ্যবস্তুর কঠিন আধার এবং আকার।
মানস-ধারণার সঙ্কীর্ণ জালপাশে বাঁধা যায় না যা
সাক্ষাৎ-দৃষ্টি আবিষ্কার করে, করে মুষ্টিগত ; চক্ষুষ্মান চিন্তা তাদের
ভরে দেয় শূন্যস্থান যত রেখে গিয়েছে সন্ধানী ইন্দ্রিয়াবলী।
স্বপতি তারা যত সমুচ্চ সম্ভাবনার,
অসম্ভবের দক্ষ কারিগর,
আনন্ত্য সংখ্যাবলীর শাস্ত্রজ্ঞ তারা
অজ্ঞেয় সত্যের সূত্রকার,
রহস্যময় প্রতিজ্ঞাবলীর মন্ত্রকারক তারা
অজ্ঞাতকে যুক্ত করে দেয় বাহ্য জগতের সঙ্গে।
সহচর তারা কালাতীত মহাশক্তির সেবাপরায়ণ,
অনুধাবন করে তারা তাঁর কর্মাবলীর চক্রধারা ;
বাক্যাতীত অন্তঃপুরের প্রাচীর তাঁর পার হয়ে
মন তাদের নিগূঢ় মনের মধ্যে তাঁর প্রবেশ করে,
তাঁর গুপ্ত চিন্তাবলীর চিত্রসব অঙ্কিত করে ;
তাঁর নিগূঢ় সঙ্কেত আর চিহ্নাবলীর পাঠ উদ্ধার করে তারা,
গোপনে রক্ষিত কর্মসূচী তাঁর ধরে রাখে লিখিত পত্রে,
তাঁর রহস্যময় গতিপথের প্রতিটি দিক-পরিবর্তনের
আবিষ্কার করে হেতু আর অটুট বিধান।

অদৃশ্য দৃশ্য হয় শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে,
ব্যাখ্যালাভ হয় বিপুল এই নিশ্চেতনার পরিকল্পনার,
দুঃসাহসে শূন্যের প্রসারে টেনে দেওয়া হয় রেখাবলী :
অনন্ত হয়ে ওঠে সমচতুষ্কোণের আর ঘনাকারের সমাহার।
প্রতীক আর অর্থ সাজিয়ে ধ'রে,
লোকাতীত মহাশক্তির গতিরেখা এঁকে তুলে,
বিশ্ববিধির গুপ্তমন্ত্র বাঁধে তারা সূত্রাকারে,
প্রাণগতির কারুকার্যের আবিষ্কার করে সাম্যরেখা
আর গড়ে তোলে তার যাদু আর রহস্য।
বৃহত্তের উপরে এঁটে দেয় তারা খণ্ডিত জ্ঞানের নিয়মাবলী,
সীমাবদ্ধ চিন্তার পদানুক্রমে যুক্ত করে দেয়
অসীম চেতনার বন্ধনহীন ন্যায়বিধি,
প্রকৃতির নৃত্যের গুপ্ত ছন্দে ধরে দেয় ব্যাকরণের বাঁধন,
সমালোচনায় বাঁধে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নাটকে যে কাহিনী,
যা কিছু রয়েছে তার মূল্যার্থে রূপ দেয় আকারে ও সংখ্যায় :
বিশ্বপুরুষের অন্তঃবিশ্লেষণ
হল রেখাঙ্কিত, তার গুপ্ত রহস্য সাক্ষাতে প্রকটিত,
আর পাঠ করা হল অদ্বিতীয়ের অজ্ঞাত ব্যাধিনিদান।
ওজন করা হল সম্ভাব্যের ব্যবস্থাবলী,
পলাতক যত সম্ভাবনার আকস্মিক সাক্ষাৎ,
বাস্তবের গণনাতীত সমষ্টির গণনা করা হল,
নির্বন্ধের অঙ্কশাস্ত্রসিদ্ধ চিত্র অঙ্কিত হল,
একটা স্থির ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধা হল অদ্বিতীয়ের ত্রিধা ক্রিয়া।
অনাবৃত অদৃশ্য অগণিত শক্তিসঙ্ঘ
অকস্মাৎ ঘূর্ণিপাকে ছুটেছে যদৃচ্ছার হাত থেকে
কোন এক বিপুল অলঙ্ঘ্য অনুজ্ঞার আদেশে যেন
তাদের জটিল সঙ্কল্প সব মিলে গড়ে তুলেছে একত্ব এক।
জ্ঞান এক, অজ্ঞাত তাদের কাছে, পাঠ করে তাদের মনের কথা,
তাদের বিশৃঙ্খলা পিটিয়ে ভরে দেয় এক সূত্রের মধ্যে
তাদের অন্তর্গত বিরাট শক্তির উচ্ছৃঙ্খলা হতে উদ্ধার ক'রে,
তাদের লক্ষ লক্ষ পথের অভ্যাস অনুসরণ করে,
প্রচ্ছন্ন অবিকল্প রচনায় এক
প্রতিটি ক্ষীণতর রেখা আর চিহ্ন ধরে স্বতন্ত্র ক'রে,
মহান্ অদৃশ্যের অগণিত ভাব-বিপর্যয়ের ভিত্তর হতে
আবিষ্কার করে তারা নিয়তির লিপিকা-গণিত।
বিশ্ববিদ্যার খরোজ্জ্বল গর্ব নিয়ে

মনের জ্ঞান মাথা তুলে দাঁড়ায় সর্বজ্ঞের শক্তি ছাড়িয়ে
শাশ্বতের সমূর্ধ্ব শক্তিরাজি উড়ে চলে যায়,
ক্ষণেক স্তম্ভিত হয়ে তাদের রেখাহীন ব্যোমপ্রসারে
নেমে আসে তাদের দূর চক্রায়ণ হতে চিন্তার ইশারা নেনে নিয়ে
রহস্য-আধার প্রতিটি ভাগবতসত্তা বাধ্য হয়ে ব্যক্ত করে আপন রূপ,
আপন নির্দিষ্ট গতিরেখায় চলে প্রকৃতির লীলায়,
ঘুরে ফেরে কোন এক দ্যূতক্রীড়কের ইচ্ছায় তার অঙ্গুলিচালনায়
বিশ্বনিয়তির প্রসারিত ছকের পরে।
নির্বন্ধের সুবিস্তৃত পদক্ষেপ-পারম্পর্য
পূর্ব হতে নির্দিষ্ট, সেখানে ভগবানের প্রতিটি কর্ম প্রতিটি চিন্তার মূল্য
ওজন করে ধরেছে হিসাবী মন,
তার অঙ্কশাস্ত্রের সর্বশক্তিমত্তা দিয়ে যাচাই করেছে,
অলৌকিকের দিব্য আভা হারিয়েছে তা,
একটি সংখ্যামাত্র তা বিশ্বের এই সমষ্টিগর্ভে।
বিশ্বমাতার খেয়াল আর বিদ্যুৎপ্রভ ভাবলেখা,
উৎসারিত তার সর্বজ্ঞাননয় নির্বাধ আনন্দ হতে
তার মধুর আবেগাকুল হৃদয়ের মুক্ত স্রোতে,
হারিয়েছে এখন তাদের সকল বিস্ময়, বদ্ধ তারা কার্যকারণের শৃঙ্খলে ;
অলৌকিক মূর্তি তার পরিণত এখন ধাতুময় বিগ্রহে,
বিশ্বভূত বিপুল গতিধারা বাঁধা পড়েছে সেখানে,
একটা আদর্শ নুখনণ্ডলের নির্ভুল রেখাকারে
হারিয়ে গিয়েছে তার চক্ষুপলকের স্বপ্নছায়া—
বহে না তারা আর তাদের বঙ্কিমরেখায় অনন্তের স্বপ্নাবলী,
লুপ্ত নয়নের সেই মোহন যাদু ;
বিপুল তার হৃদয়-সাগরের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গাবলী
ধরে রেখেছে তারা বিধিবদ্ধ স্পন্দনের সূত্রে
নিবিড় উদ্দেশ্য যত তার আপনা হতে আপনি রেখেছিল ঢেকে সে
অবনত এখন আত্ম-প্রকটিত তাদের গোপন স্বীকারোক্তি আশ্রয়ে।
জগতের জন্ম আর মৃত্যুর দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করেছে তারা,
অনন্তের ব্যাসরেখা টেনে দিয়েছে তারা,
মেপে দিয়েছে অদৃশ্য শিখরের সুদূর আনত অয়ন,
দৃষ্টিগোচর করে ধরেছে অতল অলক্ষ্য গভীরতা সব—
সবই যেন জানা হয়ে গিয়েছে কালক্রমে যা কিছু হতে পারে।
সব কিছু দৃঢ়নিবদ্ধ সংখ্যায় আর নামে আর রূপে ;
অকথিত নাই কিছু, নাই কিছু অগণিত।
জ্ঞান তবু তাদের শূন্যতার বৃত্ত দিয়ে ঘেরা

বহু সত্য তারা আবিষ্কার করেছে, ধরে রেখেছে, তবু সেই এক সত্য নয় :
পরমপদ অজ্ঞাত তাদের।
অতিরিক্ত জ্ঞানের ফলে পূর্ণের জ্ঞান তাদের আর হল না
বিশ্বের অতল হৃদয় অতলেই রয়ে গেল,
বিশ্বাতীত রেখে দিল নিজের কাছে নিজের গুপ্তরহস্য।

মায়ের উক্তি*

(শিশুদের জন্য)

আজ যা করতে পারবে কালকের জন্য তা ফেলে রাখবে না।

যখন কাউকে 'শুভদিন' (Bonjour) বলছ, তার অর্থ তুমি বলছ তার সমস্ত দিনটা শুভ হোক। যদি বলতে পার সচেতনভাবে তবে তোমার 'শুভদিন'-এর অর্থটা যাকে বলবে তার মনের মধ্যে সজাগ হয়ে উঠবে, তবে 'শুভদিন' কথাটা শক্তিমান হয়ে উঠবে এবং দিনটিকে সত্যসত্যই শুভ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

প্রত্যেক জীব অন্তরে বয়ে চলে অন্তর্যামীকে ; আর সারা বিশ্বে যদি মানুষের মত ক্ষীণবল আর কেউ না থাকে তবে তার মত ভাগবত ভাবান্বিত জীবও আর কেউ নেই।

কোন মহৎ ব্রত সাধনের জন্য হিংস্রতা কখনও সদুপায় হতে পারে না। ন্যায়কে কি রকমে অন্যায় দিয়ে, মিত্রতাকে কি রকমে শত্রুতা দিয়ে অর্জন করা যায় ?

সর্বদাই সুশীল সুবোধ থাকবে, তাহলে সর্বদাই আনন্দে থাকবে।
একটি সৎকর্ম হৃদয়ের কাছে বেশি মধুর সুখের মধ্যে নিষ্ঠুর চেয়ে।
যেদিনে কোন সৎকর্ম করা হয়নি সে হল হৃদয়হীন দিন।

আন্তরিকভাবে চেষ্টা কর উন্নতির জন্য। ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকবে, তোমার চেষ্টার ফল আসবেই।
ধ্যানের আরম্ভে সঙ্কল্প করবে : সরে যাও, এগিও না লোভের চিন্তা।
সরে যাও, এগিও না অসৎ-ইচ্ছার চিন্তা।
সরে যাও, এগিও না হিংসার চিন্তা।

সত্যের পথে যে চলেছে, কোন ভ্রান্তিই তাকে বিচলিত করে না। কারণ সে জানে ভ্রান্তি হল সত্যের দিকে চলবার প্রথম পদক্ষেপ।

সত্যই বিনয়ের মধ্যে মহিমার জন্ম।

---

* মা এ রকমে কয়েকটি পরিচিত প্রবচন উদ্ধৃত করেছিলেন শিশুদের কাছে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য।

ব্যক্তিগত আমি আর বিশ্বগত আমি একই। প্রত্যেক জগতে প্রত্যেক জীবে প্রত্যেক জিনিসে প্রত্যেক অণুকণায় রয়েছেন ভগবান। তাঁকে প্রকাশ করে ধরাই হল মানুষের কাজ।

গোঁয়ার্তুমিকে সাহস বলে মনে করবে না আর উদাসীনতাকে ধৈর্য বলে গ্রহণ করবে না।

এখানে আমাদের মধ্যে যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি একটা তীব্র আস্পৃহা, অধিকতর চেতনা অধিকতর জ্ঞানের অভিমুখে তবে আমরা এমন একটা অন্তর্মুখী আবহাওয়া গড়ে তুলতে পারব যা সম্পূর্ণরূপে অনুকূল হবে আমাদের ক্রমোন্নতির পক্ষে।

একটা আধ্যাত্মিক চেতনার আবহাওয়া বাক্-বিনিময়ের অপেক্ষা অনেক বেশি সহায় হয় অনেক সময়।

চিন্তা যতই সুন্দর হোক না তা আমাদের কখনও এগিয়ে নিয়ে যাবে না যদি না আমাদের দৃঢ় সংকল্প থাকে তাদের প্রকাশ করে ধরতে উন্নততর অনুভবে যথাযথ ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ে আর সুষ্ঠুতর কর্মের মধ্যে।

তুমি যে এখন ঘৃণায় পরিপূর্ণ, এই ঈর্ষা তোমার হৃদয় হতে মুছে যাবে, সাগর যেমন মুছে দেয় বালির দাগ।

জগৎজননী পৃথিবীর উপর দৃষ্টি দিয়েছেন, দিয়েছেন তাঁর আশীর্বাদ।

নীরবতার মধ্যে আমি দেখতে পাই তোমার অনন্ত শাশ্বত পরমানন্দ।

হে আমার মধুর অধিরাজ, তুমি হলে প্রভু এবং প্রভুত্ব, বিজয়ী এবং বিজয়।

তোমার বক্ষ হল পরম আশ্রয় যেখানে সকল দুশ্চিন্তা শান্ত হয়ে যায়। খুলে ধর তোমার এই বক্ষ যাতে সকল আর্তেরাই পায় সেখানে পরম আশ্রয়।

এই তমিস্রা দীর্ণ কর, আলোক উৎসারিত কর, এই উচ্ছলতা শান্ত কর, প্রতিষ্ঠা কর শান্তি।

এই হিংস্রতা দূর কর, ভালবাসার রাজত্ব এনে দাও।

বিজয়ী যোদ্ধা হয়ে দাঁড়াও, সকল বাধা সরিয়ে দাও, নিয়ে এস বিজয়।

কথা যদি তৈরী রূপায়, তবে নীরবতা তৈরী সোনায়।

যা বল তা করা উচিত সর্বদাই, কিন্তু যা কর তা বলা সব সময় যুক্তিযুক্ত নয়।
কথা যখন বল তখন সর্বদা বলবে সত্যকথা, কিন্তু অনেক সময় কিছু না বলাই যুক্তিযুক্ত।

হে ভগবান, তোমার চেতনা তোমার শান্তি ক্রমেই যেন বেড়ে ওঠে আমাদের মধ্যে আর ক্রমেই যেন আমরা হয়ে উঠতে পারি সুষ্ঠুতর বিশ্বস্ত যন্ত্র, বাহন তোমার দিব্য অদ্বিতীয় বিধানের।

যা কিছু কর তা করতে চেষ্টা কর আনন্দের সঙ্গে।

যে কাজের উপর তোমার টান হয় তা করেই তোমার আনন্দ হবে।

কাজের উপর টান আনতে হলে তাকে ক্রমেই ভাল করে করতে হয়।
সত্যকার তৃপ্তি আসে যতই তুমি উন্নতি করে চল।

ভালভাবে করবার জন্যই ভাল করে কর, পুরস্কার লাভের জন্য নয়।

ভাল হও ভাল হওয়ার আনন্দের জন্য, লোককে খুশি করার জন্য নয়।

কারও অধিকার নেই কাউকে জোর করে নিজের মত চিন্তা করাতে।
প্রত্যেকেরই উচিত অপরের মতামত ধৈর্যের সঙ্গে ঔদার্যের সঙ্গে সহ্য করে চলা।

সাধারণ মানুষ রয়েছে অজ্ঞানের মধ্যে "আমার ধর্মই একমাত্র ধর্ম, আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।" কিন্তু হৃদয় যখন সত্যকার জ্ঞানে আলোকিত হয়ে ওঠে তখন সে জানতে পায় এই যত দলাদলির যুদ্ধ তাদের ঊর্ধ্বে রয়েছে সেই এক অভিন্ন শাশ্বত সর্বজ্ঞ আশীর্বাদ।

অনির্দেশ্য বস্তু এক রয়েছিল স্বর্গের পৃথিবীরও পূর্বে। কি প্রশান্তি সে, একমাত্র তাই রয়েছে, তার পরিবর্তন নেই। সকলের অন্তরে তাই রয়েছে, তার বিনাশ নেই। তাকে বলা যেতে পারে বিশ্বের জননী।

এই-সে পূর্ণ চেতনা, সব ভরে আছে, এই পূর্ণ চেতনাই পূর্ণ করে সব, সে-ই পূর্ণ করে রয়েছে সব।

কে সে? পূর্ণ চেতনা।
এই সেই পূর্ণ চেতনা, সব পূর্ণ করে আছে।

ভাগবত অগ্নি জ্বলছে অথচ, অভিন্ন, সৃষ্টির সকল গহ্বর পূর্ণ করে রয়েছে।

জীবনের কোন্ মুহূর্ত সর্বপ্রধান?
বর্তমান মুহূর্ত। কারণ অতীত আর নেই, ভবিষ্যৎও আসেনি।

বর্তমানই হল জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রধান মুহূর্ত।

অতীতকে দূরে পিছনে ফেলে এসে চল বেয়ে চলি আমরা জ্যোতির্ময় ভবিষ্যতের দিকে।

বেদমন্ত্র

ঋষি অত্রির অগ্নিমন্ত্র

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৫ম মণ্ডল—২৫শ সূক্ত

অচ্ছা বো অগ্নিমবসে দেবং গাসি স নো বসুঃ।
রাসৎ পুত্র ঋষূণাবৃতাবা পর্ষতি ষ্বিষঃ ॥১॥

অচ্ছ—প্রতি, অভিমুখে, উদ্দেশ্যে
বঃ—তোমাদের
অগ্নিম্—অগ্নিকে
অবসে—বৃদ্ধির জন্য, উপচয়ের জন্য
দেবম্—দেবতাকে
গাসি—গাও
সঃ—সে
নঃ—আমাদের
বসুঃ—সম্পত্তি
রাসৎ—কাম্য দান করে
পুত্রঃ—পুত্র
ঋষূণাম্—জিজ্ঞাসুদের
ঋতাবা—সত্যের রক্ষক
পর্ষতি—পার হয়ে যায়, অতিক্রম করে যায়
ষ্বিষঃ—শত্রুদের

অগ্নির উদ্দেশ্যে অভিবৃদ্ধির জন্য স্তুতি গাও তোমরা, সে আমাদের দেবতা, আমাদের সম্পত্তি ; দান করে সকল কাম্য, জিজ্ঞাসুদের পুত্র সে, সত্যের রক্ষক, শত্রুদের অতিক্রম করে আমাদের নিয়ে যায় ওপারে ॥১॥

স হি সত্যো যং পূর্বে চিদ্দেবাসশ্চিদ্যমীধিরে।
হোতারং মন্দ্রজিহ্বমিৎ সুদীতিভির্বিভাবসুম্ ॥২॥

সঃ—সে
হি—নিশ্চয়
সত্যঃ—সত্যের
যম্—যাকে

পূর্বে—প্রাচীনেরা
চিৎ—এমন কি
দেবাস:—দেবতারা
চিৎ—পর্য্যন্ত
যন্—যাকে
ঈধিরে—সমিদ্ধ করেছে
হোতারন্—(তিনি) হোতা, আহ্বায়ক
মন্দ্রজিহ্বন্—মধুজিহ্ব
ইৎ—নিশ্চয়
সুদীতিভি:—পূর্ণদীপ্তি দিয়ে
বিভাবসুন্—(তিনি) বিপুল বিশাল জ্যোতির আধার

এই সেই সত্যবস্তু, প্রাচীনেরা যাকে, এমন কি দেবতারা যাকে সমিদ্ধ করেছে, মধুজিহ্ব আহ্বাতা তিনি, পূর্ণ দীপ্তি সকল আশ্রয় করে তিনি হয়েছেন বিশাল জ্যোতির আপন আধার ॥২॥

স নো ধীতী বরিষ্ঠয়া শ্রেষ্ঠয়া চ সুবত্যা।
অগ্নে রায়ো দিদীহি ন: সুবৃক্তিভির্বরেণ্য ॥৩॥

স:—সে
ন:—আমাদের
ধীতী—বুদ্ধির সহায়ে
বরিষ্ঠয়া—সর্বোত্তম
শ্রেষ্ঠয়া—সর্বশ্রেষ্ঠ
চ—এবং
সুবত্যা—সুমতির সহায়ে
অগ্নে—হে অগ্নি
রায়:—আনন্দধন
দিদীহি—দান কর
ন:—আমাদের
সুবৃক্তিভি:—শুদ্ধিবাক্যের সহায়ে যা সকল পাপ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলে
বৃক—ছেদনে
বরেণ্য—বরণীয়

সেই তুমি আমাদের সর্বোত্তম বুদ্ধির সহায়ে আর আমাদের শ্রেষ্ঠতম সুমতির সহায়ে, হে অগ্নি, আমাদের দিয়ে যাও আনন্দধন তোমার শত্রুসূদন শক্তির সহায়ে, হে বরণীয় ॥৩॥

অগ্নির্দেবেষু রাজত্যগ্নির্বর্তেষ্বাবিশন্।
অগ্নির্নো হব্যবাহনোঽগ্নিং ধীভিঃ সপর্যত ॥৪॥

অগ্নিঃ—অগ্নি
দেবেষু—দেবতাদের মধ্যে
রাজতি—দীপ্ত হয়ে উঠেছে
অগ্নিঃ—অগ্নি
বর্তেষু—মর্ত্যজনের মধ্যে
আবিশন্—প্রবেশ করেছে
অগ্নিঃ—অগ্নি
নঃ—আমাদের
হব্যবাহনঃ—আহুতির বাহন
অগ্নিম্—অগ্নিকে
ধীভিঃ—চিন্তারাজির সহায়ে, মননবৃত্তির সহায়ে
সপর্যত—সেবা কর

অগ্নি দেবতাদের মধ্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে, প্রবেশ করেছে মর্ত্যজনের মধ্যে, অগ্নি আমাদের আহুতির বাহক, অগ্নিরই সেবা কর তুমি, তোমার সকল চিন্তার সহায়ে ॥৪॥

অগ্নিস্তবিশ্রবস্তমং তুবিব্রহ্মাণমুত্তমম্।
অতূর্তং শ্রাবয়ৎপতিং পুত্রং দদাতি দাশুষে ॥৫॥

অগ্নিঃ—অগ্নি
তুবিশ্রবঃ তমম্—বহুল শ্রৌতজ্ঞানে (অনুপ্রেরণায়) পরিপূর্ণ
তুবিব্রহ্মাণম্—বহুল দিব্য বাক্যময়
উত্তমম্—সর্বশ্রেষ্ঠ
অতূর্তম্—অদমনীয়
শ্রাবয়ৎপতিম্—দিব্যশ্রবণের অধিপতি যে
পুত্রম্—পুত্রকে
দদাতি—দান করে
দাশুষে—দাতাকে, প্রদাতাকে

অগ্নি দাতাকে পুত্র দান করে যে পুত্র বহুল অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ, বহুল দিব্যবাণীময়, পরমোত্তম যে, শত্রুরা তার পায় পায় না, সে হল সেই অধিষ্ঠাতা যে শ্রবণে নিয়ে আসে শ্রৌতজ্ঞান ॥৫॥

অগ্নির্দদাতি সৎপতিং সাসাহ যো যুধা নৃভিঃ।
অগ্নিরত্যং রঘুষ্যদং জেতারমপরাজিতম্ ॥৬॥

অগ্নিঃ—অগ্নি
দদাতি—দান করে

সৎপতিম্—সত্যসত্তার অধিপতিকে
সসাহ—জয় করে
যঃ—যে
যুধা—যুদ্ধে
নৃভিঃ—পুরুষ-আত্মাদের সহায়ে
অগ্নিঃ—অগ্নি
অত্যম্—অশ্বশক্তিকে
রঘুষ্যদম্—ক্ষিপ্রগামী, তুরঙ্গম
জেতারম্—বিজয়ী
অপরাজিতম্—অপরাজিত

অগ্নি আমাদের কাছে নিয়ে আসে সত্যসত্তার অধিপতিকে, তিনি যুদ্ধে তাঁর পুরুষ-শক্তিসংঘের সহায়ে বিজয়লাভ করেন, অগ্নি নিয়ে আসে ক্ষিপ্রগামী অশ্বকে বিজয়ী যে, অপরাজিত যে ॥৬॥

যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ বিভাবসো।
মহিষীব ত্বদ্রয়িস্ত্বদ্বাজা উদীরতে ॥৭॥

যৎ—যা
বাহিষ্ঠম্—পরমবহনক্ষম
তৎ—তা
অগ্নয়ে—অগ্নির জন্য
বৃহৎ—বৃহৎকে
অর্চ—অর্চনা কর, মন্ত্রে প্রকাশ করে ধর
বিভাবসো—বৃহৎ প্রভা তোমার সত্তার সম্পদ।
মহিষী ইব—মহতী দেবী যে
ত্বৎ—তোমার
রয়ি—আনন্দসম্পদ
ত্বৎ—তোমার
বাজাঃ—প্রাচুর্যসব
উৎ—ঊর্ধ্বে
ঈরতে—ছুটে চলেছে

আমাদের মধ্যে যা পরমবহনক্ষম তা, অগ্নি, তোমার জন্য, বৃহৎকে তোমার আলোয় পূজা কর, বৃহৎ জ্যোতি তোমারই আপন সম্পদ, মহতী দেবী যেন তোমার আনন্দধন, সকল প্রাচুর্য তোমাকে লক্ষ্য করে ঊর্ধ্বে উঠে চলেছে ॥৭॥

তব দ্যুমন্তো অর্চয়ো গ্রাবেবোচ্যতে বৃহৎ।
উতো তে তন্যতুর্যথা স্বানো অর্ত স্বনা দিবঃ ॥৮॥

তব—তোমার
দ্যুমন্তঃ—দ্যুতিমান, জ্যোতির্ময়
অর্চয়ঃ—জ্বলন্ত শিখা সব
গ্রাবা ইব—উদূখলের মত
উচ্যতে—কণ্ঠ উঠেছে
বৃহৎ—বৃহৎ
উতো—আর
তে—তোমার
তন্যতুঃ—মেঘগর্জনে
যথা—যেন
স্বানঃ—ধ্বনি
অর্ত—উঠে গিয়েছে
স্বনা—আপনা হতে
দিবঃ—স্বর্গের

জ্যোতির্ময় তোমার জ্বলন্ত শিখা সব ; বৃহৎ কণ্ঠ উঠেছে যেন উদূখল হতে আর তোমার ধ্বনি আপনা হতেই উদ্‌গত হয়েছে যেন স্বর্গের মেঘগর্জন ॥৮॥

এবা অগ্নিং বসূযবঃ সহসানং ববন্দিম।
স নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ পর্ষন্নাবেব সুক্রতুঃ ॥৯॥

এব—এই রকমে
অগ্নিম্—অগ্নিকে
বসূযবঃ—সৎবস্তুকামী (আমরা)
সহসানম্—পরাক্রমী
ববন্দিম—বন্দনা করি
সঃ—সে
নঃ—আমাদের
বিশ্বাঃ—বিশ্ব, যাবতীয়
অতি-পর্ষৎ—পার করে দেয়
দ্বিষঃ—শত্রুশক্তিদের
নাবা ইব—নৌকার মত
সুক্রতুঃ—সুকর্তা, পূর্ণক্রিয়াশক্তি

আমরা যারা সদ্বস্তু কামনা করি এই রকমে পরাক্রমী অগ্নিকে বন্দনা করি ; সে আমাদের নিয়ে যায় সকল শত্রুশক্তিদের ওপারে নৌকার মত, সে হল পরম কর্মশক্তি ॥৯॥

৫ম মণ্ডল—২৬শ সূক্ত

অগ্নে পাবক রোচিষা মন্দ্রয়া দেব জিহ্বয়া।
আ দেবান্ বক্ষি যক্ষি চ ॥১॥

অগ্নে—হে অগ্নি
পাবক—শুদ্ধিকর
রোচিষা—দীপ্তিময়
মন্দ্রয়া—আনন্দময়
দেব—হে দেবতা
জিহ্বয়া—জিহ্বা দিয়ে
দেবান্—দেবতা সকলকে
আ-বক্ষি—বহন করে নিয়ে এস
যক্ষি—যাজন কর, উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর
চ—আর

হে অগ্নি, হে শুদ্ধিকর, তোমার দীপ্তিময় আনন্দময় জিহ্বায়, হে দেবতা, দেবতাদের এখানে নিয়ে এস, তাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর ॥১॥

তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে চিত্রভানো স্বর্দৃশম্।
দেবা আ বীতয়ে বহ ॥২॥

তং—সেই
ত্বা—তোমাকে
ঘৃতস্নো—স্বচ্ছতা ঝরায় যে, হে স্বচ্ছতার ঝরণা
ঈমহে—আমরা কামনা করি
চিত্রভানো—বিবিধ রশ্মি-সমৃদ্ধ
স্বঃ-দৃশম্—স্বর্লোকের, সত্যলোকের দ্রষ্টা
দেবান্—দেবতাদের
বীতয়ে—প্রকাশের জন্য
আ-বহ—নিয়ে এস

স্বচ্ছতার ঘন আলো তুমি ছড়িয়ে চল, বহুবিচিত্র জ্যোতি তোমার, তোমাকে আমরা কামনা করি, সত্যের লোক তোমার দৃষ্টিতে, দেবতাদের এখানে নিয়ে এসে প্রকাশ কর ॥২॥

বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি।
অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে ॥৩॥

বীতিহোত্রম্—আহুতিবাহক
ত্বা—তোমাকে
কবে—হে দিব্যদ্রষ্টা

দ্যুমন্তম্—দ্যুতিমান
সম্-ইধীমহি—সমিদ্ধ করি
অগ্নে—হে অগ্নি
বৃহন্তম্—বৃহৎ (তোমাকে)
অধ্বরে—যজ্ঞযাত্রায়

আহুতির বাহক তুমি, হে দিব্যদ্রষ্টা, দ্যুতিমান তুমি, বৃহৎ তুমি হে অগ্নি, এ যজ্ঞ-যাত্রায় তোমাকেই আমরা সমিদ্ধ করি ॥৩॥

অগ্নে বিশ্বেভিরা গহি দেবেভির্হব্যদাতয়ে।
হোতারং ত্বা বৃণীমহে ॥৪॥

অগ্নে—হে অগ্নি
বিশ্বেভিঃ—সকল, বিশ্ব
আ-গহি—এস
দেবেভিঃ—দেবতাদের সঙ্গে
হব্য-দাতয়ে—হবি বা আহুতি দান করবার জন্য
হোতারম্—হোতা
ত্বা—তোমাকে
বৃণীমহে—বরণ করি

হে অগ্নি, বিশ্বদেবতাদের সঙ্গে এস তুমি এখানে, আহুতি দান করবে তুমি, তুমি হোতা, তোমাকেই বরণ করি ॥৪॥

যজমানায় সুন্বত অগ্নে সুবীর্যং বহ।
দেবৈরা সৎসি বর্হিষি ॥৫॥

যজমানায়—যজমানের জন্য
সুন্বতে—সোমরস নিষ্কাশিত বা প্রস্তুত করে যারা তাদের জন্য
অগ্নে—হে অগ্নি
সুবীর্যম্—পূর্ণ বীর্যকে
আ-বহ—নিয়ে এস
দেবৈঃ—দেবতাদের সঙ্গে
আ-সৎসি—উপবেশন কর
বর্হিষি—আসনে, যজ্ঞাসনে

সোমরস প্রস্তুত করেছে যে যজমান তার জন্য, হে অগ্নি, নিয়ে এস পূর্ণ বীর্য, দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞাসনে উপবেশন কর ॥৫॥

সনিধানঃ সহস্রজিদগ্নে ধর্মাণি পুষ্যসি।
দেবানাং দূত উকথ্যঃ ॥৬॥

সন্-ইধানঃ—সমিদ্ধ হয়ে
সহস্রজিৎ—হে সহস্রজিৎ, সহস্রসম্পদজয়ী
অগ্নে—হে অগ্নি
ধর্মাণি—সকল দিব্যধর্মকে
পুষ্যসি—তুমি পোষণ কর
দেবানাম্—দেবতাদের
দূতঃ—দূত

পূর্ণ প্রজ্বলিত হয়ে সহস্রসম্পদ তুমি জয় কর; হে অগ্নি, সকল সত্যধর্ম তুমি পোষণ কর, দেবতাদের বাণীবহ দূত তুমি ॥৬॥

ন্যগ্নিং জাতবেদসং হোত্রবাহং যবিষ্ঠ্যম্।
দধাতা দেববৃক্তিমম্ ॥৭॥

অগ্নিম্—অগ্নিকে
জাতবেদসম্—জন্মজন্মান্তরের জ্ঞাতা
হোত্রবাহম্—আহুতির বাহক
যবিষ্ঠ্যম্—যুবতম
নি-দধাতা—অন্তরে ধারণ কর
দেবম্—দেবতাকে
ঋত্বিজম্—ঋত্বিককে

জন্মজন্মান্তরের জ্ঞাতা তুমি, আহুতির বাহক, যুবতম, এ ঋত্বিক দেবতাকে অন্তরে ধারণ কর ॥৭॥

প্র যজ্ঞ এষ্বানুষগদ্যা দেবব্যচস্তমঃ।
স্তৃণীত বর্হিরাসদে ॥৮॥

যজ্ঞঃ—যজ্ঞ
প্র-এতু—এগিয়ে চলুক, অগ্রসর হোক
আনুষক্—নিরন্তর
অদ্য—অদ্য, আজ
দেববীচঃ তমঃ—দেবতাদের পূর্ণ আবির্ভাব যেখানে
স্তৃণীত—বিস্তৃত কর
বর্হিঃ—যজ্ঞাসন
আসদে—উপবেশনের জন্য

আজ এই যজ্ঞ নিরন্তর অগ্রসর হয়ে চলে যেন, দেবতাদের পূর্ণ আবির্ভাব এখানে, তাদের উপবেশনের জন্য যজ্ঞাসন বিস্তৃত কর ॥৮॥

এদং মরুতো অশ্বিনা মিত্র: সীদন্তু বরুণ:।
দেবাস: সর্বয়া বিশা ।।৯।।

ইদম্—এখানে
মরুত:—মরুতেরা
অশ্বিনা—অশ্বিদ্বয়েরা
মিত্র:—মিত্র
আ-সীদন্তু—আসন গ্রহণ করুক
বরুণ:—বরুণ
দেবাস:—দেবতারা
সর্বয়া—সকল
বিশা—জনসংঘসহ

মরুৎগণ, অশ্বিদ্বয়, আর মিত্র আর বরুণ, বিশ্বজনসহ সকল দেবতারাই এখানে আসন গ্রহণ করে যেন।।৯।।

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

(মাঝে মাঝে মায়ের ব্যাখ্যা সহ)

৪৬২—অজ্ঞান অবস্থাতে আমরা বাচ্চা শিশুদের মতো মনে করি যে বিনা সাহায্যেই আমরা এই তো নিজেরাই যেন হাঁটছি, আর তাই ভেবে গর্বিত হই, যদিও জানি যে না আমাদের কাঁধে হাত রেখেছেন যাতে পড়ে না যাই। পরে সে অবস্থা থেকে যখন জাগি তখন দেখি যে স্বয়ং ভগবান সর্বদাই আমাদের ধরে থেকে চালিয়েছেন।

৪৬৩—গোড়ার দিকে কিছু পাপ কাজ করলেই কেঁদে ও চটে গিয়ে নিজেকে ও ভগবানকে গালি দিতাম। ওর পরের অবস্থায় এসে তখন কেবল তাঁর কাছে অনুযোগ করতাম, "ওগো আমার বন্ধু, কেন আমাকে এমন ক'রে এই পাঁকের মধ্যে ডোবালে!" আরো পরে যখন আমার আরো বেশি সাহস বাড়ল তখন শুধু নীরবে তার গ্লানি থেকে দাঁড়িয়ে উঠে কেবল তাঁর দিকেই চেয়ে নিজেকে শুদ্ধ ক'রে নিলাম।

মা মানুষ যতদিন পর্যন্ত নিজের পুণ্যকাজ সম্বন্ধে গর্বিত হতে থাকে ততদিন পর্যন্ত ভগবান তাকে পাঁকে ফেলেই নম্র ও বিনীত হতে শেখান। ৮-৪-১৯৭০

৪৬৪—জীবনের ব্যাপারে ভগবান এমনি একটা অবস্থা করে রেখেছেন যেন বাইরের জগৎটাই আমার পতি, আর কৃষ্ণ হলেন আমার গোপনীয় উপপতি। পতি-জগতের জন্য যা কিছু সেবা ও কর্তব্যকর্মের দরকার তা হলো আইনমাফিক বাঁধাধরা জিনিস যা সুখদুঃখ ও ব্যথাবেদনার ভিতর দিয়ে সকলকেই পালন ক'রে যেতে হবে; কিন্তু হৃদয়ের ভিতরকার প্রেম ও আনন্দের অর্ঘ্য সব কিছুই নিবেদন করা হবে কেবল সেই গোপনীয় উপপতির উদ্দেশে।

৪৬৫—দিব্যানন্দ এক অতি আশ্চর্য নিগূঢ় জিনিস, সাধারণী বুদ্ধি সে রহস্য ও মাধুর্যের কথায় মুখ ভেংচে হাসতে থাকে, কিন্তু ভিতরের আত্মা যখন সে আনন্দের আস্বাদ পায় তখন কিছুতেই তার থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারেনা, যতই কেন তাকে জাগতিক নিন্দা-গ্লানি বা পীড়ন উৎপীড়ন সহ্য করে যেতে হোক।

মা জগৎ এখনও পর্যন্ত দিব্যজ্যোতি ও দিব্য আনন্দের বিরোধী, কিন্তু এমন দিন আসবে যখন এই জগৎই তেমন আনন্দ দেবে। তারই জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হচ্ছে।
৯-৪-১৯৭০

৪৬৬—ভগবান হলেন সারা জগতের মহা গুরু, তোমার মনটুকুর চেয়ে তিনি অনেক বেশি জ্ঞানসম্পন্ন; তোমার ঐ আত্মমগ্ন সংশয়ী ক্ষুদ্র মনকে বিশ্বাস না ক'রে তুমি কেবল তাঁকেই বিশ্বাস করো।

৪৬৭—সন্দিগ্ধ মন বোঝেনা বলেই অবিশ্বাস করে, কিন্তু ভগবৎপ্রেমিক না বুঝেও তাঁকে ভজনা করতে ছাড়েনা। আমাদের অন্ধকারের রাজ্যে দুই রকমই দরকার, যদিও ওর মধ্যে কোনটা বেশি জোরদার সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ আমার মধ্যে বিশ্বাস ও প্রেম যদি বজায় থাকে তাহলে এখনও যা হয়তো বুঝছি না তা একদিন ঠিক বুঝবো কিন্তু যদি সে বিশ্বাস ও প্রেমটুকু হারাই তাহলে ভগবান যে লক্ষ্য সামনে রেখেছেন তার থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়বো।

৪৬৮—আমার দিশারী ও শিক্ষাদাতা ভগবানকে আমি এমন প্রশ্ন তো করতে পারি "যা আমি মনে করি তাই কি ঠিক, না তুমি ভালোবেসে এবং সব জেনেশুনেই আমার মনকে এই ভাবে দিচ্ছ মিথ্যা ছলনা করতে নিজেকে?" তুমি নিজের মনকে যত খুশি সন্দেহ করো, কিন্তু ভগবানই যে তোমাকে চালাচ্ছেন তাতে সন্দেহ কোরোনা।

মা : আমাদের এই জীবন দেওয়া হয়েছে যাতে এর মধ্যে ভগবানকেই আমরা খুঁজে পাই ও তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারি। মন যদিও বলতে চাইবে যে সেই কথা ঠিক নয়, কিন্তু সেই মিথ্যুক মনটাকেই কি আমরা মেনে চলবো? ১০-৪-১৯৭০

৪৬৯—প্রথম অবস্থায় তোমাকে যে ভগবান সম্বন্ধে অনির্দিষ্ট রকমের ধারণাতে রেখে দেওয়া হয়েছে, তাই গোসাভরে তুমি তাঁকে অস্বীকার ক'রে চলেছ। ওহে মানব; গোড়া হতেই তোমাকে পুরোপুরি সবখানি জ্ঞান জানিয়ে দেননি বলে কি বিদ্যালয়ে তোমার গুরুমশাইয়ের উপরে গোসাভরে তাঁকে সন্দেহ করতে থাকো? তুমি বরং ঐটুকু সামান্য জানা অসম্পূর্ণ জিনিস নিয়েই অনুশীলন করতে থেকে তাকে যথাকর্তব্য মূল্য দিয়ে রাখো, যাতে উত্তরোত্তর তোমার জ্ঞান আরো বেশি খুলে যায়, আরো বেড়ে বিস্তারলাভ করে।

৪৭০—এই ভাবেই প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের কাঁচা ও দুর্বল শিশু আত্মাকে ধাপে ধাপে একটু ক'রে শিক্ষা দেন, একবারেই তাঁর চরম ও দুরারোহ পর্বতচূড়ার পুরো চেহারাটা দেখিয়ে দেননা। যেহেতু কিছু-না-কিছু দুর্বলতা কি আমাদের সকলের মধ্যেই থাকেনা? তাঁর দৃষ্টিতে সকলেই কি আমরা শিশুমাত্র নয়?

৪৭১—আমি তাই দেখলাম যে ভগবান যে এতদিন নিজের কাছ থেকে আড়াল ক'রে আমাকে রেখেছিলেন, সেটা তাঁর অনন্ত জ্ঞানে ও প্রেমে ইচ্ছা করেই রেখেছিলেন। নইলে তখন যদি আমি তাঁকে পুরোপুরিভাবে পেতাম তাহলে এমনি সহজে পাওয়া ভালো জিনিস-কেও আমি বিষাক্ত ক'রে ফেলতাম। তবু নিতান্ত নাছোড়বান্দা হচ্ছি দেখলে তখন বিষই আমাদের দিতে হয়, যাতে তার থেকে সমুচিত রকমের শিক্ষা পেয়ে আমরা তাকে ছেড়ে দিয়ে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে তাঁর অমৃতময় মধুর প্রসাদগুলির আস্বাদ গ্রহণ করতে পারি।

মা : মানুষ যখন আরো কিছু বেশি জ্ঞান পাবে তখন তারা আর এভাবে নালিশ না ক'রে যা ভগবান তাঁর কৃপার দান হিসাবে করুণাভরে দিতে থাকেন তাই সকৃতজ্ঞচিত্তে উপভোগ করতে থাকবে।

আমরা যতই বেশি তাঁতে সমর্পিত হতে পারবো ততই বেশি তাঁকে বুঝতে পারবো। যতই বেশি কৃতজ্ঞ হবো ততই বেশি সুখী হতে পারবো। ১১-৪-১৯৭০

৪৭২—এমন কি নাস্তিকেও এখন দেখতে পাবে যে সৃষ্টি অবাধে অগ্রসর হয়ে চলেছে কোনো অসীম ও বিরাট উদ্দেশ্য পূরণের দিকে, এবং তা বিবর্তনধারার গতিপ্রকৃতি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান। কিন্তু সেই বিরাট উদ্দেশ্যকে সফল করার পিছনে নিশ্চয়ই রয়েছে তেমনি কোনো বিরাট ও অসীম প্রজ্ঞা, যার দ্বারা তা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ও রূপায়িত হচ্ছে এবং যা তাকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে সম্ভব করছে। সেই অসীম প্রজ্ঞাকেই তুমি আপন আত্মার মধ্যে স্বীকার ক'রে ভজনা করো—যদি তুমি মন্দিরে গিয়ে পূজা প্রার্থনা করতে না চাও, আর যদি কোনো প্রেমময় ও বৈভবময় সুনির্দিষ্ট সত্তার হৃদয়চেতনাকে স্বীকার না করো। ওতে তবুও তুমি আপন অজ্ঞাতেই সেই কৃষ্ণকেই ভক্তি ও ভজনা করতে থাকবে।

মা বাক্য মনের অতীতে সেই পরমতম সদ্‌বস্তু এই ভাবেই আমাদের বিস্মিত ও শ্রদ্ধানত ক'রে স্বীকার করিয়ে নেয়। তখন আমরা মনগড়া যত সংকীর্ণতার বিকার থেকে মুক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ হয়ে তারই সঙ্গে সংযোগ পেতে আস্পৃহা করি। ১২-৪-১৯৭০

৪৭৩—শ্রেষের ঠাকুর আমাদের এই কথা বলে দিয়েছেন যে, "যারা অব্যক্ত ও অজ্ঞেয়কে স্বীকার করে ও মানে তারা বস্তুত আমাকেই মানে, আর আমিই তাদের সকল পূজা গ্রহণ ক'রে থাকি"। এইভাবে তিনি মায়াবাদী ও অগমবাদীকেও স্বয়ং আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন, তাহলে ওহে ভক্ত সাধক, তুমি কেন তাদেরকে গালি দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নাও?

মা ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে মানুষের আন্তরিক আস্পৃহা মাত্রই তাঁর কাছে গ্রাহ্য, তা যতই কেন বিচিত্র ও বিপরীত ধরনের হোক। সকল রকমের সকল কল্পনাকে একত্রিত করলেও সেই বাস্তব সদ্‌বস্তুকে সম্যক ব্যক্ত করা যায় না। ১৩-৪-১৯৭০

৪৭৪—ক্যালভিন যে যুক্তি অনুসারে চিরন্তন নরকের কথা বলেছেন, তাতে তিনি প্রকৃত সেই চিরন্তন ভগবানকে না জেনে তাঁকে ঐরূপ একটা ভয়াবহ রকম মুখোস পরিয়েছেন। নরক যদি অমনি চিরন্তনী জিনিস হয় তাহলে সে তো চিরন্তন আনন্দের জিনিসই হবে; যেহেতু ভগবান যে নিজেই চিরন্তন কেবল আনন্দময়, তাই কেবল আনন্দ ছাড়া আর কিছু তাঁর পক্ষে চিরন্তন হতে পারে না।

৪৭৫—দান্তে যখন বললেন যে পূর্ণ প্রেমের দ্বারাই ভগবান নরকের সৃষ্টি করেছেন, তখন তিনি না জেনেই অমন একটা জ্ঞানের কথা বলেছেন। কারণ আমি যে-সব আভাস ইঙ্গিত পেয়ে থাকি তাতে মনে হয় রয়েছে এমন নরক যেখানে আমাদের আত্মা এমন রসাবেশে আপ্লুত হতে পারবে যেন চিরন্তনের জন্যই সেই পরম রমনীয় রুদ্রদেবতার আলিঙ্গনের মধ্যে সে ডুবে রইল।

মা : ভগবানের এমন অপূর্ব দীপ্তি সমৃদ্ধি ও চমৎকারিত্ব যাকে ক্ষুদ্র মানবের সামান্য

সংকীর্ণতার পক্ষে ধারণা করা ও সহ্য করা নিতান্তই দুঃসাধ্য ; মানুষের পক্ষে তাঁর সেই চিরন্তনের আনন্দকে ধরতে পারা তার সাধ্যসীমার বাইরে। ১৪-৪-১৯৭০

৪৭৬—মানবদেহের মধ্যে থেকে এই সাত রকমের দিব্যানন্দ আস্বাদন করা যেতে পারে—গুরু ভগবানের বাধ্য শিষ্য হয়ে, পিতা ভগবানের বাধ্য পুত্র হয়ে, মাতা ভগবানের স্নেহের দুলাল হয়ে, বন্ধু ভগবানের অন্তরঙ্গ সুহৃদ হয়ে, শিশু বালক ভগবানের আনন্দময় খেলার খেলুড়ে হয়ে, মালিক ভগবানের অনুগত দাস হয়ে, আর উপপতি ভগবানের গুপ্ত প্রণয়ী হয়ে। . কিন্তু তুমি কি এই সবগুলি সম্পর্ককে একত্রে জড়ো ক'রে সপ্তবর্ণ রামধনুর মতো একটা চূড়ান্ত সম্পর্ক দাঁড় করাতে পারবে না ? তা যদি পারো তাহলে আর স্বর্গে যাবার বা অদ্বৈতবাদীর মতো মুক্তি চাওয়ার দরকারই হবে না।

মা এর উপরে কিছুই বলার নেই, এ হলো পুরোপুরি পাকা রকমের পথনির্দেশ। শুধু এমন ভাবটি অন্তরের উপলব্ধিতে আনতে পারলেই হলো। ১৫-৪-১৯৭০

৪৭৭—এ জগৎ বদ্‌লে গিয়ে কখন স্বর্গের মতো হতে পারবে ? মানুষের ছেলেবেয়ে কখন বদ্‌লে গিয়ে হতে পারবে সেই সদানন্দ লীলাময় কৃষ্ণের মতো ছেলে আর শক্তিরূপিণী কালীর মতো মেয়ে—যারা স্বর্গের নন্দন কাননে রয়েছে সদাই তাদের খেলাতে মত্ত ? প্রাচীন সেমেটিককালের বর্ণিত সেই ইডেন উদ্যানটি মন্দ ছিল না, কিন্তু সেখানে আদম ও ইভ ছিল যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত, আর সেখানে ভগবান ছিলেন অতি বৃদ্ধ ও কঠোর ও গুরুগম্ভীর, তাই সাপরূপী পাপকে নিবৃত্ত করা যায়নি।

৪৭৮—প্রাচীন সেমেটিকরা মানুষকে যে ভগবান চিনিয়েছিল, তিনি হলেন এক কঠোর বিচারক ও দণ্ডদায়ক রাজা, যিনি কখনই হাসতে জানেননা। কিন্তু আমরা তো কৃষ্ণকে দেখেছি, যিনি চিরলীলাময় বালক, যিনি নানা নষ্টামী করতে পারেন ও হাসতে হাসাতে পারেন।

৪৭৯—যে ভগবান হাসতে জানেনা তেমন কেউ কখনই এই হাস্যকর বিশ্বের স্রষ্টা হতে পারেনা।

মা : বিখ্যাপশক্তিকে কাবু করতে ব্যঙ্গবিদ্রূপই সব চেয়ে জোরালো অস্ত্র। তাই মানুষগড়া ঐ সব ভগবানকে শ্রীঅরবিন্দ হাস্যকর এক কথায় নস্যাৎ ক'রে দিলেন।

১৭-৪-১৯৭০

৪৮০—ভগবান যখন সেই শিশুকে আদর ক'রে তাঁর আনন্দময় বক্ষে স্থান দিলেন, তখন কিন্তু তার অদর্শনে তার মায়ের শোক ও কান্না কিছুতে থামে না।

৪৮১—আমি যখন কোনো শোক বা দুঃখ বা ব্যথায় কবলে পড়ে যাই, তখন বলি, "এই যে আবার সেই আগের দিনের পুরোনো খেলার বন্ধু আবার এসেছে আমাকে জ্বালাতে" —এই বলে বেশ ক'রে চেপে বসে শোকের ভিতরকার সান্ত্বনাটুকু, দুঃখের ভিতরকার

সৌভাগ্যটুকু আর ব্যথার ভিতরকার আরামটুকু ধরে নিয়ে উপভোগ করি ; সেই বন্ধু যখন দেখেন যে আমার কাছে তিনি ধরা পড়ে গেছেন, তখন তিনি তাঁর যত ভূতপ্রেত প্রভৃতি সাঙ্গোপাঙ্গগুলিকে ডেকে নিয়ে সরিয়ে ফেলেন।

মা কি সুন্দর রসিকতার ছলে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের শিখিয়ে দিলেন যে সাধারণ ঐ সব দুঃখ বিপত্তি কতখানি মিথ্যা, আর তার জায়গাতে বা তার অন্তরালে যে ভগবৎ চেতনার শক্তি ও জ্যোতি থাকে তার সন্ধান করলে কতখানি আনন্দ মেলে, এবং সেটাই সব কিছুতে আমাদের খুঁজে নেওয়া চাই। ১৮-৪-১৯৭০

৪৮২—কৃষ্ণের দ্বারা গোপিনীদের বস্ত্রহরণ হলো অতি গভীর এক রূপক কাহিনী, ভগবান যে আত্মাকে ঐভাবে আড়াল থেকে টেনে নেন তারই একটা সুস্পষ্ট অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত, সে কথা দিব্যজ্ঞানপিপাসু মাত্রই বুঝবে, আর ভক্ত সে অর্থ আপন অন্তরে অনুভব করবে ; এতে কামনাগন্ধী ভাবোদ্রেক অথবা নীতিশুষ্ক নিষ্কামতা দুই রকমের তাৎপর্য রয়েছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যার যেরূপ মনোভাব সে আপন মনেরই রঙে ঐ কাহিনীকে রাঙিয়ে নেবে।

৪৮৩—আমার প্রিয় আমার গা থেকে দিয়েছেন খসিয়ে পাপের আবরণ, আমি খুশি হয়েই তা ফেলে দিলাম ; তারপর সে যখন পুণ্যের আবরণ ধরেও টানাটানি করলেন তখন লজ্জিত ও ভীত হয়ে তাতে বাধা দিতে গেলাম। কিন্তু তাও যখন জোর ক'রে কেড়ে নিলেন তখন দেখি নগ্ন বুক আমার কাছ থেকে কেমন ক'রে লুকিয়েছিল।

মা (সোচ্চার হয়ে) পুণ্যেরও আবরণ ঝেড়ে ফেল, তবেই সত্যের জন্য তৈরি হবে। ২২-৪-১৯৭০

৪৮৪—পুণ্যবানের দৃষ্টিকে আড়াল করতেই কৃষ্ণ পাপের ভেক নিয়ে নিজেকে লুকিয়েছেন। হে গোঁড়া ধার্মিক, পাপীর মধ্যেও ভগবানকে খুঁজে দেখে নাও, আর তোমার সেই ভাইকেও বুকে জড়িয়ে ধরো, তাহলে পাপও তোমার হৃদয়কে বিশুদ্ধ করবে।

মা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিজস্ব অনুপম রসিকতার সঙ্গে কি সুন্দর ভাবে জানিয়ে দিলেন যে পাপ পুণ্য সব কিছুকে ছাড়িয়ে রয়েছে ভগবৎসত্য। ১৯-৪-১৯৭০

—শ্রীমা

---

* অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচার্য

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

১৯ মে, ১৯৫৪

প্রশ্ন ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি ও শুদ্ধ প্রেম, দুইএর মধ্যে কি তফাৎ?

উত্তর : তা নির্ভর করে তুমি কোনটির কি অর্থ করবে তারই উপর। ভক্তি তুমি কাকে বলো? সাধারণভাবে হয়তো ভক্তি বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে একটা উপরভাসা শ্রদ্ধা বা সমীহ করার মনোভাব, তার যেমন যতখানি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ তুমি করবে তোমার পক্ষে তাই হবে। সাধারণত কেউ যখন বলে—"হাঁ, ওঁকে আমি যথেষ্ট ভক্তি মান্য করি"—তার মানে এই হয় যে তাঁর উপরে সমুচিত আস্থা ও বন্ধুসুলভ একটু শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু আবার ওর চেয়ে অনেক গভীরতর অর্থে ঐ কথা বলা যেতে পারে। কোনো বাক্যের সুনির্দিষ্ট অর্থ ক'রে দেওয়া না থাকলে তার কতখানি ঠিক তাৎপর্য তা বলতে পারা কঠিন। কথাটা ব্যক্ত করার সময় যদি তার মধ্যে চিন্তার এবং গভীর মনোভাবের তেমন গুরুত্ব প্রকাশ হয় তাহলে আমার আন্তরিকতার ভাবটি তাতে প্রকাশ পায়। কিন্তু যদি আপন বুদ্ধি ও বিচারের কিছু ব্যাপার তার মধ্যে থাকে, তাহলে তার আগে বলে নিতে হয়, "আমি এই বলতে চাই যে..."—অর্থাৎ তার একটা সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে বলতে হয়।

প্রশ্ন "চৈত্য দৃষ্টি" কথাটির অর্থ কি?

উত্তর দৃষ্টির অর্থ? চোখের দৃষ্টি কাকে বলে তা তো নিশ্চয় জানো? সেটা জানো না কি? চৈত্যের দৃষ্টিও সেইরকম হবে। অর্থাৎ সেখানে বাইরের চোখের যন্ত্র দিয়ে না দেখে তুমি তোমার ভিতরকার চৈত্যের যন্ত্র দিয়ে দেখবে। এই যেমন তুমি বাইরের চোখ দিয়ে দেখছো, তেমনি চৈত্যের দ্বারাও দেখতে পারো। সেটা নির্ভর করে আপন সত্তার তখনকার অবস্থার উপর, কোন যন্ত্র দিয়ে দেখচ তার উপর, অর্থাৎ কেবল দেখাটুকুই কথা নয়। চৈত্যের দৃষ্টি দেখবে চৈত্যের অবস্থাতে বা চৈত্যের রাজ্যে বা চৈত্যসত্তারই মধ্যে কি হচ্ছে। মনের দৃষ্টিতে দেখবে যে মনের মধ্যে কি হচ্ছে। সেও চোখের দেখার মতোই দেখা।

স্থূল চোখ দিয়ে চৈত্য দৃষ্টি হয় না, চৈত্যেরই দ্বারা সেটা হতে পারে। কিন্তু তোমার নিজের চৈত্যের সঙ্গে যদি ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে গিয়ে থাকে, তাহলে তার দৃষ্টিতে যা তুমি দেখলে তা পরে স্মরণ থাকবে কি? সে দেখা চোখের দেখার মতো হয় না, শুধু চৈত্যেরই ভিতরে দেখতে পাওয়া।

প্রশ্ন : মা, এখানে লেখা রয়েছে—"দিব্য প্রেম তীব্রতম হলেও তাতে ক'রে সত্তার নিজস্ব কোনো অংশেই কিছু ব্যতিক্রম হতে পারে না।"

উত্তর : হাঁ, তাই।

প্রশ্ন কিন্তু যার দেহসত্তা দুর্বল, তার পক্ষেও কি এই কথা ?

উত্তর দেহসত্তা সম্বন্ধে ? ভগবৎ প্রেম তীব্র হলে দেহের তাতে কিছু ব্যতিক্রম হবে কেন ?

প্রশ্ন যদি সে দেহ প্রেমের তীব্রতার ভার সইতে না পারে ?

উত্তর তাহলে সেখানে তা খাঁটি ভগবৎ প্রেম নয়। তুমি কি বলতে চাও বুঝলাম না। যার যেমন ধারণাশক্তি সেই অনুযায়ী ততটাই প্রেম তার মধ্যে আসতে পারে।

ভগবানের প্রেমধারা পরিপূর্ণ পূর্ণতায় তার অসীম শক্তি নিয়ে সর্বত্র সর্বদাই উপস্থিত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকে—শতকরা নিরানব্বুই জনেই তার কিছু জানতে পারেনা। যার যতখানি ধারণাশক্তি থাকে সে কেবল ততখানি মাত্রই বোধ করতে পারে। মনে ক'রে দেখ তুমি নিত্য ভগবৎ প্রেমের অনন্ত প্রসারিত আবহাওয়ার মধ্যে অবগাহন করছ, অথচ নিজে সে খবর কিছুই জানোনা। হয়তো ক্বচিৎ কোনো বিরল মুহূর্তে চকিতের মধ্যে অনুভব করলে "কিছু একটা" ব্যাপার হচ্ছে, আর অমনি বললে, "ওঃ। এই বুঝি ভগবৎ প্রেম ?" ভারি আশ্চর্য কথা ! হয়তো কোনো কারণে ক্ষণিকের জন্য তোমার নিজের ভিতরটা খুলে রাখা হয়েছিল, তাই সেটা তখনমাত্র অনুভব করতে পারলে। অথচ সে প্রেম সর্বদার জন্যই উপস্থিত রয়েছে। যেমন রয়েছে ভগবানের অনন্ত দিব্যচেতনা। একই জিনিস সর্বক্ষণই রয়েছে তার সেই পরিপূর্ণ শক্তিতে। কেউ তা টের পায়না, কেবল তেমন ভালো অবস্থা ঘটলে হঠাৎ কেউ কিছু অনুভব করতে পেরে বলে ওঠে,—"পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি, ভগবৎ চেতনা আর ভগবৎ প্রেমের অপূর্ব স্পর্শ আমার মিলে গেছে।" কিন্তু প্রকৃত কথা তাই নয়। বস্তুত তোমার মধ্যে তখনকার মতো হয়তো অতি সামান্য আলপিনের মাথার মতো একটু ছিদ্র ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, আর সেই ছিদ্র দিয়েই তার শক্তিস্পর্শটি প্রবেশ করেছিল। কারণ তা হলো নিত্য বহমান আবহাওয়ার মতো, যেখানেই কিছু গ্রহিষ্ণু ফাঁক পায় সেখানেই ঢুকে যায়। দিব্য সকল কিছুর সম্বন্ধেই এই এক কথা। সর্বদাই ঘিরে আছে, কিন্তু তুমি অন্য অনেক পার্থিব বিষয়ে ব্যাপৃত থেকে নিজেকে অবরুদ্ধ ক'রে রাখো বলেই তার সন্ধান পাওনা। নিজেকে নিয়েই সর্বক্ষণ বিভোর, ও জিনিস সেখানে ঢুকবে কেমন ক'রে। সব সময়েই তুমি রয়েছো (হাস্য) নিজেকে নিয়ে, ভগবানের সেখানে প্রবেশের মতো স্থান কোথায়।

তবু কিন্তু তিনি তো আছেন, তিনি রয়েইছেন।

বস্তুত কত কিছুই তোমার চারিদিক ঘিরে আছে, তার সব কিছু কি তুমি জানতে পারো ? না।...এক আধবার হঠাৎ কোনো মুহূর্তে যখন তুমি কিছুটা গ্রহিষ্ণু হয়ে ওঠো, অথবা ঘুমের মধ্যে যখন বাহ্য জিনিস নিয়ে মনের মধ্যে কোনো চিন্তার ক্রিয়া নেই, তখন তার কিছু দেখতে পাও, কিছু অনুভব করো। আবার যেমনি সে অবস্থা বা সে ঘুম ভাঙে অমনি সেগুলো মুছে নিলিয়ে যায়—মুছে যায় প্রথমত তোমার দুনিবার অহংচেতনার দ্বারা, যা অষ্টপ্রহরই সঙ্গে লেগে আছে, আর সারা বিশ্ব তাকেই কেন্দ্র ক'রে আছে, যেন তুমি রয়েছ তারই কেন্দ্র হয়ে। নিজের ভিতরটা একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলেই এ কথা বুঝতে পারবে। তুমিই

যেন সকল কিছুর কেন্দ্রস্বরূপ, বিশ্বের যা কিছু সব তোমাকেই ঘিরে রয়েছে, তুমি ছাড়া কোনো কিছুই কিছু নয়। এ তো বিশ্বকে দেখা নয়, দেখছো কেবল তোমার নিজেকেই।

তাহলে প্রথম কথা এই যে নিজের ঐ অহংভাব থেকে তোমার বেরিয়ে আসা চাই। আর এটা বুঝতেই পারছ, তখন এসে পড়বে একটা অনন্তিত্বের অবস্থা। তারপর থেকে শুরু হবে সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া, একটা উচ্চস্তর থেকে। তবে যদি তুমি যথার্থই প্রকৃতভাবে সব কিছুকে দেখতে এবং জানতে চাও, তাহলে নিজেকে রাখতে হবে আয়নার মতো স্বচ্ছ—আর প্রশান্ত, নীরব, নিরপেক্ষ, অনড়, অপ্রভাবিত ও সর্বতোভাবে গ্রহিষ্ণু ক'রে। তাই যদি হতে পারো তখন এমন অনেক কিছুই তোমার গোচর হবে যার সম্বন্ধে তুমি আগে কিছুই জানতে না, কত কিছু অজানা জিনিস তোমার মধ্যে পরিচয়ের ক্রিয়া শুরু করবে।

তখন আর এই বিরাট বিশ্বের মধ্যে নিজের ঐ ক্ষুদ্র আমিটুকু নিয়ে সর্বদা আবদ্ধ ও জড়িত হয়ে না থেকে তুমি সেই বিরাটের মধ্যে প্রবেশ করবে।

নিজের এই আমিত্ব থেকে নিষ্ক্রমণের অনেক রকম উপায় আছে। কিন্তু সত্যকে জানতে হলে ঐরূপ করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন : অহং বর্জন করতে চাইলে কেমন মনোভাব গ্রহণ করা চাই?

উত্তর : মনোভাব গ্রহণ? তার মানে ইচ্ছা করা, নয় কি? সেইরূপই আন্তরিক ইচ্ছা তোমাকে করতে হবে।...কেমনভাবে করবে তাই জানতে চাইছ?

সব চেয়ে সুনির্দিষ্ট কাজ হলো নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করা। তার মানে ভগবানকে নিজের দিকে টানতে চাওয়া নয়, নিজেকেই অর্পণ করা। তাতে তখন দেখবে যে আপনা হতেই তোমার আমিত্ব ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করবে। কিন্তু সাধারণত লোকে ভগবানের কথা মনে করলেই তাঁকে নিজের মধ্যে যথাসাধ্য টেনে আনতে চায়। সেইজন্যেই তাদের কিছু হয় না। তখন বলে, "ওঃ! আমি যে কতই ডাকলাম, কতই চাইলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, কোনো জবাবই পেলাম না।" যদি তাকে জিজ্ঞাসা করো, "নিজেকে তুমি নিবেদন ক'রে সমর্পণ করেছিলে কি?" —"তা নয়, আমি তাঁকে টানতে চেয়েছি।" —"ও সেই জন্যই তুমি কিছু পাওনি।" সে যে আসেনি তা নয়, কিন্তু তখন তোমার দৃষ্টি রয়েছে নিজের অহংএর দিকে, তাতেই নিমগ্ন রয়েছ। আগেই তাই বলেছি যে তারই দেয়াল তোলা রয়েছে তার এবং তোমার নিজের মাঝখানে আড়াল হয়ে, আর তুমি নিজেরই কারাগারের মধ্যে আটক থেকে আশ্চর্য হয়ে মনে করছ যে সেখান থেকে কোনো সাড়া এলোনা কেন।

সেটা শুধু তোমার কারাগার নয়, তাতে এমন কি বাইরের পথের দিকে একটা জানলাও নেই। নিজেকে একেবারে বাইরের দিকে ছুঁড়ে দাও (হাত নেড়ে দেখালেন), নিজের কোনো কিছু নিজের হাতে না রেখে। সমস্তটাই দিয়ে ফেল, কেবল দিয়ে ফেলারই আনন্দে। তখনই কিছু পাচ্ছ বলে বোধ করতে পারবে।

প্রশ্ন কিন্তু সেইরকম বোধ করতেই যদি প্রয়াস করি...

উত্তর নিজের চেষ্টার দ্বারা ? তাও কি সেই তোমার অহংএর কাজই হলোনা ? অহংএর মধ্যে থেকেই অহংকে ছাড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করা, কঠিন কাজ হলোনা কি ? চেষ্টার জোরে বোধ এনে ফেলা ? নিজের মনস্তাত্ত্বিক কারণে ?

প্রশ্ন যদি এমন বোধ করতে চাই যে আমার নিজের কোনো অস্তিত্বই নেই, শুধুই আছেন এক ভগবান, তাতে কি নিজেকে ত্যাগ বা সমর্পণ করা হয় না ?

উত্তর : অস্তিত্ব নেই বলে ভাবা ? জানিনা মনের দ্বারা তেমন রকম বোধের চেষ্টা করা চলে কিনা। তবে মনে ঐরূপ ভাব এনে ফেলতে চাইলে তাতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। অমন ক'রে নয়, ওটা আপনা থেকে আসা চাই, সত্তার মধ্যে প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো তীব্র এক আস্পৃহা—কেমন ক'রে তা বুঝিয়ে বলি !

কেবল মাথা দিয়ে ভেবে কিছুই হয়না, কিছুমাত্র না।

প্রশ্ন চেষ্টা জিনিসটা তো মনের দ্বারাই হবে ? কিন্তু কেমন ক'রে তা স্বতঃস্ফূর্ত হবে ?

উত্তর : কি বলতে চাইছ ?

প্রশ্ন : চেষ্টা আসা সম্পর্কে...

উত্তর হাঁ, হাঁ, ও কথা ঠিকই শুনেছি। কিন্তু তুমি ধরে নিচ্ছ কেন যে সব রকমের চেষ্টা কেবল মনের দ্বারাই হয় ?

প্রশ্ন কিন্তু তাকে স্বতঃস্ফূর্ত করার আর কি উপায় আছে ?

উত্তর : আমি বলছি যে সত্তার ভিতরকার চৈত্য কেন্দ্র থেকে যে চেষ্টা ওঠে, আর মন যে কিছু পাবার চেষ্টা করে, এই দুই জিনিসে অনেক পার্থক্য।

এ কথা বুঝিয়ে বলা কঠিন, কিন্তু যতক্ষণ চেষ্টা চলছে মাথারই মধ্যে (কপালে আঙুল বুলিয়ে বললেন) ততক্ষণ তার তেমন বিশেষ শক্তি থাকেনা, যেটুকু থাকে তা সামান্যই। আর তা নিখাঁ জিনিস বলে। তুমি বহু চেষ্টা ক'রে ইচ্ছার দ্বারা এমন কিছু খাড়া করলে যা হলো কৃত্রিম, আর তাই দিয়ে যখন কিছুকে আঁকড়ে ধরতে যাও তখন তা মিলিয়ে যায়। আর কি হচ্ছে তা বুঝতে না পেরে তুমি বলো, "কি হলো, কেমন ক'রে এমন হলো ?"

বুঝিয়ে বলা কঠিন, কিন্তু আমার মনে হয় যে মাথার চেষ্টাতে যোগ সাধনা চলে না, যদি সমগ্র সত্তা সচেত তার মধ্যে নিবিষ্ট নিমগ্ন আপ্লুত না হও। তেমন হতে পারার যে ইচ্ছা তা মাথার ভিতরকার জিনিস নয়।

যে "ইচ্ছার" কথা আমি বলছি তা হলো এখানকার জিনিস। (নিজের বুকে আঙুল দেখিয়ে), সেই ইচ্ছারই আছে সাধনশক্তি, উপলব্ধি আনার শক্তি।

কেবল মাথার ভিতর দিয়ে যা কিছু করবে তার মধ্যে হাজারো রকমের ব্যতিক্রম এসে

পড়বে : ওতে যেমনি কোনো একটা ভাব বা খিওরি পড়ে তুলতে যাবে অমনি সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধ রকমের তর্কযুক্তি সব ভিড় ক'রে এসে হাজির হবে মনের যন্ত্রের এই একটা ক্রিয়া-কৌশল যে যে-কোনো তত্ত্বকেই সে নানা অনুকূল যুক্তির দ্বারা তাকে নির্ভুল বলে প্রমাণ করতে পারে। তাই ওর সাহায্যে বেশি দূর এগোনো যায় না। যদি কোনো শক্তিপূর্ণ সত্যকে সাময়িক ভাবেও আয়ত্ত করতে সক্ষম হও, তথাপি যেমনি তার শক্তি কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হয় অমনি এসে পড়ে তার বিপরীত অনেক ইঙ্গিত তার হাজার রকম চমৎকারিত্ব নিয়ে। তখন পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ চলে অবিশ্রান্ত। তার মীমাংসা হতে পারেনা।

কেমন ক'রে স্বতঃস্ফূর্ত জিনিস হবে তাই জানতে চাও? দেহের ব্যাপারেই তা লক্ষ্য করতে পারবে। যখনই কোনো ব্যাধি কিংবা বিড়ম্বনার ধাক্কা আসে, দেহ তখন তো তার আপন স্বাভাবিক প্রেরণাতেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ইচ্ছা করতে ও আশ্পৃহা করতে থাকে সাহায্য পেতে। কিন্তু যেমনি ইচ্ছাটা মাথার মধ্যে গিয়ে ঢোকে, অমনি সে তার অভ্যস্ত রীতিতে তার আপন ক্রিয়াগুলি শুরু ক'রে দেয় আর সব কিছু নষ্ট হয়। কিন্তু দেহ যদি তার আসল স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে যেতে পারে, তাহলে সাহায্যলাভের জন্য তার স্বতঃ-স্ফূর্ত আকিঞ্চন তীব্র হয়ে আশ্পৃহা করতে থাকবে, আর তার মধ্যে এমনই তীব্রতর আস্থা থাকবে—যেমন অকুণ্ঠ ও সুনিশ্চিত আস্থার সঙ্গে ছোটো শিশু তার মাকে ডাকে (যদিও সে ক্ষুদ্র শিশু কথা বলতেও পারেনা)। মনের তরফের হস্তক্ষেপ করাকে এড়িয়ে দেহ যদি তার স্বস্বভাবেই থাকে, তাহলে বিপদ-আপদ আসা মাত্র তার স্বাভাবিক চাহিদা ও আশ্পৃহা জোরদার হয়ে উঠবে সাহায্যলাভের জন্য—যদি তার মধ্যে কিছু অন্তরায় এসে না পড়ে। তখন তাহলে এমনই হতে পারবে যে দেহস্থ সমস্ত কোষগুলি পর্যন্ত সেই আশ্পৃহা নিয়ে ডাক দিতে থাকবে।

দেহের মধ্যে রয়েছে অনেক রকম অজানা দামী দামী শক্তিসম্পদ। দেহের কোষে কোষে রয়েছে প্রচুর প্রাণশক্তি, আশ্পৃহাশক্তি, অগ্রগতির প্রেরণা, যার সম্বন্ধে কোনো খবর নিজেই তুমি জানতে পারোনা। সেই মূল দেহচেতনাতে প্রাণ-মনের ক্রিয়া বেঁকিয়ে চুরিয়ে নষ্ট করে দেয় বলেই তখন তার স্বাভাবিক যে ব্যালান্স বা ভারসাম্য, তাকে ফিরে পাবার ইচ্ছার জোর থাকে না। যখন সেই ইচ্ছাটির অভাব তখন জানবে যে মন-প্রাণের তরফের ভেজালের দ্বারা সেই দেহচেতনা দূষিত হয়ে গেছে। যারা তাদের রোগবালাইকে আঁকড়ে থাকে, ভিতরকার অবচেতনার অল্পবিস্তর অজ্ঞাত প্ররোচনার প্রভাবে, এবং তাকেই পোষণ করে এই মনোভাব নিয়ে যে আবার একটা বেশ গুরুতর ব্যাপার চলছে—সেখানে এই দেহসত্তা বেচারার কিছু করবার থাকেনা—কারণ প্রাণ-মনের সেই বিকৃতভাব তার উপরে চেপে আছে। নতুবা নির্ভেজাল স্বাভাবিক দেহসত্তা খুব আশ্চর্য জিনিস, কারণ সে আপন স্বাচ্ছন্দ্য ও সুসঙ্গতি বজায় রাখতে কেবল আশ্পৃহাই করে না, কিন্তু তাকে যদি কোনো চিন্তাভারে পীড়িত না ক'রে তার নিজের হাতে ছেড়ে দাও—যদি প্রাণের তরফের প্রতিক্রিয়া বা হতাশা বা মনের তরফের ভয়ভাবনার দ্বারা তাকে বিচলিত না করো—তাহলে দেহ তার আপন শক্তিতেই ঠিকমতো নিজেকে সামলে সামঞ্জস্যটুকু বজায় রাখতে পারবে। স্বাভাবিক দেহ নিত্য তার সঙ্গতি বজায় রেখেই চলতে চায়, কেবল মন-প্রাণ প্রভৃতি অন্যান্য অংশই তাকে বিগড়ে দেয়।

প্রশ্ন না, মনের তরঙ্গের হস্তক্ষেপকে এড়িয়ে চলার কি উপায়?

উত্তর ও! সেটা আগে তোমাকে তেমনি ইচ্ছা করতে হবে, তার পরে অন্য কারো গোলমাল করা থামাতে যেমন তুমি তাদের বলো, "তোমরা চুপ করো, চুপ করো, চুপ করো।" তেমনি ভাবে মনের মধ্যে তার চুলবুল করা শুরু হতে দেখবামাত্র তাকে চুপ করাবে, থামিয়ে দেবে, শান্ত করবে, নিরস্ত করবে। গোড়া থেকেই তার কথা আদৌ শুনতে চাইবে না।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই হয় যে ঐরকম চিন্তা আসবামাত্রই তুমি তাকে দেখতে, শুনতে, ও বুঝতে চেষ্টা করো। তার পরে বোকার মতো বিশ্বাস করতে থাকো যে নিশ্চয় তার মধ্যে কিছু গুরুত্ব আছে। তাতেই তখন তার তৎপরতা আরো বেশি বেড়ে যায়; কিন্তু তুমি সেখানে তার কোনো কথা আদৌ কানেই নেবে না, মোটে গ্রাহ্যই করবে না। যদি বেশি গোলমাল করে তখন তাকে বলবে "থামো, থামো। তুমি চুপ ক'রে থাকো, স্থির হও!" নিজের চেতনার মধ্যে তাকে আদৌ আমলই দেবে না। বুঝেছ? তুমি যেন তাদের মতো হয়োনা, যারা চেঁচিয়ে "চুপ করো, চুপ করো" বলতে বলতে নিজেরাই হট্টগোল বাধায়, নিজেরাই আরো গণ্ডগোল পাকায়।

(এইখানে টেপ রেকর্ডারের ফিতা ফুরিয়ে গিয়ে সব থেমে গেল)

মা: (তাঁর শ্রোতাদের বললেন) আর ওতে ফিতে লাগানোর দরকার নেই, এইখানেই শেষ। ভাগ্যিস্!

হলো তো! এসো তাহলে, শুভ রজনী।*

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

বসুধার ভাষণ

[৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৩ সালে শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রের 'Hall of Harmony'তে ছাত্রছাত্রীদের নিকট প্রদত্ত ভাষণ]

অনুবাদ : রীণা মিত্র

(দুই)

বসুধা—তোমরা আমাকে 'দর্শন'-এর বিষয়ে কিছু বলতে বলেছো। কিন্তু ১৯২৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে কেমন দর্শন হয়েছিল সেই সম্বন্ধে তোমাদের বলতে পারি। কারণ ঐটাই ছিল আমার প্রথম শ্রীঅরবিন্দ-দর্শন।

সে-সময় বছরে তিনবার দর্শন হতো—২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৫ই আগষ্ট ও ২৪শে নভেম্বর—এগুলোকে আমরা দর্শন বলতাম ; কারণ, এই সময় শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দকে আমরা একত্র দর্শন করতাম। বছরের এই তিনটি দর্শনেই কেবল আমরা শ্রীঅরবিন্দকে খুবই নিকট থেকে দর্শন করতে পারতাম। আমরা তাঁর কাছে যেতাম, তাঁকে প্রণাম করতাম এবং তিনিও আমাদের মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করতেন।

শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দকে আমি প্রথম দর্শন করেছিলাম দোতলার ধ্যানের ঘরে।

সেই ঘরে বড় একটা সোফা ছিল, সোফাটি এখনো আছে, তার উপর বসে শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ সবাইকে দর্শন দিতেন। সে-সময় আমাদের আশ্রমে খুব কম সাধক ছিলেন এবং বাইরে থেকেও দর্শকরা খুব অল্পই অনুমতি পেতেন দর্শনের জন্য। যাঁরা শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করতে যাবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা তৈরী করে দর্শনের দু' একদিন পূর্বে নিচের মেডিটেশন হলে সকল দর্শকদের অবগতির জন্য রাখা হতো। এই নামের তালিকারই একটা নকল থাকত শ্রীঅরবিন্দের কাছে দর্শনের সময়। সেই তালিকার নাম অনুযায়ী আমরা এক একজন করে শ্রীঅরবিন্দের কাছে যেতাম। যখনই কোনো নতুন দর্শক শ্রীঅরবিন্দের সামনে যেতো, অমনি তিনি নামের তালিকাটি পড়ে দেখে নিতেন—কে সেই দর্শক। ১৯২৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী যারা দর্শন করেছিলো তাদের নামের তালিকাটি এখনো আমার কাছে আছে। সেইটি অবশ্য আমার সঙ্গে করে আনা উচিত ছিল।

আমি দর্শন করতে গিয়েছিলাম দাদার সঙ্গে। আমরা কিছু ফুল নিয়ে গিয়েছিলাম শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দকে দেবার জন্য। হলঘরের বাইরে সিঁড়ির উপর থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের আগের লোকেরা কিভাবে শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দকে প্রণাম করছে। কিন্তু 'হলের' মধ্যে ঢুকছিলাম আমরা এক একজন করে। প্রত্যেকেই শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ থেকে প্রণাম করতে ও যার যা নিবেদন করার করতে পারত।

সাধারণত: দর্শন আরম্ভ হতো ৬টা কি ৬-৩০ মিনিটে সকালে। দর্শন খুব বেশীক্ষণ চলত না, কারণ তখন দর্শক সংখ্যা ছিল খুবই কম। তবু দুই তিন ঘন্টার মত সময়ের মধ্যে লোকেরা তাঁদের কাছে যাবার অনুমতি পেত। সারা বছরে আমরা মাত্র তিনবার শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পেতাম, কাজেই তাঁর কাছে গিয়ে আমরা কেউ-ই তাড়াহুড়ো করতাম না।

প্রথম যেবার আমি দর্শন করি সেই বছরে বাইরের ভক্ত ও আশ্রমের সাধক মিলে দর্শন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৫জন। যে-সব ফুলের মালা শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের সময় পেতেন সেগুলো শ্রীমা বিকেলে সাধকের বিতরণ করতেন। তিনি আমাদের প্রত্যেককে একটি করে মালা দিতেন এবং রাত্রে অন্য দিনের মতই 'সুপ' বিতরণ করতেন।

দর্শন দিনে শ্রীমার বসবার আসনের চাঁদোয়াটিকে আমরা খুব সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজাতাম।

সেই বছরই অথবা তার পরের বছর দর্শনের ঘর পরিবর্তন করা হলো। উপরের ধ্যানের ঘরের শেষ সীমান্তের ছোট্ট ঘরটিতে দর্শন দেবার ব্যবস্থা করা হলো। তোমরা দেখেছ নিশ্চয়—এখনো সেই ঘরের সোফার উপরে শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের ছবি রয়েছে।

যখন শ্রীঅরবিন্দ হাঁটুতে আঘাত পান সেই বছর অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসের পূর্ব পর্যন্ত আমরা এইভাবে বছরে তিনবার দর্শন পেলাম। ওই বছরই ২৪শে নভেম্বর আমরা শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পেলাম না। তিনি সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত শ্রীমা একাই দর্শন দিতেন।

শ্রীঅরবিন্দ সুস্থ হয়ে ওঠার পর দর্শন কিন্তু আগের মত রইল না, দর্শন ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করা হলো। আমরা পূর্বের মত আর শ্রীঅরবিন্দের কাছে যেতে পারতাম না। সাধক সংখ্যা ইতিমধ্যে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং শ্রীঅরবিন্দও বেশীক্ষণ আর বসে থাকতে পারতেন না। সুতরাং দর্শনের সময় সংক্ষেপের জন্য নতুন ব্যবস্থা করা হলো। শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দ ছোট ঘরটিতে বসে থাকতেন। আমরা সেই ঘরের সামনে দিয়ে লাইন করে তাঁদের দর্শন করে চলে যেতাম। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ভাবে ঘরে ঢুকে তাঁদের প্রণাম করা বন্ধ হয়ে গেল।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন হতো বছরে তিনবার। কিন্তু তাঁর জানুর হাড় ভাঙায় দু'টো দর্শন (নভেম্বর ২৪, ১৯৩৮ এবং ফেব্রুয়ারী ২১, ১৯৩৯) পরপর আমরা পেলাম না। একে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন আমরা খুবই কম পেতাম তার উপর আবার দুটো দর্শন পেলাম না। পরের দর্শন পেতে ১৫ই আগষ্ট—তারও এখনো অনেক দেরী। তাই ২৪শে এপ্রিল আর একটি দর্শনের ব্যবস্থা করা হলো। ক্যালেণ্ডারের পাতায় এই দিনটির বিশেষত্ব এই জন্যে যে—১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল এই পুণ্য দিনেই শ্রীমা পণ্ডিচেরীর ভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন স্থায়ীভাবে।

এর কিছুকাল পরে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল ও ১৯৫০ সালের দর্শন ছাড়া দর্শন-ব্যবস্থার আর বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। পরে প্লে-গ্রাউণ্ডের গ্রুপের জন্য রঙিন

পোষাক হলে গ্রুপের ছেলে-মেয়েরাও ২৪শে এপ্রিলেই শুধু নিয়মিত দর্শন ছাড়া শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের সামনে "মার্চ-পাস্ট" করে যেতো।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো শ্রীঅরবিন্দকে দেখতে পাওনি।

দর্শন সম্পর্কে তোমাদের আরও কিছু বলতে পারি:

সে-সময় মোট একবার করে আমরা শ্রীমার দর্শন পেতাম—এটা হলো 'প্রণামের' সময়। পরে সন্ধ্যায় যখন তিনি মটরে করে বেড়াতে যেতেন, আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁর যাওয়া দেখতাম এবং রাত্রে তখন তিনি স্বপ্ন দিতেন—এই তিনবার যারাই শ্রীমাকে দেখবার ইচ্ছা করতো তারাই দেখতে পেতো।

কখনো কখনো সকালের দিকে শ্রীমা ভক্তদের কাউকে কাউকে তাঁর সঙ্গে ধ্যান করতে বলতেন অথবা ব্যক্তিগতভাবে দেখা-সাক্ষাতের জন্য ডাকতেন—এমনি করে তিনি কাউকে মাসে একবার, কাউকে বা মাসে দু'বার কিম্বা সপ্তাহে একবার আবার কাউকে কাউকে বা প্রায়ই তাঁর কাছে ডেকে পাঠাতেন।

আবার সন্ধ্যায় মোটরে করে বেড়াতে যাবার পূর্বে শ্রীমা কখনো কখনো কোনো সাধকদের ঘর পরিদর্শন করতে যেতেন। এই-ই ছিল সাধারণতঃ শ্রীমার কাজ।

আর একটি জিনিষ ছিল যা আমি আশ্রমে উপস্থিত থেকেও নিজের চোখে দেখিনি। আশ্রমের মধ্যে যেখানে এখন পৃথ্বীসিংএর ঘর ও রবীন্দ্রভবন 'কোল্ড-স্টোর' রয়েছে ১৯২৮ সালে ডাইনিংরুম ছিল সেখানে। তবে এই ডাইনিংরুম ছিল শুধু পুরুষদের জন্য। খাবারের ডিসগুলোতে খাবার ভর্তি করে রাখা হতো। শ্রীমা এসে নিজহাতে সেগুলো সাধকদের পরিবেশন করতেন। তিনি নিজেও একটি ডিস নিতেন এবং তা থেকে কিছু খেয়ে বাকীটা প্রসাদ হিসাবে এক একদিন এক একজন সাধককে ফিরিয়ে দিতেন। মহিলাদের সংখ্যা তখন ছিল খুবই কম। শ্রীমা তখন পছন্দ করতেন না যে, মেয়ে-পুরুষ উভয়েই একত্র বসে আহার করে। তাই, মহিলাদের খাবার তাদের ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। পরে এই ব্যবস্থারও পরিবর্তন হলো; স্ত্রীলোকদের জন্য আশ্রমের মধ্যেই ডাইনিংরুমের ব্যবস্থা করা হলো—বর্তমানে যে ঘরটিকে Cartonnerie বলা হয় সেখানে। (ঠিক পুজালালজীর ঘরের পেছন দিকে যে ঘরটিতে এখন প্রসূপারিটির জন্যে কার্ডবোর্ডের বাক্স, খাম প্রভৃতি তৈরী হয়।)

প্রশ্ন—শ্রীমার 'ব্যালকনি দর্শন' কখন থেকে আরম্ভ হলো?

বসুধা—১৯৩৮ সালে শ্রীঅরবিন্দের যখন হাঁটুতে আঘাত লাগে সেই সময় আমরা আর সকলে শ্রীমাকে প্রণাম করতে পারতাম না। শ্রীমা তখন খুব ব্যস্ত থাকতেন। সকল কথা আমার এখন স্মরণ হচ্ছে না, কারণ, সে-সব ঘটনা আমি 'নোট' করে রাখিনি। সম্ভবতঃ সাধকরা প্রতিদিনের কাজ আরম্ভ করার পূর্বে শ্রীমাকে দর্শন করতে চাইতো—মনে হয়, সেই সময় থেকেই 'ব্যালকনি দর্শন' সুরু হয়েছে।

প্রশ্ন—শ্রীমা কি সবসময়েই ফুল দিতেন?

বসুধা—শ্রীমা দর্শনের সময় কাউকেই ফুল দিতেন না। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের

সময়, ধ্যানের সময় অথবা কারো জন্মদিনে তাঁর কাছে গেলে তিনি ফুল দিতেন। আবার প্রণামের সময়ও তিনি সকলকে ফুল দিতেন।

প্রশ্ন—শ্রীমার 'টেরাস দর্শন' সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন?

বসুধা—শ্রীমার উপরের ঘর তখন তৈরী হয়নি। দোতলায় একটি খোলা ছাত ছিল। সেই ছাতে শ্রীমা যেতেন বিশেষ করে রোদে মাথার চুল শুকাতে। সঙ্গে নিয়ে যেতেন রোদ নিবারণের জন্যে 'প্যারাসোল'। আমার মনে আছে আমি ছাতায় তাঁর জন্য শিল্পকর্ম করে দিয়েছিলাম—শ্রীমার শাড়ীর সঙ্গে মিলিয়ে সেটাতে সাদা সাটিনের উপর সূর্যের সূচী-শিল্প করে দিয়েছিলাম।

'টেরাস দর্শন' বলতে বুঝাত দ্যুতনের ঘরের উপরের ছাত। সেই ছাতে শ্রীমা চিন্ময়ীর সঙ্গে রোজ পায়চারী করতেন। ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে শ্রীমা নিয়মিত ভাবে সন্ধ্যার দিকে ছাতে আসতেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে অল্প সময়ের জন্য ধ্যান করতেন। আর নীচের উঠানের বাঁধানো মেঝের উপর বসে সাধকরা ধ্যান করতেন।

প্রশ্ন—"অতিমানস মৎস"র গল্পটা আমাদের বলুন?

বসুধা—ওহো! "অতিমানস মৎস"? (হাস্য) তোমরা সকলে নিশ্চয় জানো যে, আমি শ্রীমার জন্য অনেক শাড়ীতে সূচী-শিল্প করেছি। এই সব শাড়ীগুলির মধ্যে একটা শাড়ীতে সমুদ্রের মাছের নক্সা সূচী-কর্ম করা ছিল। এই মাছগুলো ছিল সোনালী ও রূপালী। শাড়ীর কাজ শেষ করার পরে দেখলাম কিছু সুতো বেশী রয়েছে, কাজেই আমি ভাবলাম—"শ্রীঅরবিন্দের জন্য একটি মাছ করি না কেন? তিনি তো বহুকাল আগে মাছ খেয়েছেন? এখন তো আর তিনি খান না। সুতরাং সোনালী একটি মাছ তৈরী করে তার মধ্যে চকোলেট দিয়ে ভর্তি করে তাঁকে তো খেতে দিতে পারি?"

এই ভেবে আমি মাছের দুই পাশ সূচী-শিল্প করে মাছের সেই পাশ দুটোকে একত্র করে সেলাই করে জোড়া দিয়ে সুন্দর একটি মাছের আকৃতির ব্যাগ তৈরী করলাম। মুখটা কিন্তু খোলা রইল। এই মুখ দিয়ে সোনালী রঙের চকোলেট ভর্তি করে দিলাম। এই চকোলেটগুলো সে সময় পণ্ডিচেরীর বাজারে পাওয়া যেতো। মাছ তৈরী করা হয়ে গেলে সেই মাছটি শ্রীমাকে দিয়ে বললাম—এটা শ্রীঅরবিন্দের জন্য।

শ্রীমাও সেইটি নিয়ে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে দিলেন। পরের দিন শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে একটি পত্র এলো:

বসুধা,
সত্যিই এটা একটা 'অতিমানস মৎস্য' হয়েছে—সকল দিক থেকেই এটা নিখুঁত। —শ্রীঅরবিন্দ

বাস্তবিকই আমি উৎফুল্ল হলাম। শ্রীঅরবিন্দের নিকট থেকে এমন একটি মন্তব্য আসবে এ আমি আশাই করিনি।

যাহোক এরপর একদিন, শ্রীমার মাথার মুকুটের উপর সেই মাছের দুই পাশ দেখতে

পেলাম। শ্রীঅরবিন্দের নিকট থেকে বাছটি নিয়ে দুই পাশের জোড়া খুলে শ্রীমার মাথায় বাঁধবার ব্যাণ্ডের উপর সেলাই করে বসান হয়েছে। সেই ব্যাণ্ডটিই শ্রীমা তাঁর কপালে বেঁধে মাথার শাড়ীটাকে ঠিক করে রাখতেন। শ্রীমার সাধারণ নুকুটের উপর ওটা দেখে আমি কিন্তু মোটেই খুশী হলাম না। আমি ভাবলাম—বাছটি শ্রীঅরবিন্দের জন্য তৈরী করেছিলাম, কিন্তু শ্রীমা কেন নিলেন? (হাস্য)

প্রশ্ন—দীর্ঘ দিন শ্রীমার সান্নিধ্যে ছিলেন—আপনার কিছু স্মৃতি-কথা বলুন?

বসুধা—এত দিনে বহু ঘটনাই তো ঘটেছে। যদি তোমরা আমাকে কোনো একটি বিশেষ ঘটনা ধরিয়ে দাও তাহলে হয়তো সে-বিষয়ে কিছু বলতে পারি। না হলে, আমাকে আগে থেকে তৈরী হয়ে আসতে হয়। হঠাৎ বেশী কিছু বলা সম্ভব নয় এবং সব কিছু বলাও যায় না।

প্রশ্ন—জিনিষপত্রের অযথা অপচয় না করে শ্রীমা আপনাদের কেমন করে মিতব্যয়ী হতে শিখিয়েছিলেন?

বসুধা—হাঁ, ঠিকই বলেছো; শ্রীমার নিকট থেকে আমরা মিতব্যয়িতা শিখেছিলাম, কোনো কিছুরই অপচয় হতে দেওয়া চলবে না। তোমরা হয়তো দেখে থাকবে—শ্রীঅরবিন্দ কি রকম সব অপ্রয়োজনীয় টুকরো কাগজে চিঠিপত্র বা নোট লিখে রাখতেন; কখনো এমনও দেখা গিয়েছে যে কোনো কাগজের একপৃষ্ঠা লেখা হয়ে গিয়েছে, তবুও তিনি সেইটি নষ্ট না করে তাঁর কাজে ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে প্রসূপারিটি থেকে খাম, চিঠিপ্যাড ইত্যাদি যেগুলি দেওয়া হয় তোমরা সেগুলি লক্ষ্য করলেও দেখবে যে, সেগুলোও কোনো না কোনো ভাবে পূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে। এ সবই হলো শ্রীমা-শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার ফল।

এমন কি, পুরনো ছেঁড়া কাপড়ও ফেলে না দিয়ে শ্রীমার নির্দেশে সেগুলিকে নানা ভাবে ব্যবহার করা হয়। আর যদি কাপড়-চোপড় অল্প ছেঁড়ে তাহলে তো তাকে রিপু করার ব্যবস্থা আছেই। শ্রীমার নিজের কাপড়ও আমরা ধোবার আগে রিপু করে নিতাম—এই ছিল আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম। তাঁর কাপড় ধুতে নিয়ে যাবার আগে সব সময় দেখতাম, কোথাও কোনো রিপু করবার প্রয়োজন আছে কিনা।

তোমরা জান বোধহয়, আমরা অনেক সময় চারদিকে কাগজের লেবেলে মোড়া টিনগুলোকে ব্যবহার করে থাকি। কেউ কেউ আবার মিতব্যয়িতার দিকে এতদূর এগিয়ে যায় যে, কাগজের লেবেল উঠিয়ে দিয়ে সেইসব টিনগুলোকে সাইনবোর্ড, নেমপ্লেট ইত্যাদি নানা কাজে ব্যবহার করে। তবে জানিনা এতে কতখানি ব্যয়ের সাশ্রয় হয়ে থাকে—কারণ, খোলা টিনগুলোতে জল-হাওয়ার সংস্পর্শে তো অতি সহজেই মরচে পড়ে যায়।

প্রশ্ন—কেমন করে আপনি এখানে এলেন আমাদের বলবেন কি?

বসুধা—'নলেজ'-এ ফেব্রুয়ারী মাসে এই বিষয়ে আমি বলেছি, আবার বলা মানে ওইটারই পুনরাবৃত্তি করা হবে।

প্রশ্ন—একই ছাত্রদের এটা বলেননি।

বসুধা—তা অবশ্য নয়, তবুও আমাকে দু'বার একই কথা বলতে হবে। আমি বরং টেপ রেকর্ডটি এনে তোমাদের শুনাব। তাছাড়া 'Mother India'তে খুব শীঘ্রই সেই বক্তৃতাটি প্রকাশিত হবে। সেখান থেকে তোমরাও পড়ে নিতে পার কিংবা আমিও একদিন সময় করে তোমাদের পড়ে শোনাতে পারি। একই বিষয়ে বারবার বলতে ভাল লাগবে না—আমিও যেমন বলতে উৎসাহ পাব না, তোমরাও তেমনি শুনে আনন্দ পাবে না।

প্রশ্ন—আপনার 'স্কলারসিপে'র গল্পটা আমাদের বলুন?

বসুধা—'স্কলারসিপ'? (হাস্য) এইবার আমার ধরে ফেলেছ দেখছি? আচ্ছা শোন তবে সেই গল্পটি:

সে-সময় আশ্রমে স্কুল ছিল না। আমার দাদা আমাকে অঙ্ক শেখাতেন। তিনি ছিলেন ইঞ্জিনীয়র, কাজেই অঙ্কটা তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। আমাকে তিনি অঙ্ক শেখাতেন ফরাসী ভাষার মাধ্যমে। তোমরা জান বোধহয়, ফরাসী গণিতের বই-এ একটা অধ্যায় থাকে problem সম্বন্ধে। এই problemগুলো ফ্রান্সে বৃত্তি-পরীক্ষার ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে।

সে যাহোক, বইএর শেষের দিকে এই ধরনের 'প্রব্লেম্' অনেকগুলো ছিল। দাদা তার মধ্যে থেকে বেছে বেছে সাত-আটটা 'প্রব্লেম্' আমাকে সমাধান করতে দিয়ে বললেন যদি সেগুলো সব নির্ভুল হয় তাহলে তিনি আমাকে একটি 'স্কলারসিপ' দেবেন।

এই ধরনের অঙ্ক কষতে আমি ভাল পারতাম; কাজেই সব অঙ্কগুলোই নির্ভুল করে করলাম। এখন দাদা পড়লেন মুশকিলে। কারণ, এবার দাদার আমাকে 'স্কলারসিপ' দিতে হয়! কিন্তু কি 'স্কলারসিপ' তিনি দেবেন?

দাদার কাছে টাকা-পয়সা থাকতো না, যা সামান্য কিছু থাকতো তাও মজুরদের বেতন মিটিয়ে সামান্য দু-চার আনা মাত্র। এই উদ্বৃত্তটুকু তিনি নিজের জন্য খরচ করতে পারতেন না। কারণ, সেগুলো শ্রীমার টাকা। শ্রীমাকেই আবার হিসেব বুঝিয়ে দিতে হবে। কাজেই দাদা সমস্ত ব্যাপারটি শ্রীমার কাছে উত্থাপন করলেন। তিনি শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর হাতের সেই উদ্বৃত্ত পয়সা থেকে আমার স্কলারসিপ-এর জন্য সামান্য কিছু খরচ করতে পারেন কিনা।

শ্রীমা সকল ঘটনা শুনে খুব খুশী হলেন, এবং তৎক্ষণাৎ দাদার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তিনি দাদার হাতে টাকা রাখবার একটি ছোট্ট 'ব্যাগ' দিলেন। সেই ব্যাগটিতে পয়সা ভর্তি করে দাদা আমাকে উপহার দিলেন।

'স্কলারসিপ' পেয়ে ভাবলাম, এইটি আমার প্রথম উপার্জিত ধন। কাজেই এই ধন আমি শ্রীমাকেই সমর্পণ করবো। টাকা রাখার ব্যাগটি শ্রীমা দিয়েছিলেন, তাই ব্যাগটি তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চাইলাম না। তখন আমার বয়স ছিল যেমন অল্প বুদ্ধিতেও ছিল তেমনি ছেলেমানুষী। আমি একটি কার্ডবোর্ডের টুকরো নিয়ে ষড়ভুজ কি অষ্টভুজের (ঠিক মনে নেই) আকারে কেটে তার মধ্যে পয়সাগুলো সাজিয়ে কার্ডবোর্ডটির সঙ্গে সেলাই

করে দিলাম। তারপর কার্ডবোর্ডটির উপরে লিখলাম—"আমার জীবনের প্রথম অর্জিত ধন শ্রীমাকে সমর্পণ করলাম।"

ঘটনাটি অনেক—অনেক দিন আগেকার, সেই ১৯৩৯ সালের কথা। ঘটনাটির কথা আমি একরকম প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের দেহরক্ষার পরে একদিন শ্রীমা পয়সাসমেত সেই কার্ডবোর্ডটি তাঁর সিন্দুক থেকে বের করে আনলেন। যে সিন্দুকে শ্রীমার টাকাকড়ি, মণিমুক্তা হীরেজহরত প্রভৃতি মূল্যবান সামগ্রী থাকতো তিনি সেই সবের সঙ্গে একত্র এই সামান্য বস্তুটিও রেখেছিলেন। শ্রীমা কার্ডবোর্ডটি আমাকে দেখিয়ে বললেন—"দেখেছো? একে আমি সিন্দুকের মধ্যে রেখেছি; এই অক্ষয় ভাণ্ডার কখনো শূন্য হয় না। এ আমাকে যাদুমন্ত্রের মত সেবা দিচ্ছে।"

তোমরা কি জান 'যাদু' কাকে বলে? যাদু হলো সেই জিনিস যা কোনো শক্তিমান মানুষের মন্ত্রের দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে অলৌকিক কাজ করে ও রক্ষা করে।

এই ঘটনার আরো কয়েক বছর পরে, ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীমা তেতলার ঘরে এসে বাস করতে লাগলেন এবং তারপর আর কখনও নীচে আসেননি। সেই ঘরেও তাঁর একটা ছোট্ট সিন্দুক ছিল। একদিন শ্রীমা সেই যাদুটি সেই ছোট্ট সিন্দুকের মধ্যে এনে রেখে আমাকে বললেন—"দেখেছো? তোমার সেই যাদু এখানেও আমার সঙ্গে রয়েছে?"

এই হলো আমার 'স্কলারসিপ' পাওয়ার গল্প।

প্রশ্ন—এবার আপনার গোলাপের গল্পটা আমাদের বলুন?

বসুধা—গোলাপের? আমার স্বপ্নের?

এটা খুব ছোট একটি স্বপ্ন। আমি তখন বেশ ছোট ছিলাম। কয়েক দিন মাত্র হলো শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পেয়েছি—সেই দর্শনের কিছু দিন পরে আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম—

'গেষ্টহাউসের' দোতলার ঘরের বারান্দায় একটি জানালায় হেলান দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার হাতে রয়েছে চারটি দেশী গোলাপ (যার অর্থ হলো সমর্পণ)। গোলাপ চারটি ফুটেছে একই বৃন্তে। আর সেই বৃন্তটি রয়েছে আমার হাতে ধরা। আমার সামনের ঘরটির দরজা খুলে গেল—আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম সেই ঘরের দরজার প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। তিনি কথা না বলে আমাকে ইঙ্গিতে ডাকলেন। আমার মনে হলো তিনি ফুলগুলো চাইছেন ঘ্রাণ নেবেন বলে এবং তারপর আবার ফুলগুলো আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। সুতরাং আমি তাঁর কাছে গিয়ে আমার হাত তাঁর দিকে প্রসারিত করে ফুলগুলো তাঁর সামনে ধরলাম। তিনি আমার হাত থেকে ফুলের গোছাটি নিয়েই ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন! (হাস্য) সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বপ্নও ভেঙ্গে গেল।

কিন্তু আমি জেগে উঠেই খুব আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম। আমার মনে হতে লাগল সত্যি সত্যিই আমি শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছি! আমার অনুভব এতো গভীর ও সত্য হয়েছিল যা আমি বাস্তব দর্শনেও পাইনি। স্বপ্ন দেখার পরে আমার অনুভবের তীব্রতা

যেন আরো বেড়ে গেল। কেবলই অনুভব করতে লাগলাম, "আমি শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছি, আমি শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছি।" এই ভাবটি মন্ত্রের মতো আমার সমগ্র সত্তার মধ্যে প্রবাহিত হতে লাগল। এমন ভাব রইল প্রায় তিন দিন। স্বপ্নটি খুবই ছোট। কিন্তু এর ফল আমার জীবনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে রইল।

তোমরা কি এ-বিষয়ে আরো কিছু শুনতে চাও? তা হলে শোন আরো একটু বলি:

স্বপ্নটির কথা আমি সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রায় পঁচিশ বছর কি আরো বেশী হবে, হঠাৎ একদিন দেখছি ঠিক সেই রকম একগোছা গোলাপ শ্রীমার কাছে রয়েছে। গোলাপগুলো দেখেই আমার পূর্বের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল এবং আমি আমার সেই বহু পুরাতন স্বপ্নের কথা শ্রীমাকে বললাম। সব শুনে তিনি বললেন—ওঃ তাই নাকি? শ্রীঅরবিন্দ সব ফুলগুলোই নিয়ে নিলেন? আচ্ছা আমি এখন সেগুলোর মধ্য থেকে একটা ফুল তোমায় দেবো। এই বলে তিনি ফুলের গোছা থেকে একটা ফুল তুলে আমাকে দিলেন। আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না, হাতে করে নিলাম। যদিও মুখে বললাম—"না, না, তিনি যা নিয়েছিলেন তা ফিরিয়ে দেবার জন্য নয়।"

সেই দিনই বিকেলবেলা আমি যখন শ্রীমার জন্য 'টেনিস-গ্রাউণ্ডে' অপেক্ষা করছিলাম তখন এ-সম্বন্ধে আমার নতুন করে চিন্তা করতে লাগলাম, এবং স্বপ্নটার রহস্য আমার নিকট যেন পরিষ্কার হয়ে উঠলো। আমি অনুভব করলাম—যেটুকু সাধনা আমি করেছি, সাধনাতে যা ফললাভ করেছি সবই আমার প্রভু শ্রীঅরবিন্দেরই কৃপার দান। ওই চারটি গোলাপের অর্থ হলো সত্তার চারটি অংশ—দেহ মন প্রাণ ও চৈত্য পুরুষ। ঈশ্বরের নিকট এই সমগ্র সত্তার একত্রে সমর্পণ সহজ কথা নয়। কোনো সাধকের নিজের ক্ষমতায় সহজে হয় না। আমি আমার শক্তি দিয়ে কখনোই তা করতে পারতাম না। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ পরম করুণায় ফুল চারটি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। আমি নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবতী বলে মনে করছি। তিনি আমার হয়ে এত বড় কাজটি করে দিয়েছেন বলে আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।

এই ঘটনা এ-কথাই প্রমাণ করে, শ্রীঅরবিন্দ আমাদের কত ভালবাসেন; আমরা যদি সত্যকার অকপট ভাবে সাধনা করি তাহলে তিনি আমাদের প্রত্যেকের জন্যে সব কিছুই করেন। আমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে সে সব কিছুর মধ্যেই আমি শুধু তাঁরই কৃপা—তাঁরই অপার করুণার নিদর্শন পাচ্ছি।

With the best Compliments from:—

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street

Calcutta - 12

শ্রীঅরবিন্দ-স্মরণ

নীরদবরণ

(শ্রীঅরবিন্দের সচিত্র জীবন, কর্ম ও সাধনা)

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য চার টাকা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

FOR
NEAT PRINTING
AND
QUICK SERVICE

Specialist in Colour Print

Please Contract :—

Mahamaya Press

2, Bhupendra Bose Ave., Cal-4

Phone : 55-9124

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের বাণী বহ
একমাত্র আধ্যাত্মিক মাসিক পত্রিকা

শৃণ্বন্তু

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রতি সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ

★ শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের ধারাবাহিক অনুবাদ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

★ শ্রীঅরবিন্দের কাব্য সাহিত্য দর্শন সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তামূলক একাধিক গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ।

★ শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ জীবনালেখ্য
"ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ"—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

★ দৈনন্দিন সমস্যাপীড়িত জীবনের পথে দিশারী ও প্রেরণাস্বরূপ শ্রীমায়ের বাণী ও মায়ের আলাপ।

বার্ষিক চাঁদা (সডাক) দশ টাকা।
বৈশাখ সংখ্যা হইতে বর্ষ আরম্ভ।
বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।

যোগাযোগের ঠিকানা

শৃণ্বন্তু
৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

একটি চিত্তাকর্ষক কাব্য গ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যে একটি অভিনব সংযোজন—

মূল তামিল থেকে বাংলায় অনুবাদ—

আলবার পদাবলী

সমীরকান্ত গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনের পদাবলী, দাক্ষিণাত্যে তামিলদেশে তেমনি আলবারদের 'প্রবন্ধম্' বা পদাবলীর সমার্থক স্তবমালা। বে-কয়জন আলবারের পদসংগ্রহ এই গ্রন্থে তাঁরা হলেন

তিরুমঙ্গৈ আলবার　　পেরিয়ালবার

কুলশেখরণ আলবার　　অণ্ডাল　　নম্মালবার

বঙ্গানুবাদের ভাষা, তার লালিত্য, শব্দব্যঞ্জনা, ধ্বনিঝঙ্কার, মন্ত্রধ্বনিমুখর কাব্যশৈলী পাঠকদের মুগ্ধ করবে।

মূল্য : দশ টাকা

—প্রকাশক—

শৃঙ্খল

৬৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাধক কবি নিশিকান্ত রচিত

কালজয়ী কাব্য

নীলাঞ্জন

ইন্দ্র দুগার অঙ্কিত আটখানি বহুবর্ণ চিত্র ও বিবিধ রেখাচিত্রে অলঙ্কৃত

পরিবেশনে :

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশনী বিভাগ
পণ্ডিচেরী-২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

বিক্রয়কেন্দ্র :

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers

149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)
Gram UNIBOX Phone

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works (P.) Ltd.

90, Benaras Road,
H O W R A H.
Phone : 66-2434

34-2665 Gram: Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড	প্রথম চার অধ্যায়	দাম —২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড :	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০
অষ্টম খণ্ড	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়	২·০০
	প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড একত্রে বাঁধাই	২০·০০

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী সংস্করণ

Words of Sri Aurobindo	1st Series	2·50
,, ,,	2nd Series	4·00
যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০
উত্তরপাড়া অভিভাষণ	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম		২·০০
গীতার ভূমিকা	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
মাতৃবাণী	শ্রীমা	১·৫০
মায়ের আলাপ	শ্রীমা	৩·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী (৩য় সংস্করণ)		২·০০
মা কি বলেন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·০০
শতাব্দীর প্রণাম		৩·৫০
স্মৃতির পাতা (২য় পর্যায়)	,, ,,	৪·০০
শ্রীঅরবিন্দায়ন (সচিত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন, বাণী ও সাধনা)	(২য় সং) নীরদবরণ	৪·০০
অরবিন্দ-প্রসঙ্গ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১·৮০
শ্রীমা-প্রসঙ্গ	কে, আর, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	২·৮০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও যোগ	প্রবোধকুমার সেন	৫.০০
বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা	চারুচন্দ্র দত্ত	৩·৫০
কে এই মা ?	পশুপতি ভট্টাচার্য	৫·০০
দিব্য জীবনের সন্ধানে		৩·৫০
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মযোগ	সুধা বসু	৫·০০
Sri Aurobindo on Man	D. P. Chattopadhyaya	1·80
শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ		৭·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২৩৭৬

34-2665 Gram: Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে
শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড :	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড :	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০
অষ্টম খণ্ড :	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়	২·০০
	প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড একত্রে বাঁধাই	২০·০০

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৪৭

শ্রীঅরবিন্দ

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

(আগস্ট ১৯৭২)

সম্পূর্ণ রচনাবলী

ইংরাজিতে ৩০ খণ্ডে সম্পূর্ণ
[illegible] সংস্করণ—২৫০৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)
ছোট সংস্করণ—৭৫৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)

বাংলায় : শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলায় রচিত
(যৌবনের ভূমিকা, ধর্ম
ও জাতীয়তা, কারাকাহিনী
পত্রাবলী, বিবিধ রচনাদি)
দুইটি খণ্ডে সহ অন্যান্য রচনার
নয় খণ্ডে অনুবাদ। ১৬৲ টাকা

আগামিকাল প্রকাশ :
হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, ওড়িয়াতেও অনুবাদ

বুক সেলস্ ডিপার্টমেন্ট, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী,
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CALCUTTA UNIVERSITY